গ্রন্থকারের টীকা

কোপাই নদীর নাম কোপবতী।

শান্তিনিকেতনকে একসময় আশেপাশের গাঁয়ের লোক কাচবাংলা বলিত। এখন বলে কি না জানি না।

পোষ্টকার্ডের চিঠি—সে তো খোলা কাগজে লেখা, তার মধ্যে গোপনীয়তার অবকাশ কোথায়! গ্রাম্য ডাকঘরের পোষ্টকার্ডের চিঠি-মাত্রেই ওপন লেটার।

যেদিনের কথা বলিতেছি—সুরেশ পোদ্দারের হাতে যে চিঠিখানা উঠিল—সেখানা হইতেই আমাদের গল্পের সুরু।

সুরেশ বলিল—আরে দেখছেন মাষ্টারবাবু কেষ্ট চাটুজ্জের ছেলে এতদিন পরে আস্‌ছে! ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে লিখেছে।

মাষ্টারবাবু অর্থাৎ তারাপদ উত্তর দেওয়ার আগেই পিওন বিষ্ণুচরণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া চিঠিখানা কাড়িয়া লইল। সে এতক্ষণ ষ্টেশনে পাঠাইবার জন্য ডাকের থলিতে মোহর করিতেছিল; তারাপদ এই মাত্র যে চালানখানা আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা মিলাইয়া লইতেছিল—সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল চিঠিখানা তখন বিষ্ণুচরণের হাতে, কাজেই আবার নিজের কাজে মন দিল! এখানে একটু চাকুরীতত্ত্ব জানা আবশ্যক। তারাপদ পোষ্টমাষ্টার, বিষ্ণুচরণ পিওন, কাজেই চাকরী হিসাবে তারাপদ উপরওয়ালা; কিন্তু মাহিনার হিসাবে বিষ্ণুচরণ বড়, সে পায় মাসে বাইশ টাকা, তারাপদ পায় মাসে বারো টাকা; বিষ্ণুচরণের পাকা কাজ সে পেন্সন পাইবে, তারাপদর প্রায় ঠিকা চাকুরী; একষ্ট্রাডিপার্টমেণ্টাল ডাকঘরের ইহাই নিয়ম।

চাকুরীতে ঢুকিয়া তারাপদ প্রথমে নিজের গুরুত্ব প্রকাশ করিত; পিওনে ও মাষ্টারে প্রায়ই ঝগড়া বাধিয়া যাইত; শেষে গাঁয়ের লোকেরা মিলিয়া একটা আপোষ রফা করিয়া দিয়াছে। তারাপদই বড়, হাজার হোক সে মাষ্টারতো বটে, ডাকের চালানে তার সই না হইলে তো চলে না; না হয় বিষ্ণুর মাহিনা বেশি কিন্তু তারাপদ ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু সদগোপ; অবশ্য বিষ্ণু পেন্সন পাইবে; কিন্তু তারাপদর জোতজমা আছে;

পেন্সন মানুষ মরিলেই ফুরাইল; জোতজমা পুরুষানুক্রমে থাকিয়া যায়। এই সব যুক্তি দেখাইয়া সালিশী বৈঠক ডাকঘরে শান্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছে আর সকলের অনুরোধে বিষ্ণু ডাকঘরের একমাত্র চেয়ারখানি তারাপদকে ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রথমে সে চেয়ারে বসিতে তারাপদর অসুবিধা হইত—চেয়ারখানির তিনটি মাত্র পা; এখন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; তিন পায়ের চেয়ারে বসিয়া তারাপদ চালান সই করিয়া দেয়—হিসাব মিলাইয়া নেয়; কখনো হিসাব গরমিলের জন্য বেহুঁস হইবার মত হইলে বিষ্ণু ডাক দিয়া মাষ্টারবাবুকে সচেতন করিয়া দেয়—তারাপদ টাল সামলাইয়া লইয়া আবার গোড়া হইতে হিসাব সুরু করে; বিষ্ণু মাষ্টারবাবুকে বিব্রত করিতে চায় না—সেটুকু উদারতা তার আছে; আর দুঃখ কিসের তার পেন্সন আছে—মাষ্টারবাবুর শুধু ওই চেয়ারখানি; মাষ্টারবাবুর জোত আছে বটে—কিন্তু জমিদারের খাজনা বাকি পড়িলে তা কতদিন; এই সব ভাবিয়া বিষ্ণু মনে সান্ত্বনা পায়—আর গরম গালার উপরে ডাকঘরের সীল চাপিয়া ধরে।

এ হেন বিষ্ণুচরণ চিঠি পড়িতে লাগিল—মাষ্টারবাবু আশা ভঙ্গের ধাক্কার একটা টাল সামলাইয়া লইল; আবার কাগজে মন দিল—কিন্তু কান থাকিল ঐ চিঠির দিকে। বিষ্ণুচরণ খানিকটা মনে মনে পড়ে আর টিপ্পনী-সমেত ভাবার্থ শ্রোতাদের শোনায়। অন্যের চিঠি সে জোরে পড়ে না; অপরে জোরে পড়িতে পারে—কিন্তু সে পেন্সনপ্রত্যাশী সরকারী-চাকর; তাই সে মনে মনে পড়িয়া সরকারী চাকুরীর গুরুত্ব ও নিয়ম রক্ষা করে।

বিষ্ণুচরণ তারাপদকে সম্বোধন করিয়া বলিল—বুঝলেন না মাষ্টারবাবু বিমলবাবু গুডফ্রাইডের ছুটিতে বাড়ী আসছে।

পাশের একজন লোক আগন্তুক কে বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল।

সুরেশ পোদ্দার, যার হাতে প্রথম চিঠিখানা উঠিয়াছিল, বিরক্তির সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া দিল—

—বেম্‌লা গো বেম্‌লা, কেষ্ট চাটুজ্জের বেটা।

পোদ্দারের বিরক্তির কারণ ছিল। বিমলের বাড়ী ও বাগান খালি পড়িয়া থাকিত; সে প্রতিবেশীর ন্যায্য অধিকারের বলে বাগানের ফলটা মূলটা লইত, বাগানে গোরু ছাড়িয়া দিয়া চরাইত, বাড়ীতে দু'জন লোক আসিয়া পড়িলে বিমলের বৈঠকখানা খুলিয়া শুইতে দিত; এখন মালিক আসিয়া পড়িলে এ সব অধিকার খর্ব্ব হইবে।

বিষ্ণু পোদ্দারের রাগের কারণ বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনার স্বরে বলিল—ভয় নেই পোদ্দার মশাই—শুধু দিন তিনেকের জন্য, ক'টা দিন ছুটি আছে কিনা! তারপরে ছুটির রহস্য সরল করিয়া দিবার মানসে বলিল—ডাকঘরও তো সেদিন ছুটি কি বলেন মাষ্টারবাবু!

মাষ্টারবাবু ঘাড় ফিরাইয়া এবং হঠাৎ ঘাড় ফিরাইতে গিয়া টাল সামলাইয়া লইয়া বলিল—ছুটিতো বটেই, তারপর নাক হইতে চশমা খুলিয়া বলিল—কিন্তু আজও তো নোটিশ এল না।

মাত্র দিন তিনেকের জন্য বিমলের আগমন শুনিয়া সুরেশ পোদ্দার মনে মনে খুশি হইয়া উঠিয়াছিল—এক মুহূর্ত্ত আগে পৃথিবীর যে-রং কালো হইয়া গিয়াছিল, তা আবার তামাটে হইতে আরম্ভ করিল—সে জগতের সকলের প্রতি এমন একটা সহানুভূতির ভাব অনুভব করিল—যে তারাপদর ক্ষোভে সান্ত্বনার জন্য বলিল—আস্‌বে আস্‌বে নিশ্চয়, সরকারী ছুটি মারা যাবে না।

বিষ্ণু সেই সান্ত্বনার সূত্র ধরিয়া বলিল—তা বইকি গত বছর তো ঠিক আগের দিনে নোটিশ এসে হাজির!

তারাপদ চশমা জোড়া নাকের উপরে স্থাপন করিয়া দেয়ালে টাঙানো

ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—একটা লাল রঙের খোপের উপরে আঙুল ঠেকাইয়া বলিল—এই দেখ! কথাটা ঠিক মুখে উচ্চারণ করে নাই, যা বলিবার তা তার চোখেই প্রকাশিত হইল।

কিন্তু সংসারে অবিমিশ্র সুখ কোথায়! সুখের ফুলশয্যায় সন্দেহের ক্ষুদ্র পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়ায়। হরিহরের উক্তিতে পিপীলিকা ক্ষুদ্র একটি দংশন করিল—; অবিশ্বাস ও শঙ্কার মাঝামাঝি সুরে সে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ তিন দিন না ছাই! দেখো আমি বলছি এই যে এলো সে এলোই!

হরিহরের শঙ্কার কারণ আছে; সে কেষ্ট-চাটুজ্জের কাছে কিছু টাকা ধারিয়া মুদির দোকান করিয়াছিল; চাটুজ্জে মরিলে সে এই মনে করিয়া শান্তি পাইয়াছিল যে ছেলেটা তো বিদেশেই থাকে, কে আর টাকা আদায় করিতে আসিবে। চিঠি লিখিয়া টাকা আদায় করিবার একটা পুরাতন প্রথা আছে বটে, কিন্তু সেটা এত পুরাতন যে মোটেই কার্য্যকরী নয়। সেই কেষ্ট-চাটুজ্জের ছেলের শুভাগমনের সম্ভাবনা!

মাষ্টারবাবু বুঝলেন না—বিষ্ণুচরণ ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাতে নিঃশব্দ তুড়ির একটা মুদ্রা করিয়া বলিল (আমাদের ধারণা ক্রমাগত চিঠি সর্ট করিতে করিতে ওটা তার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে) ঘর-দোর সব সাফ করে রাখতে লিখেছে!

হরিহরের পিপীলিকা দংশনে সুরেশ পোদ্দারের মনোজগতে পরিবর্ত্তন আসিতেছিল সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ঘর আবার দোর! আছে তো খানদুই চালা!

—বুঝলেন না মাষ্টারবাবু, মিতনকে লিখছে, বাগানের গাছপালা যেন নষ্ট না হয়!

এবার আর সন্দেহের অবকাশ নাই—পোদ্দারের উপরে প্রত্যক্ষ

আক্রমণ! সে কি একটা কড়া অভিমত প্রকাশ করিতে যাইতেছিল—এমন সময়ে বাহিরে গোরুর আর্ত্তনাদ ও মনুষ্যকণ্ঠের বিরক্তি যুগপৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে চমকিয়া উঠিল—তারাপদ এবার টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িতেছিল—বিষ্ণুচরণ হাত দিয়া ঠেকাইল।

—বটেক্, বটেক্, শালার রকম দেখেছ!

সকলে বাহির হইয়া দেখিল একটি অবাধ্য গোরুর গলার দড়ি ধরিয়া একটা বুড়ো লোক বশে আনিতে চেষ্টা করিতেছে!

আরে পোদ্দার মশাই, আজ তোমার গাই আমি খোঁয়াড়ে দিবেক্, ছাড়বেক্ নি!

পোদ্দারের মুখে কথা ফুটিল না; কর্ম্মচক্র যে তাকে এমন করিয়া আঁটিয়া ধরিবার চক্রান্ত করিয়াছে, দু'দণ্ড আগেও তা কি সে জানিত!

হরিহর বলিল—আরে মিতন, ছেড়ে দে বাবা! ছেড়ে দে! গেরোস্তর গোরু!

মিতন দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—আজ আমি ছাড়বেক্ নি! দিন বলি তোমার গাইকে সামলাও—আজ কিনা জামরুল গাছটা সাবাড়ে দিলেক্! দাদাবাবু জানলে বলবেক্ কি শেষে মিতন গাছটা খেয়ে দিলেক্!

হরিহর হাসিয়া বলিল—সে কি মিতন মানুষে কি গাছ খেতে পারে!

মিতন যুক্তির সূক্ষ্মতা ধরিতে না পারিয়া বলিল—মনিষে নারে তাই কি গোরুতে খাবেক্!

ক্রুদ্ধ মিতন নিতান্তই গোরুটা আজ খোয়ারে লইয়া যাইবে দেখিয়া বিষ্ণুচরণ গোটা দুই নিঃশব্দ তুড়ি দিয়া বলিল—আরে মিতন তোর দাদাবাবুর যে চিঠি এসেছে—এই দেখ—

এই বলিয়া সে চিঠিখানা সম্মুখে ধরিতেই মিতন দড়ি ছাড়িয়া আগ্রহে

অগ্রসর হইল। ছাড়া পাইয়া পোদ্দারের শিক্ষিত গাভী একদৌড়ে গোয়ালে পৌছিয়া তবে থামিল। মিতন হাসিয়া বলিল—যাঁ শালা এবার ছেড়ে দিলেক্।

সকলে হাস্মিয়া উঠিল। তখন সে পোদ্দারের দিকে তাকাইয়া বলিল —পোদ্দার মশাই গোরু সামলে না রাখলে কবে কি হবেক্, কোন্ থানায় পড়ে মরবেক্--সাঁবধান হ'য়ে চলো!

মিতন অস্থানে মাঝে মাঝে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করিয়া থাকে।

বিষ্ণুচরণ চিঠিখানি পড়িয়া শুনাইল—টীকাটিপ্পনী করিল; সমস্ত শুনিয়া মিতন সক্ষোভে বলিয়া উঠিল—আহা-হা কচি জামরুল গাছটি দেখলেক্ দাদাবাবু কি বলবেক্!

হরিহর বলিল—কি আর বলবে! আমরা সব বুঝিয়ে বলবো!

মিতন হতাশভাবে বলিল—কি আর বুঝাবেক্!

বিষ্ণুচরণ বলিল—বোঝাবো যে মিতনমালী গাছটা খায়নি! খেয়েছে পোদ্দারের গাই।

পোদ্দার গম্ভীর হইয়াছিল—গম্ভীরতর কণ্ঠে বলিল—ওটুকু আর নাই বোঝালে!

মিতন জিজ্ঞাসা করিল—কবে আসবেক্ বল্‌লে—

বিষ্ণুচরণ বলিল—কাল, বুধবার বিকালে। মিতন অনুবৃত্তি করিয়া গেল বুধবার বিকালে। বিষ্ণুচরণ তাকে বুঝাইয়া দিল—ঘর-দোর-বাগান সব সাফ করিয়া রাখিতে হইবে এবং বুধবার বিকালে গোরুর গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে থাকিতে হইবে।

দাদাবাবুর আগমন সংবাদে মিতন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া কচি জামরুল গাছের ধ্বংসের কথা ভুলিয়া ত্বরিতপদে চিঠিখানা সংগ্রহ করিয়া কাপড়ের খুটে বাঁধিয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল!

পোদ্দার বিষণ্ণমুখে, হরিহর শঙ্কিত মনে, অপর সকলে ঔৎসুক্যের সঙ্গে ডাকঘর ত্যাগ করিল।

তারাপদ জিজ্ঞাসা করিল—বিষ্ণুচরণ (আপোষের একটি সর্ত্ত এই যে বিষ্ণুর পুরা নাম তারাপদ বলিবে; বিষ্ণু তারাপদকে মাষ্টারবাবু বলিবে) চিঠিখানা সিল দেওয়া হয়েছে কি?

বিষ্ণু চমকিয়া উঠিল—সত্যই তো সীল দেওয়া হয়নি! পেন্সনহানির আশঙ্কায় বিষ্ণুচরণ তখনি সীলে কালী মাখাইয়া লইয়া মিতনের পিছে পিছে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তারাপদ বারদুই টাল সামলাইয়া লইয়া হিসাবে মন দিল।

* * *

গ্রামটির নাম তালবনী; মাঝখান দিয়া একটি নদী প্রবাহিত, নাম কোপাই; ওপারের গ্রামটাকেও তালবনী ধরা হয়; কিন্তু ওপারের লোকেরা জোর করিয়া বলে ডাঙাপাড়া।

২

বোলপুর রেল ষ্টেশনটি ছোট। ষ্টেশনের বাহিরে একটি বটগাছের তলায় গাড়ী রাখিয়া মিতন অপেক্ষা করিতেছিল। কলিকাতার ট্রেন হইতে বিমল নামিলে মিতন গিয়া গড় হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া মালপত্র গাড়ীতে আনিয়া তুলিল। বিমল বলিল—কিরে মিতন তুই যে রোগা হ'য়ে গিয়েছিস্।

কথাটা অপবাদ মাত্র, সত্য নয়। সে একবার কণ্ঠির মালাটাতে হাত দিয়া দেখিল, মালাটা কণ্ঠে আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে; সেটাকে যতটা সম্ভব ঢিল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া সলজ্জ ভাবে হাসিয়া বলিল, এখন মলেই বাঁচি!

বিমল হাসিয়া বলিল—মরবি কিরে! তোর বয়স কত হ'ল?

মিতনের গণিতশাস্ত্র বয়সের হিসাব রাখে না; সে প্রশ্নটাকে অবজ্ঞার সঙ্গে উড়াইয়া দিয়া বলিল—কে জানে! তারপর কি যেন ভাবিয়া বলিল—চাল্লিশ হবেক্!

—চল্লিশ কি রে? চল্লিশ তো আমারই বয়স হ'ল! মিতন সন্দেহের সঙ্গে বিমলের দিকে তাকাইয়া বলিল—কি যে বল দাদাবাবু চল্লিশ কোথায়? তুমি তো সেদিনের ছেলে!

বিমল বলিল—চাল্লিশ নয় তো নয়। তুই এখন গাড়ী ছেড়েদে।

মিতন গাড়াতে গোরু জুড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিল—বিমল আগেই উঠিয়া বসিয়াছিল; মিতনের লাঠির খোঁচা খাইয়া গাড়ী ছুটিতে আরম্ভ করিল।

ষ্টেশনের সীমানার বাহিরেই বোলপুর সহর; রাস্তার লাল মাটির

সঙ্গে কয়লার গাড়ীর গুঁড়া মিশিয়া ধূলাতে নস্যের রং ধরিয়াছে, আবার নাকে গেলে নস্যের মত হাঁচি পায়। দু'পাশে ময়রার দোকানে থরে থরে মিষ্টান্ন সজ্জিত, কিন্তু তাদের প্রাথমিক রং কি বুঝিবার উপায় নাই; উপরে নস্য-রংঙের ধূলার একটা তবক পড়িয়া গিয়াছে।

বিমল মিতনকে শুধাইল—আরে এটা ভজহরির দোকান না?

মিতন সম্মতি জানাইল। বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল—চিনিবার উপায় নেই! এত বড় হ'ল কি করে?

মিতন কপালে হাত ঠেকাইয়া ও কপালের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া দিয়া বলিল—কপাল দাদাবাবু, কপাল। সেবার কঙ্কালিতলার মেলায় ও দোকানে দিলেক্—মনিহরির দোকান! মেলাতে লাগলে ওলাওঠা—একটা বিদেশী বুড়া লোক ওর দোকানে এসে রোগে পড়ল; ভজহরি ওকে সেবা কর্‌ল; বোলপুর সহর থেকে হরি ডাক্তারকে আনা করালো—! কিন্তু কিছুতেই বাঁচলেক্ না! বুড়ো মরবার সময়ে ভজহরিকে অনেক টাকা, দেশের জোতজমি সব দিয়ে গেল! সেই টাকায় ও বড় করে ব্যবসা করলে!

গল্প শেষ করিয়া সে জিজ্ঞাসার সুরে বলিল—কি, বল দাদাবাবু, কপাল নয়!

বিমল অন্যমনস্কভাবে বলিল—কপাল বই কি?

পথের দুধারে মনিহারি দোকান, কাটাকাপড়ের দোকান, লোহার বাসন, ঔষধ, তামাকের দোকান; একটা ছোট শিবমন্দির—দরজাভাঙা! ধূলা উড়িয়া নাকে গিয়া হাঁচি পায়। বিমল বলিল—মিতন একটু তাড়াতাড়ি চালা বাপু, সহরের বাইরে গিয়ে ধীরে ধীরে চলিস্ এখন!

গোরু তাড়া খাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিল—নস্যের কুয়াশা ক্রমে

ফিকা হইয়া আসিল, গাড়ী সহরের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল—দুই দিকে মাঠ দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

বিমল রুমাল দিয়া চোখ মুখ ও চুল মুছিয়া ফেলিয়া ভাল হইয়া বসিয়া বলিল—মিতন এবার গাঁয়ের খবর বল। আমার বাগানের গাছপালাগুলো ভাল আছে তো?

মিতন মনে মনে প্রমাদ গণিল—সেই জামরুল গাছের কথা মনে হইয়া পোদ্দারের উপরে বিষম রাগ হইল এবং ক্রমে সে রাগ ব্যাপ্ত হইয়া মানুষের গোরু পুষিবার প্রথার উপরে গিয়া পড়িল!

—কি রে? গাছপালা সব আছে না খেয়ে ফেলেছিস্!

মিতন এই ভয়ই করিতেছিল; গাছপালার ক্ষতি হইলে দাদাবাবু ভাবিবে সে অভাবে পড়িয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।

সে কথাটাকে যথাসম্ভব চাপা দিবার জন্য বলিল—শুধু গাছপালায় কি হবে দাদাবাবু! তুমি বাড়ী আস না—! মানুষ না থাক্‌লে কি বাড়ী ঘর থাকে?

বিমল বলিল—বাড়ী আসি না কি রে? এই তো এলাম!

—এ তো দু'বচ্ছর পরে?

—দু'বচ্ছর কোথায় রে? এই তো আর বছর বড়দিনে এসেছিলাম!

মিতন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তার কথাই ঠিক! বিমল বড় বাড়ী আসে না—বছরে একবারও আসে কি না সন্দেহ—আবার আসিলেও দু'চার দিনের বেশি থাকে না!

মিতন আব্দারের সুরে বলিল—এবার দু'চার মাস থেকে যাও!

বিমল বিষম বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল—দু'চার মাস! বল—দু'চার দিন।

মিতন এইরূপই সন্দেহ করিতেছিল—রাগের মাথায় বলিল—তবে না এলেই হ'ত!

কথাটা বলিয়াই বুঝিল বলা ভাল হয় নাই। একটু নরম করিয়া বলিল—আর কতদিন পড়া হবে দাদাবাবু!

বিমল বলিল—পড়া তো শেষ হয়ে গেছে। বিমল এবার এম, এ পাশ করিয়াছে। মিতনের মনে আশাসঞ্চার হইল—বলিল—তবে আর কলকাতায় কেন? ঘরকে এসে বসো!

—বলিস্ কিরে, এখন চাকরী করতে হবেনা?

মিতন বিস্মিত হইল! চাকরী তো তার মত মূর্খ লোকেরা করিবে। লেখাপড়া শিখিয়া আবার চাকরী কেন? বিশেষ যার জোতজমা আছে, সে তো আরাম করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিবে—ভাবিল কি জানি লেখাপড়া-জানা লোকের কথাই স্বতন্ত্র।

দুপাশে ঢেউতোলা নেড়ামাঠ; মাঝখান দিয়া পথের লাল ফিতাটা খুলিতে খুলিতে সম্মুখের বন্ধুরতার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে; পথের পাশে সারবন্দী শাদা-বাকলে ফাটলধরা অর্জ্জুন গাছ; মাঠের মধ্যে ইতস্তত খেজুর গাছের গুল্ম; পূব দিগন্তে রেলপথ খুড়িবার সময়কার লাল মাটির স্তূপের প্রাচীর; পশ্চিম দিগন্তে একটা শালবনের সবুজ আভাস।

বিমল বলিল—বল গাঁয়ের আর কি খবর? তারপরে প্রশ্নের ক্ষেত্রকে আরো সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এবারে ধান কি রকম হলরে?

মিতন গল্প আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার গোরু দুটাকে শাসাইয়া লইবার উপলক্ষ্যে একটার লেজ মলিয়া দিল, অপরটাকে লাঠির এক গুঁতা দিয়া সুরু করিল—এবারে ধান কই দাদাবাবু। ছটাক জলও হলনা! সেই যে বুড়ো তেঁতুল গাছটা, তার গোড়াতেও জল এল না!

—ধান পেয়েছিস কি রকম?

মিতন এবারে ভালই ধান পাইয়াছে, কিন্তু সত্যটা স্বীকার করিতে

কেমন যেন লজ্জা অনুভব করিল! বিমল যদি তার জমিদার হইত, তবে এ লজ্জার কারণ বোঝা যাইত, কারণ খাজনা না দিবার সঙ্গে ধান না হইবার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আসল কারণটা অন্য রকম। বাঙালী চাষী নিজেকে অদৃষ্টের অভিশপ্ত মনে করে—এক-আধবারে যে তার ব্যতিক্রম হয় সে সত্যটাকে সে যেন নিজেও বিশ্বাস করিতে পারেনা। কাজেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবার সাহস থাকে না, পাছে ক্রুদ্ধ অদৃষ্ট শুনিয়া ফেলে। তাই সে মৃদুলজ্জিত কণ্ঠে বলিল—তা পেলাম গোটা কয়েক।—যেন পাওয়াটা তারই ভুল হইয়াছে।

—আখ লাগিয়েছিস না?

—আখের কি আর দর আছে দাদাবাবু! দুআনা করে মণ আড়তকে পৌঁছে দিতে হয়। গাড়ী ভাড়াই ওঠেনা—বলিতে বলিতে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বাঁ ধারের গোরুটার লেজ মলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—বাঁ, বাঁ, শালার গোরু—

গোরুর দোষ নাই, তারা লাল ধুলা উড়াইয়া প্রাণপণে ছুটিয়াছে। গাড়ী ভুবনভাঙা গ্রাম ছাড়াইল, ক্রমে ডান ধারে সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে বাঁধের তরল-ইস্পাত একবারের জন্য চমকিয়া উঠিল; দীর্ঘ তালের সারির দীর্ঘতর ছায়া মায়াপুরীর অশরীরী স্তম্ভশ্রেণীর মত নিশ্চল হইয়া আছে; গাড়ী আবার বিরাট মাঠের মধ্যে সরু লাল পথ ধরিয়া ছুটিল।

মিতন গাড়ী চালাইতে চালাইতে গাঁয়ের খবর বলিয়া চলিল; ডাক-ঘরের কথা, সুরেশ পোদ্দার হরিহর মুদির কথা; বিমলের সেদিকে মন ছিল না, সে মাঠের দিকে তাকাইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ তার কানে গেল মিতন বলিতেছে—গাঁয়ে একটা বাঘ এসেছে দাদাবাবু আর ডাঙাপাড়ার বড় বাড়ীতে একটা মেয়ে এসেছে!

বিমল হাসিয়া উঠিল, বলিল,—বলিস্ কিরে এক সঙ্গে বাঘ আর মেয়ে! বাঘ কে পুষ্‌লো রে?

মিতন এতক্ষণে একটা নূতন খবর দিতে পারিয়াছে ভাবিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল—বলিল—পুষ্‌বে আবার কে? খুনো বাঘ গো।

—সার্কাসের দলের নাকি?

মিতন বোলপুর সহরে দুএকবার সার্কাস দেখিয়াছে—কাজেই সার্কাস শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। সে হাসিয়া বলিল—না, গো না, খেলার বাঘ নয়! জ্যান্ত বাঘ! রেল লাইনের ধারে যে তালপুকুর আছে সেখানে আজ তিনদিন তিন রাত ধরে বসে আছে! একটা বাছুর মেরে খেয়েছে।

—কেউ মারতে পারলে না?

—ও বাবা, ম্যরবে কে গো? সাঁওতালেরা তীরধনুক নিয়ে গিয়েছিল। ও তীরধনুকের কাজ নয় বাবা! বুঝলে দাদাবাবু, বাঘটা তীর খেয়ে একটা রা করলেক না! শুধু একবার থাবাটা চেটে নিয়ে মুখগুঁজে পড়ে রইলো!

মিতন অস্থানেঁ অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করিতে করিতে বলিয়া চলিল।

বিমল জিজ্ঞসা করিল—বন্দুক নিয়ে কেউ গেল না?

মিতন অত্যন্ত বৈরাগ্যের সুরে বলিল—বন্দুক কোথা গো।

বিমল বলিল—কেন ডাঙাপাড়ার বড় বাড়ীতে?

—বন্দুক তো আছে, শিকারী কই!—তার পরে নিজের মনেই যেন বলিল—হেতের আছে তো শিকারী নাই, শিকারী আছে তো হেতের নেই!—হেট্, হেট, বাঁ, বাঁ—শেষের অংশটা অবশ্য গোরুর উদ্দেশ্যে!

বিমল হাসিয়া বলিল—বাঘের কথা তো শুনলাম এবার মেয়েটার খবর বল! কার মেয়ে? হঠাৎ কি জন্য এলো?

মিতন গোটা কয়েক চন্দ্রবিন্দুর অপব্যয় করিয়া বলিল—বড়বাড়ীর কর্ত্তার নাতনি গো? হঠাৎ আবার কি?—মিতনের মাঝে মাঝে এক একটা ব্যঞ্জনকে অকারণে দ্বিত্ব করিবার অভ্যাস আছে! বোধ করি একেবারে অকারণে নয়; শব্দের উপরে জোর দিবার জন্য সে এই কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে।

বিমল বুঝিল যে মেয়েটির আগমন আকস্মিক নয়, কাজেই জিজ্ঞাসা করিল—আগে তো দেখিনি!

—দেখবে কি করে? তুমি তো আসনা, আর সে-ও থাকতো তার মার কাছে নলহাটিতে!

—তার মার কি হল?

—মা এবার মরে গেল! বাপ তো আগেই গিয়েছিল, এখন থাকবে সে দাদামশাইর কাছে—তারও তো আর কেউ নাই!

—চলরে বাবা চল্ আঁধার হল যে! অনুরোধকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য নিতান্ত অকারণে দুটা গুঁতা দিল। এই জাতীয় গুঁতাতে গো-জাতি অভ্যস্ত, তারা যেমন ছুটিতেছিল তেমনি ছুটিতে লাগিল।

বিমল দেখিল পথের বাঁ ধারে বৃহৎ একটা জনপদের চিহ্ন; অট্টালিকা, ইমারত, মন্দির, কুটির; আমলকি ও সানের বীথি; আমের ও মহুয়ার কুঞ্জ; গানের গুঞ্জন, ঘণ্টার ধ্বনি; আর সমবেতকণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি।

মিতন বিমলকে লক্ষ্য করিতেছিল—সে বিমলের উদ্দেশ্যে বলিল—কাঁচবাংলা দাদাবাবু!

বিমল বলিল—জায়গাটা খুব বড় হ'য়ে উঠ্‌ল! কথাটা যতটা নিজের প্রতি ততটা যেন মিতনের প্রতি নয়।

তরঙ্গিত মাঠের একটা তরঙ্গের চূড়া দিয়া পথ, দুই পাশে সুগভীর খোয়াই-এর খাদ; পশ্চিম সীমান্তের আর একটা তরঙ্গের চূড়ায়

বনরেখাহীন দিগ্‌বলয় ; সেখানে সূর্য্যের ভাস্বর স্বর্ণ ফলকের অর্দ্ধেকটা কর্ণের অর্দ্ধগ্রস্ত দীপ্ত রথচক্রের মত তখনো দেখা যাইতেছিল ; এই অলৌকিক রহস্যের সম্মুখে সমস্ত প্রান্তর যেন এক সারি তাল বৃক্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে ; প্রোজ্জ্বল দিগন্তের পটে তাদের কালো কালো রেখা দেখা-না-দেখার প্রান্তে থাকিয়া কাঁপিতেছিল ; একবার তারা তাল বৃক্ষের ছায়া, আর একবার বিস্ময়ের ইঙ্গিত !

বিমল কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া যখন আবার তাকাইল, তখন সব অন্ধকার হইয়া গিয়াছে ; সূর্য্যাস্তের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই ! সে মিতনকে বলিল—ওরে ছুটিয়ে চল্, ছুটিয়ে চল্, ওই দেখ আকাশে তারা ! মিতন গোরু দুটাকে গুঁতা দিতে দিতে বলিল—এই তো এসে পড়লাম বলে—ওই যে গাঁয়ের বাতি দেখ্‌ছ না গো !

গাড়ী ছুটিয়া চলিল—একে একে আকাশের তারা ও গাঁয়ের বাতি দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

৩

পরদিন বিকালে বিমল তার বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সঙ্গে সুরেশ পোদ্দার ও হরিহর মুদি ছিল; মিতন বাজার হইতে জিনিষপত্র আনিতে গিয়াছিল, তাই সে ছিল না। সুরেশ পোদ্দার কাল সন্ধ্যাবেলা মিতন ষ্টেশনে গেলে আর একবার আসিয়াছিল, গোপনে, কাজটাও গোপনীয়। সে আসিয়া গোরুতে-খাওয়া জামরুলের গাছটা তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া জায়গাটা বেশ টালিয়া সমান করিয়া দিয়া গিয়াছিল। মিতনও এই কাজটি করিবে ভাবিয়াছিল, আজ সকালে উঠিয়া কোনও গাছের চিহ্ন না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

পোদ্দার বলিতেছিল—বাবাজী পড়াশোনা তো শেষ হ'ল, এবার এসে ব'সো—বাড়ীঘর যে সব গেল।

বিমল তার কথার উত্তর না দিয়া হরিহরের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার ব্যবসা কেমন চল্‌ছে।

মুদি প্রমাদ গুনিল; কিন্তু এমন সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়, তাই সে আরম্ভ করিল—আর দাদাবাবু, এবার দোকানখানা তুলে দিলেই হয়। বোল বোলতেই লোকে এখন সহরের বাজারে যায়, আর যারা এখান থেকে নেয়, তারা নগদ কেনে না! মূলধন আমার খদ্দেরের ঘরে আটক পড়ে গেল!

পোদ্দার তাকে বাধা দিয়া বলিল—তুমি বাপু আবার বাড়িয়ে বল্‌ছ!

—বাড়িয়ে বল্‌ব কেন পোদ্দার মশাই—একবার নিজের কথাই ভেবে দেখ না!

পোদ্দার নিজের কথা না ভাবিয়াই কথাটা ফেলিয়াছিল—সে নিজেও

একজন সেই খরিদ্দারের দলে যারা চক্রান্ত করিয়া হরিহরের মূলধন আটক করিয়া ফেলিয়াছে।

পোদ্দার বলিল—ওসব এখন থাক্, বাবাজী দু'দিনের জন্য এসেছে, তাকে ওসব কথা বলে লাভ কি।

হরিহর বলিল—তা বইকি! তবু গাঁয়ের বড় লোক, কথাটা জানিয়ে রাখা ভাল।

এই একদিনেই বিমলের প্রতি দুই জনের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। হরিহর দেখিল বিমল তার টাকার জন্য তাগিদ দিল না, টাকার কথা যে মনে আছে, এমনই মনে হইল না। সুরেশ দেখিল বিমলের বাগান যে তার গোত্র' হইয়া উঠিয়াছে বিমল তাহা জানিতে পায় নাই। পাছে গাঁয়ের অন্য কোন শুভাকাঙ্ক্ষী আসিয়া কথাটা জানাইয়া বিমলের মন বিগড়াইয়া দেয় সুরেশের সেই ছিল ভয়।

গোলাপজামের গাছে ফুল ধরিয়াছিল, বিমল সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—দেখুন, আপনারা তো বল্‌ছেন, আমি বাড়ী আসি না। কিন্তু বাগান এমন পরিষ্কার তক্ তক্ করছে, কে বলবে যে আমি বাড়ী থাকি না!

—করবে না! তোমার মিতন মালির মত এমন চাকর লোকে ভাগ্যে পায়। সারাদিন সে তো বাগানের পিছনেই লেগে রয়েছে!—হরিহরের কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য কেবল সত্যভাষণ নয়, মিতনকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল। সে জানিত যদি কেহ বিমলের পাওনা টাকার কথা তোলে, তবে সে ওই মিতনই তুলিবে। বিমলের অনুপস্থিতিতে দু'একবার তুলিতেও ছাড়ে নাই, কাজেই কথাটা বলিল—সে নিশ্চয় জানিত মনিবের মুখ হইতে তাহা ক্রমে চাকরের কানে প্রবেশ করিবে। খাঁটি সোনার সঙ্গে কিছু খাদ মিশাইলে তবেই গিনি সোনা হয়; সংসারের

ব্যবহারে গিনির যেমন আদর, খাঁটি সোনার তেমন নয়। সত্যের সঙ্গে স্বার্থের খাদ দিলেই তবেই সে সত্য চালু হয়।

সুরেশ বলিল—কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু এতবড় বাগান পরিষ্কার রাখা কি এক ওই মিতনের কাজ! আমি গোরু চরিয়ে চরিয়ে ঘাসগুলো কমিয়ে রেখেছি। বুঝলে বাবাজী পাছে কচি গাছপালা খেয়ে ফেলে নিজে এসে আমি বসে' থাকি!

বিমল বলিল—তা শুনেছি, মিতন বলছিল!

সর্ব্বনাশ! বিমল কি শুনিতে কি শুনিয়াছে, মিতন কি বলিতে কি বলিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে তারা ভূতপূর্ব্ব জামরুল গাছটার কাছে দিয়া যাইতেছিল—বিমল সেদিকে তাকাইল না; পোদ্দার একবার আড়চোখে সেই জায়গাটার দিকে, একবার বিমলের দিকে তাকাইল—না; ভয়ের কোন কারণ নাই। এখন ঘটনাটি কয়েক দিন চাপিয়া রাখিতে পারিলেই হয়।

সুরেশ বলিল—তা হলে দু'তিন দিনের বেশি থাকা হচ্ছে না!

হরিহর বলিল—পোদ্দার মশাই গাঁয়ে বসে থাক্‌লে চলবে কেন! এত এম, এ; বি, এ পাশ করে কি লোকে গাঁয়ে বসে থাকে—সে তো থাকবে আমার মত মুর্খু সুক্ষু লোকেরা! দাদাবাবু এখন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হবে! কি বল পোদ্দার!

পোদ্দার ভিন্ন কথা বলিবে কেন? দুই জনেরই উদ্দেশ্য যে এক! দুইজনে প্রায় কোরাসে আরম্ভ করিল—লোকে যে যা বলে বলুক, তুমি বাবাজী গাঁয়ে এসে বসো না! তুমি বাইরে চাকরি করে' গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে, তুমি কেন এখানে বসে ভবিষ্যৎ মাটি করবে।

বিমল সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল—ভবিষ্যৎ মাটি করিবার সুসঙ্কল্প তাহার নাই।

এমন সময়ে তারা দেখিল কয়েকজন সাঁওতাল তীর ধনুক হাতে ছুটিয়া চলিয়াছে ; বিমল সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিল—এরা কোথায় ছুটেছে ?

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল—ওরে মাঝি, কোথায় যাচ্ছিস্ ?

সাঁওতালদের একজন দূরে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—দেলা হুজুমে।

সুরেশ বলিল—হুজুমে কিরে ?

তারা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—হুড়ঁার।

সুরেশ বিমলকে বলিল—আর ব'ল না বাবাজী, ক'দিন হ'ল একটা বাঘ এদিকে এসেছে, লোকের গোরু বাছুর আর রাখ্‌লে না।

বিমলের কাল সন্ধ্যায়-শোনা বাঘটার কথা মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল—মেরে ফেলে না কেন ?

—মারবে, বন্দুক কই ?

—কেন ডাঙাপাড়ার বড়-বাড়ীতে বন্দুক ছিল তো !

—বন্দুক তো আছে, শিকারী কই !

বিমল কখনো কখনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শিকার করিয়াছে—এক-আধটা বাঘও মারিয়াছে। সে বলিল—চলুন না দেখা যাক্, বন্দুকটা পাওয়া যায় কি না ?

সুরেশ বলিল—আজ না হয় থাক, সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। বিমল বলিল—এখনো অন্ধকার হয়নি ! আর যদি তেমন দেখি না গেলেই চলবে। দেখাই যাক্ না বন্দুকটা পাওয়া যায় কিনা !

বিমল ডাঙাপাড়ার দিকে চলিল। সুরেশ ও হরিহর তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া বলিল—বাবাজী তুমি তাহলে এগোও, আমরা আসছি। বিমল বুঝিল তারা আসিবে না, সে কেবল বলিল—আচ্ছা—এবং দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিমলের মনে এই আকস্মিক বীররসের অভ্যুদয়ে সুরেশ ও হরিহরের মনে কি ভাবের উদয় হইল কল্পনা করা যাক্। প্রথমে তারা ভাবিল বিমল এই বিপদের মুখে না গেলেই ভাল; তারপরে ভাবিল, যায় তো বাঘটাকে মারিয়া আসুক, গাঁয়ের একটা বিঘ্ন কাটিয়া যায়; আরো একটা অত্যন্ত সূক্ষ্মশরীরী ভাব মনের পটভূমিতে এক-আধবার পদক্ষেপ করিতেছিল—বিমলের যদি একটা ভালমন্দ কিছু হইয়া যায় তো তাদের দেনাটা ওইসঙ্গে চুকিয়া যায়। সুরেশ ও হরিহর খারাপ লোক নয়, স্বাভাবিক আর দশ জনের মতই মানুষ, আর স্বাভাবিক মানুষ বলিয়া ওই ভাবটাও তাদের মনে দেখা দিতেছিল। প্রথম চিন্তা দুটি তাদের সচেতন সঙ্কল্প, শেষেরটি অবচেতন ইচ্ছা, এমন একটি জিনিষ যার উপর মানুষের মোটেই হাত নাই। স্রোতের সঙ্গে যেমন শেওলা, এ-ও অনেকটা তেমনি। প্রত্যেক শুভ ইচ্ছার সঙ্গেই স্বার্থের মিশ্রণ আছে। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতেও যে কৃপণ পিতার মনে ভবিষ্যতের খরচ কমের একটা আভাস চকিতে দেখা দেয় না—এমন কথা জোর করিয়া কে বলিবে! চোখের জলের যে নির্ম্মল স্রোত মানুষের মনের অন্ধকার গুহাটার ভিতর হইতে প্রবাহিত, এইসব চিন্তাতেই সেই অদ্ভুত স্থানের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ ভালও নয়, মন্দও নয়, অদ্ভুত।

৪

ডাঙাপাড়া পৌঁছিতে হইলে নদী পার হইতে হয়—নদীতে হাঁটুজলও নয়; বিমল অনায়াসে পার হইয়া বড়বাড়ীতে গিয়া পৌছিল। বড়-বাড়ীর মালিক পতিতপাবন চাটুজ্জে বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজখানা নাকের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া পড়িতেছিলেন; তিনি বিমলকে দেখিবার আগেই বিমল তাঁকে দেখিল; সে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিতে লাগিল বৃদ্ধের শরীর আরো ভাঙিয়া পড়িয়াছে, মাথার পাকা চুল আরো বিরল হইয়া আসিয়াছে কপালে ও গালে বলিচিহ্ন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, পাশেই একখানা লাঠি। বিমল কাছে আসিয়া পড়িলে শব্দে মুখ তুলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন আরে বিমল যে, ব'সো ব'সো। তুমি কাল এসেছ, সে সংবাদ আমি পেয়েছি। তারপরে ভাল তো!

বিমল বলিল—আজ্ঞা এক রকম। আপনার?

—আমার? বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল! তারপরে শ্লেষ্মার আক্রমণ হইতে গলাটা কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—এ বয়সে আবার শরীর ভাল কি হে! বেঁচে আছি এই তো চরম ভাল! আর একবার কাশিয়া লইয়া বলিলেন—তারপরে এবার ক'দিনের জন্য?

—পরশু তোরশু যাব ভাবছি!

—এত শীগ্‌গীর কি হে! তুমি কি দেশ ছেড়ে দেবে নাকি! এম, এ, তো শেষ হ'য়ে গেল, না? আবার বি, এল, আছে নাকি? বৃদ্ধ বিমলের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। বিমল মাথা নাড়িয়া জানাইল সে ওকালতী পড়িতেছে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ের নূতন খবর কি? পতিতপাবন বাবু

হাসিয়া উঠিলেন—একি তোমাদের কল্‌কাতা, যে প্রতিদিন নূতন খবর গজাবে। এ হচ্ছে মান্ধাতার আমলের দেশ—দশ বছর আগেও যে খবর ছিল, আজও তাই! তারপরে কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—নূতন খবরের মধ্যে এই যে শুনছি তালপুকুরে এক বাঘ এসেছে।

বিমল সুযোগ পাইল; সে জানাইল যে সে বাঘটা মারিবার জন্য তাঁর বন্দুকটা চাহিতে আসিয়াছে।

বৃদ্ধ বলিলেন—তোমার তো শিকেরের বাতিক এক সময়ে ছিল, তা একেবারে বাঘ শিকারে নাই গেলে!

বিমল বলিল—বহু লোক গিয়েছে শুনছি, একবার দেখে আসিনা!

বৃদ্ধ বলিল তা যাবে যাও, কিন্তু একটু সাবধানে কাজ করো। তারপরে ভিতরের দিকে তাকাইয়া ডাকিলেন—ফুলু, ও ফুলু।
ভিতরে পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কচি কণ্ঠে উত্তর আসিল—ডাক্‌ছ দাদাবাবু?

বৃদ্ধ অদৃশ্য কণ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আমাদের বিমল এসেছে, একবার বন্দুকটা আনো দেখি—তারপরে একটা ব্যাখ্যার সুরে বলিলেন—তালপুকুরের বাঘটাকে বিমল্ শিকার করতে যাবে; তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।

পদশব্দ ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

বৃদ্ধ বিমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বন্দুকের আবার সব ঠিক থাক্‌লে হয়; অনেকদিন কেউ ছোঁয়নি; সিন্দুকেই বন্ধ থাকে! হয় তো দেখবে গুলি নেই। এখন তোমার ভাগ্য!

পদশব্দ পুনরায় নিকটবর্ত্তী হইল!

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হ'ল?

কচিকণ্ঠ বলিল—সিন্দুকের চাবি পাওয়া গেল না!

বৃদ্ধ বলিলেন—ওই দেখ যা বলেছি। একটা কিছু গোল হবেই। তারপরে অন্তর্নিহিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ভাল করে দেখেছিস!

কণ্ঠ বলিল—ভাল করেই দেখেছি দাদা[illegible]।

বৃদ্ধ নৈরাশ্যের সুরে বলিলেন—কি করা যায় বিমল!

বিমল বলিল—কি আর করবেন!

পদশব্দ অন্তর্হিত হইতেছিল—হঠাৎ বিমলের চোখ সেই দিকে পড়িল—মনে হইল জলবজ্রবিদ্যুতে-ভরা একখণ্ড কুঞ্চিত কালো চুলের মেঘ ও মুখমণ্ডল অন্তঃপুরের দিগন্তে মিলাইয়া গেল! মুখে যেন এক ঝলক হাসি খেলিয়া গেল! বিদ্রূপের নাকি! সত্যকথা বলিতে কি—বন্দুকটা না পাওয়াতে বিমলের মনে একটু স্বস্তির মত আসিয়াছিল! নিজের কাছেও অগোচর প্রায় সেই ভীত ভাবটি কি ওই মেয়েটি বুঝিতে পারিয়াছে, তাই কি এই বিদ্রূপের বক্র হাসি! বিমলের শিকারের যে রোখ চলিয়া গিয়াছিল, তা আবার দ্বিগুণিত হইয়া ফিরিয়া আসিল!

বিমল উঠিয়া পড়িয়া বলিল—আচ্ছা তা হ'লে আসি!

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—শুধু হাতেই কি ওদিকে যাবে নাকি? বিমল শুধু বলিল—না। তারপরে মাঠ পার হইয়া হন্ হন্ করিয়া তালপুকুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল!

৫

তালপুকুর গ্রাম হইতে ক্রোশখানেক; মাঠ ভাঙিয়া গেলে আধ ক্রোশ হয়। একটা নীচু জায়গার তিন দিকে বাঁধ দিয়া জল আটক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে; বর্ষাকালে জল বাঁধের মাথা পর্য্যন্ত ওঠে, এখন সামান্যই আছে; বাঁধের উপরেও গায়ে বুনো বেঁটে তাল গাছের ঘন সারি। বাঁধের উপরে প্রায় শ পাঁচ ছয় লোক জমিয়া গিয়াছে, সাঁওতাল আছে, বাঙালী আছে; সাঁওতালদের হাতে তীর ধনুক ও বল্লম; বাঙালীদের হাতে লাঠি, দা, কুড়াল, দু'একটা গাদা বন্দুকও আছে। এত আয়োজন যার জন্য সেই ব্যাঘ্র বাঁধের অপর দিকে ডাঙা জমির উপরে দিব্য আরামে শুইয়া আছে, কাছেই একটা অর্দ্ধভুক্ত পশুদেহ।

কাল হইতে শিকারের চেষ্টা চলিতেছে, অর্থাৎ লোক জমিতে আরম্ভ হইয়াছে; মাঝে মাঝে তীর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তীরগুলা ততদূর পৌঁছায় নাই—বাঘটা ডাকেও নাই, ওঠেও নাই, মাঝে মাঝে কেবল লেজ নাড়িয়া বুঝাইয়া দিয়াছে সে এখনো জীবিত।

আজ সকালে গাদা বন্দুক লইয়া দু'একজন লোক আসিয়াছে; আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে তারা বাঘের রূপকে শিয়াল মারিবে আশা করিয়াছিল—কিন্তু সত্যই একটা আস্ত বাঘ দেখিয়া তাদের মনে পড়িয়া গেল বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে। কাজেই সকাল হইতে বাঁধের এপারে শিকারীর জনতা কলহ, পরামর্শ, উপদেশ, ও গোলমাল করিতে লাগিল—আর বাঘটা ওপারে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া কখনো ঘুমাইতে লাগিল, আবার কখনো বা জাগিয়া উঠিয়া মৃত পশুর মাংস খানিকটা

আহার করিয়া বিশ্রব্ধসুখে থাবা দুটি চাটিয়া পরম আলস্যে ও অবজ্ঞায় জনতার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

এমন সময়ে বিমল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল জনতার মধ্যে জন দুই ভদ্রলোক আছে; তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইল, তারাও সবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; তালতোড়ের জমিদার বাড়ীর ছেলে তারা। তাদের কাছে একটা দোনালা বন্দুক ছিল; বিমলের আগ্রহ দেখিয়া বন্দুকটা তার হাতেই ছাড়িয়া দিল। তাদের সঙ্গে একটা নেপালী চাকর ছিল, নাম বাহাদুর। বাহাদুর সঙ্গে দুইখানা খুকরী ছোরা আনিয়াছিল। একখানা বিমল চাহিয়া লইল, একখানা বাহাদুরের কাছেই রহিল। বাহাদুর এ পর্য্যন্ত নিজের মনিবদ্বয়কে বীরপুরুষ ভাবিয়াছিল, কিন্তু বন্দুকটা বিমলকে ছাড়িয়া দেওয়াতে বিমলের প্রতি যেমন তার শ্রদ্ধা বাড়িল, নিজে[illegible] মনিবদের প্রতি তেমনি কমিল। নেপালী জাতির মুখের মাংসপেশী [illegible] সচল না হওয়াতে সব সময়ে মনোভাব মুখে ধরা পড়ে না, কিন্তু তাদের ছোটছোট উজ্জ্বল চোখ দুটিতে সকল ভাবই অসম্ভব উজ্জ্বলতায় প্রকাশ পায়; বাহাদুরের ছোট চোখ দুটিতে যুগপৎ অবজ্ঞা ও কৌতুকের ভাব উছলিয়া উঠিল, বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিলে অনেকটা এই রকম [illegible]ড়ায়—ও বাবা, তাই বল!

বিমল বন্দুক লইয়া নিশানা করিবার জন্য সুবি[illegible] একটা জায়গা খুঁজিতে লাগিল; বাহাদুর তার সঙ্গে সঙ্গে চলি[illegible]। জনতা এতক্ষণে কৌতূহলী হইয়া উঠিল; বাঘই মরুক, আর শিকারীই মরুক, তার পক্ষে দুই-ই সমান উত্তেজনার; বোধ করি শিকারী মরিলেই বেশী; আর দুজনেই মরিবে, আহা সে সৌভাগ্য কি জনতার হইবে! বিমল বাঁধের উপর দিয়া চলিতে চলিতে যেখানটা বাঘের নিকটতম সেখানে আসিয়া

দাঁড়াইল—বাঘটা বোধ করি একশ গজের মধ্যেই হইবে। বাহাদুর খুকরী খুলিয়া সংযত হইয়া দাঁড়াইল—বিমল নিশানা করিতে লাগিল—কিন্তু বাঘটা ভ্রূক্ষেপও করে না ; জনতা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

বিমল বেশ ভাল করিয়া নিশানা করিয়া বন্দুক ছাড়িল—গুলিটা বাঘের চোয়াল ভেদ করিয়া ঘাড়ে গিয়া বিধিল—জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তারপরেই এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল—মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের বিকাশ যেমন ক্ষণিক ও ক্ষিপ্র তেমনি এক ব্যাপার ঘটিল—এক মুহূর্তের মধ্যে আহত বাঘ ছুটিতে ছুটিতে এক লম্ফ দিয়া বিমলের উপরে আসিয়া পড়িল—ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে জনতা পালাইবার অবকাশও পায় নাই। কিন্তু বিমল যেন ইহা আগেই আশঙ্কা করিয়াছিল—সে বাঘটাকে ছুটিতে দেখিয়া বন্দুক ধরিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, কাঁছে আসিলেই দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়িয়া তাকে পাড়িয়া ফেলিবে। বাঘটা যখন তার হাত দশেকের মধ্যে আসিয়া পড়িল—সে বন্দুকের দ্বিতীয় ঘোড়া টিপিল; ক্যাপ কাটিয়া গেল—গুলি ছুটিল না। জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল—এতখানি সৌভাগ্যের আশা তারা করে নাই, বাঘ বিমলের ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িল; আর গুলি ভরিবার সময় সে পাইল না, বিশেষ বাঘের ধাক্কাতে তার হাতের বন্দুক ছুটিয়া গিয়া দূরে পড়িল। ঠিক সেই মুহূর্তেই, যখন বাঘটা মুখ দিয়া বিমলের মাথাটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই মুহূর্তে বাহাদুর বিদ্যুৎবেগে খুকরীখানা বাঘের মুখের মধ্যে বিঁধাইয়া দিল; খুকরী বাহাদুরের হাত হইতে খসিয়া গেল, কিন্তু তাহা বাঘের তালুতে আমূল নিহিত হইয়া থাকিল।

বিমল অনুভব করিল সে গড়াইয়া পড়িতেছে; বাঁধের গড়ানে দিকটা বহিয়া সে গড়াইয়া পড়িতেছে, বাঘটা তার উপরে; পরে মুহূর্তে

সে উপরে উঠিল, বাঘটা নীচে ; আবার উপরে, সে নীচে ; বাঘ মুখ দিয়া তাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু একে চোয়াল ভাঙিয়া গিয়াছে, তা'তে আবার মুখের মধ্যে খুকরী বিদ্ধ, পারিতেছে না, বিমলও সহজাত আত্মরক্ষার শক্তিতেই যেন বাঘের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে গড়াইয়া নামিতেছে।

বিমল একবার নীচে পড়িতেই লক্ষ্য করিল, দুইখানা বাঁশের পাকা লাঠি শূন্যে উদ্যত, পরমুহূর্তে সে দুটা বাঘের মুখে পড়িল ; শূন্যে দু'খানা মুখ ; বাহাদুরের অনড় মাংসপেশীর মধ্যে হিংসার আনন্দে উজ্জ্বল ছোট দুটি চোখ ছিটা গুলির মত চক চক করিতেছে ; আর একটা মুখের মাথার উপরে পাকা চুলের প্রলেপ, গলায় কণ্ঠির মালা ছিঁড়িয়া দুলিতেছে ; সেই মুখ হইতেই যেন বাহির হইতেছে,—"বেটাকে ছাড়বনি, দাদাবাবু, ছাড়বনি, একটু সামলে থেকো !"

পরমুহূর্তে আবার বাঘ নীচে, বিমল উপরে, চোখে পড়িল তীক্ষ্ণ শাদা দাঁত ; তালু ভেদ করিয়া রক্তের ধারা ; এক একবার কর্কশ জিহ্বা ; বিষাক্ত তীব্র নিঃশ্বাস। আবার সে নীচে, শূন্যে সেই দুইখানা লাঠি ; বহু উচ্চে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আকাশ, তার উপরে গোটাদুই শাদা চিহ্ন, বকও হইতে পারে, মেঘও হইতে পারে। আবার উপরে, সেই দাঁত, রক্তের ধারা, মুমূর্ষু জানোয়ারের হিংস্র নিঃশ্বাস। আবার নীচে, আবার উপরে—তার আর শেষ নাই—যেন পৃথিবীটা আগাগোড়াই গড়ান হইয়া গিয়াছে। শেষে একবার সে অনুভব করিল—যেন সে আর গড়াইয়া পড়িতেছে না। শূন্যে সেই লাঠিও নাই, নিম্নে সেই মূর্তিমান হিংস্রতাও নাই। চোখ মেলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল ঘোর অন্ধকার, কানে আর শব্দ পৌঁছিতেছে না—পৃথিবী অন্ধকার, চরাচর নিস্তব্ধ, সংজ্ঞা বিলুপ্ত।

মিতন ও বাহাদুর বিমলকে লইয়া গিয়া একটা সমতল স্থানে

শোয়াইয়া দিল—সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। বাঘটা নিঃস্পন্দ হই পড়িয়াছে ; তারা দেখিল তার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন তা জনতাকে ডাকিল ; ডাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। দুটা লোকে নিরাপদে বাঘের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জনতার মধ্যে যা সবচেয়ে সাহসী তারা আগাইয়া আসিল ; তাদের মনে একটা ক্ষী আশার মত ছিল যে হয়তো শিকারীও মরিয়াছে। একদল বাঘটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আর একদল বিমলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সমবেদন প্রকাশ করিতে লাগিল—জনতার সমবেদনা মানেই আহত লোকে বাতাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া তার আয়ুর পথকে শীর্ণতর করিয়া তোলা।

বিমলের প্রথম গুলিতেই বাঘের মৃত্যু অবধারিত হইয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় গুলি চলিলে এ দুর্দৈব ঘটিত না ; মুমূর্ষু বাঘ যখন তাকে আক্রমণ করিল, আর সকলেই পালাইল, কেবল বাহাদুর খুকরী দিয়া তাকে প্রতিরোধ করিল, আর ঠিক সেই সময়েই মিতন লাঠি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাঘটা নেহাৎ ছোট নয়! সেই যাদের বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছিল তারা আর সকলকে হটাইয়া দিয়া বাঘটাকে মাপিতে সুরু করিল ; একবার মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত মাপিল, আবার লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত মাপিল ; সে মাপ পছন্দ হইল না, আবার মাপিল, আবার মাপিল, জনে জনে মাপিল ; তারপরে কবে তারা কোথায় কোন্ কোন্ বাঘ মারিয়াছে স্বীকার করিয়া এ বাঘটা যে নেহাৎ নাবালক তাহা প্রচার করিয়া দিল। তালতোড়ের জমিদার পুত্রদ্বয়, যাদের বন্দুকে বাঘ মরিয়াছিল শিকারের সব গৌরবটুকু আত্মসাৎ করিয়া অত্যন্ত বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ভাবটা যেন বন্দুক যার শিকারের গৌরবও

তার। তারা বাহাদুরকে হুকুম করিল—বাঘের জিহ্বাটা কাটিয়া লইতে, বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্পিরিটে ডুবাইয়া সেটা অক্ষয় করিয়া রাখিবে। বাহাদুর তাদের সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিল, সে ছোট একটা সেলাম করিয়া বিমলের কাছে রহিয়া গেল। জনতা বাঘটাকে একটা গোরুর গাড়ীতে তুলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া গ্রামের দিকে রওনা হইল।

মিতন আর একখানা গোরুর গাড়ী আনিয়া বিমলকে গাড়ীতে সযত্নে তুলিয়া বাড়ীর দিকে চলিল—সঙ্গে বাহাদুরও চলিল।

তিন দিন পরে বিমলের জ্ঞান ফিরিল—ইতিমধ্যে মিতন চেষ্টা ও চিকিৎসার ত্রুটি করে নাই; বোলপুর হইতে হরিডাক্তারকে আনিয়াছে, ডাক্তার প্রতিদিন আসিয়াছে, দিনে দুইবারও আসিতে হইয়াছে; মিতন রোগীর শিয়রের কাছে বসিয়া থাকিয়াছে, আর বাহাদুর দরজার সম্মুখে অনিদ্র অভুক্ত বসিয়াছিল। গাঁয়ের অনেকেই তাকে দেখিতে আসিয়াছে, পতিতপাবন চাটুজ্জে আসিয়াছেন, সুরেশ ও হরিহর আশা আশঙ্কা মিশ্রিত মনোভাব লইয়া বারংবার দেখিয়া গিয়াছে।

তিন দিন পরে বিকালের দিকে বিমলের জ্ঞান ফিরিল—প্রথমেই তার চোখে পড়িল মাথার কাছে মিতনের মুখ, আর জানালার ফাঁক দিয়া বাহাদুরের টুপির ভগ্নাংশ। মিতন জিজ্ঞাসা করিল—দাদাবাবু কেমন আছ। বিমল বলিল—ভালইরে।—অধিক বলিবার তার শক্তি ছিল না, অধিক শুনিবারও মিতনের আবশ্যক ছিল না। বিমল বিছানায় কাৎ হইয়া শুইয়া রোগীর শিশুদৃষ্টিতে জানালার আকাশ পথে প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিল—এমন করিয়া কখনো সে প্রকৃতিকে দেখে নাই—সে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—

বীরভূমের মানচিত্রের পটের দক্ষিণ প্রান্তে তালবনী একটি ন
বিন্দু। এই বিন্দুটিকে লইয়াই আমাদের গল্প, কিন্তু তার আগে একব
পটখানাকে দেখা আবশ্যক; এই পটের সঙ্গে বিন্দুর কি সম্বন্ধ বুঝি
হইবে, এতক্ষণ আমরা তালবনী গ্রামকে বড় করিয়া দেখিয়াছি, এব
বিন্দুরূপে পরিণত করিয়া সেটাকে পটের মধ্যে সন্নিবেশ করিব, এতক
মানুষকে দেখিয়াছি, এবার প্রকৃতিকে দেখিব।

বীরভূম জেলা একটি প্রাকৃতিক ত্রিভুজ; অজয় নদের দ্বারা সীমায়ি
প্রায় পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত ইহার দক্ষিণস্থ তলদেশ ক্রমঃ সঙ্কীর্ণ হইে
হইতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তরে গিয়া সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবা
জেলার মধ্যে একটি গোঁজের মত প্রবেশ করিয়াছে, প্রায় সেইখানে
যেখান হইতে ভাগীরথী ও গিরিশ্রেণীর যুক্তবেণী পৃথক হইয়া প্রথম
পূর্ব্ব দিকে, আর দ্বিতীয়টি পশ্চিম দিকে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

বীরভূমের পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার অনুর্ব্বর মালভূমি ও রুক্ষ গিরি
রাজি; সমস্ত জেলাটাই পশ্চিমের উচ্চভূমি হইতে গড়াইয়া পূবের দিকে
নামিতে নামিতে এক সময়ে মুর্শিদাবাদের শস্যসমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ
করিয়া অবশেষে ভাগীরথীর মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। এই মাটির
নিম্নমুখী চিরশৃঙ্খলিত তরঙ্গের সঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া বীরভূমের নদ-নদীও
পূর্ব্ব প্রবাহিনী—বাঁশনই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই,
হিংলা, অজয়।

বীরভূমের নদ-নদী নদীর স্মৃতি মাত্র; সারাবছর তারা অর্দ্ধচেতন-
ভাবে বিস্তৃত বালুশয্যার একপ্রান্তে ক্ষীণ জলধারায় ঘুমাইয়া থাকে;

তারপরে বর্ষার প্রারম্ভে অরণ্যহীন কোন্ উৎস-মূলের মালভূমিতে বর্ষণ হয়, আর তরঙ্গের ডম্বরু-ধ্বনিতে এই সব নাগিনীরা ভূগর্ভের ফল্গুলীলা ত্যাগ করিয়া ফুলিয়া, ফুঁসিয়া, ফাঁপিয়া, ফেনাইয়া জাগিয়া ওঠে,—সেদিন সারা বছরের শোধ তুলিয়া তারা তীরে নীরে একাকার করিয়া দেয়। সেদিন অজয়ের সহস্রজিহ্ব গৈরিক জলরাশি আনন্দমঠের গা ঘেঁসিয়া লক্ষ লক্ষ গেরুয়াধারী সন্তানসৈন্যের মত হর হর শব্দে দিগন্ত কম্পিত করিয়া ছোটে। সেদিন অজয় আর নদী নয়, কোন্ পূর্ণ জাগ্রত বিদ্রোহী সত্তা; সেদিন প্রকৃতি মেঘের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে শঙ্কিত বক্ষে সেই তর্জ্জন শুনিতে থাকে। সেদিন উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত গৈরিক নদ-নদী দুর্নিবার তরঙ্গের জপমালার আবর্ত্তনে বীরভূমকে বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লয়।

বীরভূমের মাটির প্রকৃতিতেও এই দ্বৈধীলীলা। এই জেলাকে একটি রেলপথ দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রায় সমভাবে চিরিয়া ফেলিয়া অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পশ্চিমে ভূপ্রকৃতি একরকম, পূর্ব্বে আর এক রকম; পশ্চিমে রুক্ষ, অনুর্ব্বর, দগ্ধ, কঠিন, নিঃস্ব, বিরাগী ভূখণ্ড সন্ন্যাসীর শুষ্ক উদার ললাটের মত; আর পূর্ব্বদিকে শ্যামল, কোমল, সমতল, শস্যান্বিত, স্নিগ্ধ তরুবহুল প্রান্তর সন্ন্যাসীর স্নিগ্ধ এবং কৃপাকরুণ ওষ্ঠাধর। বিশ্বামিত্র ও বশি· যেন ভেদ ভুলিয়া পাশাপাশি তপোমগ্ন। এই বিচিত্র ভূখণ্ডের মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর হরগৌরীর অলৌকিক সমাধি।

ইহার এক দিকে প্রান্তর, অন্য দিকে বন; এক দিকে নগ্নতা, অন্য দিকে আচ্ছাদন; একদিকে রিক্ততা, অন্যদিকে সম্পদ; ইহার পশ্চিমে শাল, পিয়াল, মহুয়া, পূর্ব্বে আম, জাম, কাঁঠাল; পশ্চিমে তাল, পূর্ব্বে খেজুর; পশ্চিমে অর্জ্জুন, পূর্ব্বে বাঁশ; ইহার একদিকে সন্ন্যাস, অন্যদিকে গার্হস্থ্য; একদিকে ঘর-ছাড়া বনস্পতির দল, আর একদিকে ঘর-ঘেঁসা

কোপাই বিশেষভাবে বীরভূমেরই নদী। বীরভূমের মধ্যেই তার জীবনের আদ্যন্ত; এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তে তার জন্ম এবং এই জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে বক্রেশ্বরনদী ত তার লীলার শেষ। অজয়ের সঙ্গে প্রায় সমন্তরালভাবে ইহা প্রবাহিত। ইহার উৎসমূলে কোন পাহাড় বা নদী নাই—সেখানে এক ভূ-বিবর হইতে ইহার উদ্ভব। উৎস হইতে জলের সঞ্চয় পায় না, কিন্তু পথে চলিতে চলিতে বীরভূমের দক্ষিণ অংশ ধৌত জল সংগ্রহ করিয়া পথের শেষে কোপাই পৌঁছিয়াছে।

বীরভূমে প্রকৃতির এক খেয়াল আছে। এই অঞ্চলের লোকে তাকে খোয়াই বলে। খোয়াই আর কিছুই নয়, বর্ষার জলে ক্ষইয়া-যাওয়া কঙ্কর বাহির হওয়া জলশূন্য নদীখাত মাত্র। এই খোয়াই বীরভূমের বৃহৎ একটা অংশ জুড়িয়া পড়িয়া আছে। বর্ষার বারিধারা অজস্র আঙুলে ইহা রচনা করিতেছে। জল চলিয়া গেলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হাজার হাতের হাজার আঙুলের কীর্ত্তি পড়িয়া থাকে—তখন এই শূন্য নদীগর্ভে দাঁড়াইলে যতদূর চোখ যায়, উত্তরে পূর্ব্বে, পশ্চিমে দক্ষিণে, ধূসর, রক্তিম, গহ্বর দৃষ্ট হয়। চারিদিকে উঁচুনীচু মাঝারি কঙ্করের গিরিমালার মত; নীচে বালির শয্যা; বালিশয্যার একান্তে কোথাও কোথাও স্বচ্ছ ক্ষীণ জল রেখা। এই জল রেখার তীরে তীরে কেতকী ফুলের ঝোপ; যেখানে মাটির অংশ বেশী সেখানে হৈমন্তিক ধানের ক্ষেত। এই ক্ষেতের পাশে পাশে শরৎকালে কাশের ফুল ফোটে, তখন শাদায় আর সবুজে বাতাসের সঙ্গে ঢেউ তোলার প্রতিযোগিতা করিতে থাকে; বর্ষায় আর শরতে প্রকৃতির এই দিগন্তব্যাপী গেরুয়ার মধ্যে শাদা আর সবুজের প্রক্ষেপ দেখা যায়।

বৎসরের বাকি সময়ে এই দগ্ধ, ধূসর, রক্তিম, বন্ধুর, তরঙ্গায়িত ভূখণ্ড আনন্দমঠের সন্তানবাহিনীর পুঞ্জ পুঞ্জ গেরুয়াবস্ত্ররাশির মত পড়িয়া থাকে। খোয়াই আর কিছুই নয়, জলহীন, জীবনহীন, নিস্তব্ধ লোহিত সমুদ্র মাত্র।

কোপাই এই লোহিত সমুদ্রের একান্তে প্রবাহিত। খোয়াই হইতে জলসঞ্চয় করিয়া সে জীবন ধারণ করে। খোয়াই যখন জল সরবরাহ করে না, তখন কোপাই শুষ্ক; আবার বর্ষাকালে খোয়াইএর লাল জলের বদান্যতায় সে নিজেও লোহিত সমুদ্রের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘোষণা করে।

উৎস হইতে আরম্ভ করিয়া কোপাই-এর গতি পথের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। তীরভূমি অত্যন্ত নীচু, অনেক স্থানেই নদী-গর্ভের সমতল; দুই তীরে মাঠ, সে মাঠে ধান ছাড়া আর কিছু ফলে না। নদীর শেষের অংশটায় তীরভূমি অত্যন্ত উচ্চ, নদীগর্ভ গভীর; গ্রীষ্মকালেও হাটুজল থাকে; তীরভূমিতে কোথাও কোথাও গভীর বন, শাল, তাল, পলাশ, সেগুনের।

তালবনী এই শেষোক্ত অংশের তীরে, দুই দিকের উচ্চ মালভূমির মধ্য দিয়া কোপাই একটা উপত্যকার মত সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তালবনীর পরে ক্রোশখানেক দূরে নদী রেলপথকে অতিক্রম করিয়াছে; সেখানে একটা লৌহ সেতু। সেতুর স্তম্ভগুলার গোড়াতে প্রচুর পাথর ঢালা। বর্ষাকালে জলের তোড়ে আর পাথরের বাধায় এখানে একটা প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া যায়। রেলপথ পার হইয়া কোপাই উত্তর পূর্ব্বমুখে চলিয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ গিয়া বক্রেশ্বর নদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—এখানে কোপাই-এর শেষ।

কোপাই-এর বিবরণ কিছু বিস্তৃত ভাবেই দিলাম—কারণ এই কাহিনীতে কোপাইকে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। সে এই কাহিনীর নায়িকা—কিম্বা নায়িকাদের মধ্যে অন্যতরা।

৯

গভীর রাত্রিতে বিমলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল শালফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে, মনটা ভারি খুসী হইয়া উঠিল। তার পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না, নড়িতেও কষ্ট হই'ত সে উঠিতেও পারিল না, নির্জ্জীবের মত শুইয়া থাকিয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুক ভরিয়া শালফুলের গন্ধ লইতে লাগিল।

হঠাৎ মনে পড়িল এ গন্ধ আসে কোথা হইতে? আগে তো কোন দিন শালফুলের গন্ধ ঘরে বসিয়া পায় নাই। আধ ক্রোশ দূরে নদীর ওপারে একটা শাল বন আছে সত্য, তা'তে ফুল ফুটিয়াছে। কিন্তু সে গন্ধ তো এখানে আসিবার কথা নয়। বাতাস দক্ষিণ হইতে বহিতেছে, বনটা উত্তর দিকে! সে ভারি বিস্মিত হইল!

ঘর অন্ধকার, কেবল জানালা দিয়া গোটা কয়েক তারা দেখা যাইতেছে। হঠাৎ তার মনে হইল ঘরের মধ্যে কে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কুণ্ঠিত পায়ের লঘু শব্দ! তার একবার মনে হইল মিতন নাকি! কিন্তু মিতনের পায়ের শব্দ তো ওরকম নয়। পর মুহূর্ত্তেই সে অদূরে নিদ্রিত মিতনের নিঃশ্বাসের সমতাল ছন্দ শুনিতে পাইল! নাঃ মিতন ঘুমাইতেছে! তবে এ কে?

সে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে অস্পষ্ট একটা মূর্ত্তির রেখা-বিন্যাস চোখে পড়িল! মানুষ-ই বটে! তবে কি চোর ঢুকিয়াছে! চোর হইলে চীৎকার করা উচিত, মিতনকে ডাকা উচিত, কিন্তু সে সব কিছুই সে করিল না। তন্দ্রা, ক্লান্তি, আঘাতের গুরুত্ব সব মিলিয়া তার ইচ্ছাশক্তিকে যেন শিথিল করিয়া দিয়াছে। সে ভাবিল আচ্ছা দেখাই

যাক্ না লোকটা কি করে—এ ঘরে আর এমন কি আছে যা চোরে লইতে পারে, বা লইলে তার ক্ষতি হইবে!

তারার আলোর প্রতিফলনে মূর্ত্তিটা স্পষ্টতর হইল। ভাল করিয়া দেখিয়া মনে হইল যেন একজন স্ত্রীলোক। মুখের চারিপাশে কুঞ্চিত চুলের কালোমেঘ! ফুলের গন্ধ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, যেন নিকটেই কোথাও শালফুল ফুটিয়াছে। বিমল একবার নিঃসংশয়ে বুঝিল সে স্বপ্ন দেখিতেছে, নতুবা এখানে অর্দ্ধরাত্রে নারীমূর্ত্তি আসিবে কেমন করিয়া! কিন্তু পরেই আবার মনে হইল স্বপ্ন কোথায়! সে তো দিব্য জাগিয়া আছে, ওই তারা, ওই মিতনের নিঃশ্বাসের শব্দ; চোখে হাত দিয়া দেখিল চোখ তার খোলা! তখন তার মনে পড়িল এই রকম এক নারীমূর্ত্তি সে যেন কোথায় দেখিয়াছে! ঠিক ওই উচ্চতা, ওই চূর্ণালক রাশি, দেহরেখার ওই ছন্দ। স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে পড়িল না; সে মূর্ত্তি যেমন অস্পষ্ট, এ মূর্ত্তিও তেমনি আবছায়া! সে বিহ্বলের মত তাকাইয়া রহিল—মূর্ত্তি যেন ক্রমে অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। বিমল বুঝিল স্বপ্ন হইলে স্বপ্ন মিলাইতেছে, সত্য হইলে মূর্ত্তি চলিয়া যাইতেছে! ক্রমে মূর্ত্তি আর দেখা গেল না। হয় স্বপ্ন ভাঙিয়াছে, নয় সত্য দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু শাল ফুলের গন্ধ তেমনি উগ্র, তেমনি নিকটবর্ত্তী। বিমল মূঢ়ের মত শুইয়া রহিল, আর শালফুলের মদির উগ্রতা মর্চে-পড়া কুলুপ দিয়া তার স্মৃতির প্রাসাদের একটার পরে একটা প্রকোষ্ঠ খুলিয়া চলিতে লাগিল!

পরদিন ভোর বেলা জাগিয়াই সে শাল ফুলের গন্ধ পাইল, তখনি রাত্রির ব্যাপারটাকে নিঃসন্দেহ স্বপ্ন বা বড় জোর ক্লিষ্ট ইন্দ্রিয়ের একটা ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারিল। ফুল নিকটেই কোথাও ফুটিয়াছে, তারই গন্ধ আসিতেছে, রাত্রেও এই গন্ধই পাইয়াছি, স্বপ্নিত নারীমূর্ত্তির কথা সে ভুলিয়াই গেল।

কিছুক্ষণ পরে মিতন ঘর পরিষ্কার করিবার সময়ে বিমলের খাটে নীচে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—হেথায় কে আনলেক !

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—কি রে ?

মিতন সেটা টানিয়া বাহির করিতে করিতে বলিল—শালের ফু বটে গো।

বিমল দেখিল একগুচ্ছ শালের ফুল ! সে চমকিয়া উঠিল—তবে ি ব্যাপারটা স্বপ্ন নয় ! সেই নারীমূর্ত্তিই কি এই গুচ্ছ হাতে করিয়া ঘ ঢুকিয়াছিল, নতুবা এ কে আনিল ? তার মনে পড়িল মূর্ত্তি নিকটত হইলে গন্ধ উগ্রতর হইয়াছিল ; মূর্ত্তি চলিয়া গেলেও যে গন্ধ ছিল তা কারণ গুচ্ছটাই পড়িয়াছিল ! কে সে নারী ? কেন সে এখানে আসিল ? আর কেন ই বা সে এ তোড়া এখানে ফেলিয়া গেল !

মিতন কাজ সারিয়া চলিয়া গেল, বিমল সেই তোড়াটা হাতে লইয় মনে মনে সেই স্বপ্নমৃগীর অনুসরণ করিতে লাগিল। হঠাৎ তার চোখে পড়িল একি ? গুচ্ছটা এ কি দিয়া বাঁধা ! সূক্ষ্ম, সুদীর্ঘ, চিক্কণ একটি কালো চুল দিয়া ! তার মনে হইল যে-অজস্র কুঞ্চিত কেশ সেই মুখমণ্ডল ঘিরিয়া ছিল—এ চুলটিও তাদেরই অন্যতম ! পাছে মিতন ফিরিয়া আসিয়া তোড়াটাকে আবর্জ্জনা মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়, তাই-সে কোন রকমে মাথা তুলিয়া তোড়াটাকে বালিশে তলে চাপিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তোড়াটাকে মাথা দিয়া চাপি । আর কি হইবে, সেটা তখন তার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে কিছুতেই সেই পুষ্পগুচ্ছের কথা ভুলিতে পারিল না।

১০

বেলা দশটায় বিমলকে দেখিবার জন্য বোলপুর হইতে হরি ডাক্তার আসিল ; সে রোজই একবার করিয়া বিমলকে দেখিয়া যায়।

হরি ডাক্তার লোকটি আর দশ জনের মত নয়—একটা আস্ত লোকের বুকে পিঠে দু'খানা তক্তা দিয়া চাপিয়া দিলে যেমন হয় লোকটি তেমনি—আগাগোড়া চেপ্টা একটা মানুষ ; গায়ের রং বার্ণিশ-করা কালো ; চলিবার সময়ে টলিয়া টলিয়া হাটিবার অভ্যাস আছে ; লোকে বলে মদ খাইয়াছে ; কথাটা সর্ব্বতোভাবে সত্য নয় ; রাত্রি বেলা সে মদ খায় ; হয় তো বাড়ীতে তখন টলিয়াও থাকে, কিন্তু বাড়ী হইতে মদ খাইয়া বাহির হওয়া তার অভ্যাস নয় ; টলিয়া হাটা তার একটা মুদ্রা দোষ। কালো রংটাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে শাদা পোষাক পরে ; বুকের কাছের বোতামে একটা গোলাপ ফুল আটকানো। ডান হাতটা অকারণে শূন্যে নাড়াইতে থাকে—যেন অদৃশ্য রোগীর উপরে সর্ব্বদা ছুরি চালাইতেছে। লোকটা অল্পেই হাসে—সে হাসি সাপের হাসি, কেহ কখনো তার শব্দ শোনে নাই। লোকটা চিকিৎসক ভাল।

বাগানের বাহিরে ঘোড়ার গাড়ী থামিল ; হরি ডাক্তার বাগানে প্রবেশ করিল, অদূরে মিতনকে দেখি জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছে ? মিতন স্ফীত উদরের উপরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—খুব ভাল।

টলায়মান ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল—রাত্রে ঘুম হয়েছিল—

মিতন বলিল—খুব ঘুম হয়।

ডাক্তারও হাসিল, মিতনও হাসিল। রোগীর আরামের গৌরবে

দুই জনেই অংশীদার, প্রায়ই তাদের মধ্যে এই গৌরবের অংশ লইয়া মানসিক দড়ি-টানাটানি হইয়া থাকে—এই হাসি তারই চিহ্ন।

চল দেখা যাক্—বলিয়া ডাক্তার জুতার শব্দ করিয়া অগ্রসর হইল—মিতন পিছনে আসিতে লাগিল।

—কি বিমলবাবু কেমন আছ? বলিয়া ডাক্তার ঢুকিল। বিমল তখন দেয়ালের দিকে মুখ দিয়া রাত্রের সেই-স্বপ্নটার টীকাটিপ্পনী ভাষ্য করিতেছিল।

বিমল হরিবাবুকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে ভাল।

ডাক্তারের মুখে নিঃশব্দ হাসি স্ফুরিত হইল।

—কি বিপদেই না ফেলেছিলে তুমি! ভবিষ্যতে আর বাঘটাঘ মারতে যেও না!

হরি ডাক্তার বিমলের পিতার সহপাঠী। বিমলকে তুমি বলে; মাঝে মাঝে লঘুভাবে বিমলবাবুও বলিয়া থাকে।

—যে রকম ব্যাপারটা করেছিলে! আর একটু বেশী হলে আমারও সাধ্য ছিল না। আচ্ছা দেখি কি সব ওষুধপত্র আছে!

এমন সময় সে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল দেখি, দেখি ওটা কি?

বিমল ভাবিল ডাক্তার কোন রকমে বোধ হয় বালিশের তলায় ফুল দেখিয়া ফেলিয়াছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ডাক্তার তখন ঘর ছাড়িয়া বাগানের মধ্যে গিয়া উপস্থিত। ব্যাপার কি? বিমল ভাবিল আজ কি তবে সকাল বেলাতেই! হুঁ ঠিক্ তাই, নতুবা সে হঠাৎ কাঁঠাল গাছটার দিকে যাইবে কেন? গাছের তলায় গিয়া ডাক্তার, সাহেবী পোষাক-পরা সেই ডাক্তার একেবারে সোজা গাছে উঠিয়া গেল! আর সন্দেহ নাই, আজ দিনের বেলাতেই! কিন্তু সেটা তো অভ্যাস নয়!

বিমল জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল—হরি ডাক্তার বড় দেখিয়া একটা এচোঁড় একটানে ছিঁড়িয়া লইল; আবার পর মুহূর্ত্তেই তেমনি বিনা আড়ম্বরে গাছ হইতে নামিয়া টলিতে টলিতে (টলাটা এখন কিছু বেশী) বিমলের ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ঘরে ঢুকিয়া সগর্ব্বে এচোঁড়টা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দেখেছ বিমল! বিমল এচোঁড় দেখিয়াছে এবং এচোঁড় পাড়িবার ভঙ্গীও দেখিয়াছে! ডাক্তারের মুখে মুহুর্মুহু নিঃশব্দ হাস্য স্ফুরিত হইতে লাগিল; যেন গাছে এচোঁড় ফলিবার গৌরব তারই। দারার মুণ্ড পাইয়াও আরংজেব এমন আনন্দ বোধ হয় লাভ করে নাই।

বিমল বলিল—বেশ হ'ল ডাক্তারবাবু, কাল আপনার তরকারী হবে!

কাল! ডাক্তার চমকিয়া উঠিল। বলিল--আজ! আজই—এখনই ফিরে গিয়ে দুপুর বেলা এই তরকারী হবে, তবে খেতে বস্‌বো।

বিমল বলিল—আপনি বল্‌লেই আমি চাকর দিয়ে পাড়িয়ে দিতাম।

ডাক্তার হাসিয়া উঠিল—এমন অর্ব্বাচীনের মত কথার কি উত্তর সে দিবে?

—কই কি ওষুধ আছে দেখি?

মিতন দেখাইল; ডাক্তার নতুন ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া বলিল—বিমলবাবু, আর যাই কর, বিছানা থেকে উঠোনা; আরে একটি মাস শুয়ে থাক্‌তে হবে।

বিমল সঙ্কোচের সহিত বলিল—কল্‌কাতায় গেলে হ'ত না।

—কল্‌কাতায় কে ভাল ডাক্তারটা আছে শুনি! বড় বড় সব ডিগ্রি আর মুঠো টাকা এই তো! আমি সব জানি!

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আর যাবেই বা কি করে? একটু

নড়েছ কি আবার, রক্তপড়া সুরু হবে! ভালো হ'য়ে যেও। আর গিয়ে খোঁজ নিয়ো ক'জন ডাক্তার চিকিৎসা জানে! আমাকে জানে মেয়ো হাসপাতালের সার্জ্জেন। দুজনে এক সঙ্গে [illegible]ছি। নাও বেলা হ'ল উঠি।

এই বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। মিতন ওষুধের বাক্স লইয়া এচোঁড়টি লইতে গেল; ডাক্তার ছোঁ মারিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া ধিক্কারের দৃষ্টিতে মিতনের অনধিকার চর্চ্চার প্রতি একবার তাকাইল। তারপরে এচোঁড়টি নাকের কাছে ধরিয়া টলিতে টলিতে রওনা হইল।

ডাক্তারকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া মিতন ফিরিলে বিমল বলিল—মিতন রোজ একটা করে' এঁচোড় পাড়িয়ে রাখবি। আর ডাক্তারবাবু এলে দিবি, ভুলিসনে।

মিতন জানাইল সে কখনো ভুলিবে না।

১১

সন্ধ্যা বেলায় পতিতপাবনবাবু বিমলকে দেখিতে আসিলেন। বিমল ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই তিনি বলিলেন তোমার কিছু করতে হবেনা! আহা-হা, তুমি উঠোনা বাপু! আমি বসছি!

এই বলিয়া তিনি বিছানার পাশে একটা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া লাঠিখানাকে সযত্নে দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারপরে আছ কেমন? ডাক্তার এসেছিল আজ!

বিমল বলিল—আজ্ঞে, এসেছিল, ক্রমে একটু একটু করে সুস্থ বোধ করছি—কিন্তু উঠ্‌বার শক্তি ফিরে পেতে বোধ হয় এখনো একমাস।

—একমাস, খুব কম হ'ল হে! আমরা তো ভাবছিলাম, দু'মাস না তোমাকে শুইয়ে রাখে!

বিমল হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে, তা'হলে আর বাঘে দোষ করেছিল কি? দু' মাস শু'য়ে থাকতে হ'লে ওতেই মরে যাবো!

তারপরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাইরে কেউ আছে নাকি?

পতিতপাবনবাবু দরজার বাহিরে তাকাইয়া যেন কাকে দেখিতে-ছিলেন। বিমলের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—ফুলু সঙ্গে এসেছে কিনা?

তারপরে একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—ফুলু কিনা আমার নাতনী!

বিমল ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—কিন্তু তাঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন? কি অন্যায়!

তারপরে অন্তরালের দিকে আহ্বানের সুরে বলিল—আসুন, ভিতরে আসুন।

পতিতপাবনবাবু বলিলেন—ভিতরে আয়। সঙ্কুচিত ফুলু ভিতরে

প্রবেশ করিল। বিমল পতিতপাবনবাবুর পাশে একখানা চে
দেখাইয়া বলিল—ওইখানে বসুন! কিন্তু ফুলু সেখানে না বসিয়া বিম
মাথার দিকের একখানা চেয়ারে বসিল। বিমলের ইচ্ছা পূর্ণ হইল ন
বিমল যে ঘাড় ফিরাইয়া তাকে দেখিবে, সে শক্তি তার নাই। বি
সে ঘরে ঢুকিবার সময়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য তার চুলের রাশি দেখি
বিমলের মনে পড়িল, সেদিন বন্দুক আনিতে গিয়া দরজার ফাঁক দি
একবার একেই দেখা গিয়াছিল।

পতিতপাবনবাবু নাতনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—বল্‌বো না
সব কথা, দিদি। ফুলু তর্জ্জনী অধরোষ্ঠে স্থাপন করিল। পতিতপাবন
বাবু হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, এখন নিষেধ করিলে কি হবে!—বুঝ
বিমল, তোমার বাঘ শিকারে গাঁশুদ্ধ তোমার প্রশংসা করছে, কেব
আমার এই নাতনীটি বাদে! তুমি বিষম আহত হয়েছ শুনে আমর
সকলে যখন দুঃখ করছিলাম, ফুলু কি বলছিল জানো—এই পর্য্যন্ত বলিয়
তিনি থামিয়া শ্লেষ্মার আক্রমণ হইতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়
বলিলেন—(ইতিমধ্যে ফুলুর তর্জ্জনী পুনরায় অধরোষ্ঠে স্থাপিত হইয়াছে
ও বলছিল, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! শুধু হাতে বাঘ শিকার করতে
গেলে ওই রকমই হয়।

বিমল বলিল—উনিতো ঠিকই বলেছেন। তবে আমাকে যতটা
দোষী মনে করেছেন, ততটা দোষ আমার নয়। আপনার ওখানে বন্দুক
না পেয়ে আমি শিকার করবার ইচ্ছা ছেড়ে দিয়েই ও‌খানে গিয়েছিলাম।
ওখানে দৈবাৎ একটা বন্দুক মিলে গেল। কিন্তু তার একটা ঘোড়া যে
এমন খোঁড়া তা কি করে জানবো?

পতিতপাবনবাবু বলিলেন—বিমল আমার আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে কি
জানো—সবটাই দৈব!

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

—কেন কি? বন্দুকের বাক্সের চাবি না পাওয়া দৈব ছাড়া আর কি? ফুলু তখন খুঁজে পেল না, কিন্তু তুমি চলে যেতেই আমি উঠে গিয়ে দেখি আলমারির মাথার উপরে ঠিক জায়গাতে চাবিটা রয়েছে। আমি ফুলুকে বললাম বন্দুকটা বের করে না হয় তোমায় পাঠিয়ে দি। ফুলু কি বল্‌ল জানো (ইতিমধ্যে ফুলু হতাশ হইয়া তর্জ্জনী নামাইয়া লইয়াছে) উনি বোধ হয় বন্দুক না পেয়ে খুসীই হয়েছেন! বীরত্বের দাবীও করে গেলেন, আবার বিপদের মুখেও যেতে হ'ল না! এতো আর এম, এ পাশ করা নয়। বুঝলে বিমল, দিদি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর থেকে কাউকে আর পণ্ডিত বলেই স্বীকার করতে চায় না। আমাকে তো বলে সেকেলে এণ্ট্রান্স পাশ। আমি বলি পুরানো বলেই আমাদের বিদ্যার দাম বেশী—যেমন পুরানো ঘি। এই বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ফুলু দেখিল দাদামহাশয় ক্রমেই এ স্থান তার পক্ষে অসহ্য করিয়া তুলিতেছেন, তাই সে বলিল—দাদামশায় চল, সন্ধ্যা হ'য়েছে।

বিমল পতিতপাবনবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিল—আর একটু বসুন না—এখনো অন্ধকার হয়নি।—এই বলিয়া সে পায়ের দিকের দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকাইল, এবং ঘড়ি দেখিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল—একি! বড় আয়নাখানাতে এ কার ছায়া! নিশ্চয়ই শিয়রের কাছে বসা মেয়েটির! কিন্তু এ মুখ তার এত পরিচিত হইল কিরূপে কোথায় সে এই মুখ দেখিয়াছে?

পতিতপাবনবাবু বলিল—দেখ বিমল, এইমাত্র দৈবের কথা বলছিলাম—আর একটা দৈব দেখ! তুমি এসেই বলছিলে তিন দিন পরে ফিরে যাব, তার জায়গায় আজ তিন সপ্তাহ হ'য়ে গেল। একি কম দৈব?

বিমল বলিল—একবার উঠিতে পারলেই কলকাতা চলে যাবো—অ
এ গাঁয়ে আসছি না।

পতিতপাবনবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—মনের ইচ্ছা অত জো
বলতে নেই ওতে দৈবের জিদ বেড়ে যায়। মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে দৈবে
নিরন্তর দ্বন্দ্ব চল্‌ছে, এইতো জীবন! হয়তো দেখবে, ভালো হ'য়ে উঠলে
তুমি আর গ্রাম ছাড়তে চাইবে না।

বিমল সংক্ষেপে বলিল—অসম্ভব।

পতিতপাবনবাবু বলিতে লাগিলেন—সংসারে সম্ভব অসম্ভবের সীঃ
অত সুনির্দ্দিষ্ট নয়। ওটা যেন সমুদ্রের তীর, জোয়ার ভাটার লীলা
জন্য আসর অনেকটা প্রশস্ত। পতিতপাবনবাবু আরো কত কি বলিয়
যাইতে লাগিলেন, কিন্তু বিমলের মন আর সে দিকে ছিল না
সে কেবল ভাবিতে লাগিল—এ নারীমূর্ত্তি এত পরিচিত হইল কেমন
করিয়া! অবশেষে রাত্রির স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া চমকিয়া উঠিল—এই
তো সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি! কিন্তু তখনি মনে হইল যা কখনো দেখা হয়নি
স্বপ্নে কি তা দেখা সম্ভব! না অসম্ভব! তবে কি বুঝিতে হইবে সেটা
স্বপ্ন নয়, এই নারীমূর্ত্তি অন্ধকারে, একাকী, তার ঘরে আসিয়াছিল? সে
যে আরও অসম্ভব! কিন্তু তখনি আবার পতিতপাবনবাবুর সন্ত
ধ্বনিত উক্তি মনে পড়িল জীবনে সম্ভব অসম্ভবের সীমা অত সুনির্দ্দিষ্ট
নয়। সত্যই হোক, স্বপ্নই হোক, বিমল আয়নার কাচে সেই ছায়ামূর্ত্তি-
তন্ময়ভাবে দেখিয়া যাইতে লাগিল!

অন্ধকার গাঢ় হইলে পতিতপাবনবাবুরা চলিয়া গেলেন, কিন্তু বিমল
ছুটি পাইল না। তার মন স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রদোষান্ধকারের মধ্যে কুলায়-
ভ্রষ্ট বিহঙ্গের মত ইতস্ততঃ উড়িয়া ফিরিতে লাগিল।

১২

আয়না হইতে ছায়া মিলাইয়া গেল, কিন্তু বিমলের মন হইতে মিলাইল না। এতক্ষণে সে মনের মধ্যে তাকাইয়া দেখিবার সুযোগ পাইল। সে পরম আগ্রহশীল অনুসন্ধিৎসুর মত সেই ছায়া বিশ্লেষণে লাগিয়া গেল।

ছায়াটিকে (কাজেই মেয়েটিকে) সুন্দর বলাই উচিত। তার বর্ণ স্বচ্ছ; অলঙ্কার শাস্ত্রে যে-সব বর্ণের কথা সে পড়িয়াছে, তার কোনটির সঙ্গেই মিল নাই। বিমল তার জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছে, অলঙ্কার শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে জীবনের ঐক্য কদাচিৎ ঘটে, তার কপোলের দর্পণের মত স্বচ্ছ নির্ম্মলতার উল্লেখ অলঙ্কার শাস্ত্রে কোথাও নাই, কিন্তু ওইতো তার একমাত্র উপমা—প্রচুর কেশ আলগাভাবে খোঁপায় বদ্ধ, তৎসত্ত্বেও অনেকগুলি অবাধ্য কুঞ্চিত অলক কপালের সীমান্তে দুলিতেছিল। পতিতপাবনবাবু যখন তার রহস্য প্রকাশ করিতে-ছিলেন, তখন অলৌকিক চন্দনবিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পলাতক অলক গুচ্ছকে সিক্ত করিয়া কপালে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অধরোষ্ঠ নীরব থাকিলেও যে শূন্য নয়, শ্লেষোক্তির অক্ষয় বাণে যে পূর্ণ, কেন জানি বিমলের এমন ধারণা হইয়াছিল। তার বর্ণকে যদি স্বচ্ছ বলা চলে, তার কণ্ঠের ভাবটিকে একমাত্র স্নিগ্ধ এই বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়—যেমন স্নিগ্ধতা জড়াইয়া থাকে সন্ধ্যার সদ্যঃস্ফুট রজনীগন্ধার পেলবতায়, ওটা যেন চোখ দিয়া দেখিবার নয়, ত্বক্‌দ্বারা অনুভব করিবার; আর দুই চোখের নীরব মুখরতায় বারে বারে কৌতুককণা বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

বিমল যখন দর্পণে ছায়া দেখিতেছিল, তখনই যে এ সব সে দেখিয়াছিল এমন নয়, বরঞ্চ সে তখন আবছা রকমের একটা ছায়া ছাড় আর কিছুই দেখে নাই, এ সব তার বিশ্লেষণের ফল। রাত্রি জাগিয় মনের মধ্য হইতে খুটিয়া খুটিয়া স্মৃতির কণাগুলি সংগ্রহ করিয়া এই মূর্ি সে গড়িয়া তুলিয়াছিল।

তার মনে হইল এই নারীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা বার্দ্ধক্যের সান্ত্বনা। কারণ কপোলের ওই বেলফুলের স্বচ্ছতা, কণ্ঠে ওই রজনীগন্ধা স্নিগ্ধতা বয়সের সঙ্গেই ঝরিয়া যাইবে। অবাধ্য অলকের অজস্রতা বির হইয়া আসিবে, সেদিন সেই বার্দ্ধক্যের সায়াহ্নে, সেই লোচনগ্রাহিতা দিনান্তের অন্ধকারকে বুদ্ধির স্থিরদীপ্তির সন্ধ্যাতারাই কেবল কত পরিমাণে ভাস্বর করিয়া তুলিতে পারে। অধিকাংশ নারীতেই তাহ থাকে না। তাই যৌবনে যারা লোচনগ্রাহী, যৌবনান্তে আর তার হৃদয়গ্রাহী হয় না! এই মেয়েটির মধ্যে, তার নীরব অধরে এবং চঞ্চল চোখে যেন তারই আভাস! আজ যৌবনের মধ্যাহ্নে কাননে অ অনেক ফুল আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আগ্রহশীল চোখ বুঝিতে পারে তাহারই একান্তে কোথায় যে একটি শ্বেতকহ্লার নিদ্রিত। সন্ধ্যা আসিবে, এইসব দিনাশ্রয়ী ফুল ঝরিয়া যাইবে, তখন রাত্রির সেই নিঃস আসরে কুঁড়িকে দীর্ণ করিয়া সেই শ্বেতকহ্লার শতদলে প্রস্ফুটিত হইয় বুদ্ধির অচপল শুভ্রতা বিস্তার করিয়া ধ্যানাসনে জাগিয়া থাকিবে।

বিমলের মনে হইল বিবাহ করিতে হইলে এই রকম নারীকেই কর উচিত। পাঠক ভুল করিওনা। বিমল আদৌ মেয়েটির প্রতি আসক্ত নয়, বাস্তবে তাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আদৌ তার নাই। তবে এম কেন সে ভাবিল? কারণ মানুষের স্বভাবই ওই! সে শৈশবে বাল্যকালে নারীমাত্রকেই মাতৃরূপে কল্পনা করে, এবং যৌবনে পত্নীরূপে

ও বার্দ্ধক্যে কন্যারূপে কল্পনা করিয়া থাকে! অসহায় গাছের অনেকগুলি শিকড় যেমন নিজেকে মাটির উপরে খাড়া করিয়া রাখিবার জন্যই নিযুক্ত, মানুষও তেমনি কল্পনার সম্বন্ধসূত্রে নিজেকে সংসারের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দশ জনের একজন করিয়া তোলে! নারীকে সে বিশুদ্ধ নারীরূপে কখনো কল্পনা করিতে পারে না।

বিমলের মনে হইল পূর্ব্বরাগের পক্ষে একটা রঙীন পুতুলই যথেষ্ট, সংসারের পক্ষে একটা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন নারীই যথেষ্ট, কিন্তু দীর্ঘ সংসার যাত্রার বাঁকে বাঁকে যেসব অভূতপূর্ব্ব সুখদুঃখ থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যখন শ্রমসাধ্য হইয়া ওঠে, তখন বুদ্ধির দীপ্তি ছাড়া সান্ত্বনা কোথায়! সৌন্দর্য্য বল, অর্থ বল, পাণ্ডিত্য বল, সেই শুভবুদ্ধির কাছে কিছুই লাগেনা।

বিমল যে তখনই ঠিক এই সব কথা চিন্তা করিয়াছিল তা নয়, বহু রাত্রির, বহু দিনের গবেষণায় সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল।

আরও একটি বিষয়ে সে চিন্তা করিয়াছে, কিন্তু কোন কূল পায় নাই। সে-রাত্রিতে কে তার ঘরে আসিয়াছিল? সে কি ওই মেয়েটি? অসম্ভব। সে কি স্বপ্ন? কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব্বা কি স্বপ্নে সম্ভব? অসম্ভব! অথবা পতিতপাবনবাবুর সেই কথা বারংবার তার মনে হইয়াছে, জীবনে সম্ভব অসম্ভবের সীমা অত সুনির্দ্দিষ্ট নয়।

বিমলের মনে ক্ষীণ আশা ছিল একবার যখন সে আসিয়াছে আর একবারও আসিতে পারে। আর যদি স্বপ্নই হয় মানুষ এক স্বপ্ন কি দুইবার দেখেনা! সে স্থির কারয়াছিল এবারে সে মূর্ত্তি আর তাকে ফাঁকি দিয়া যাইতে পারিবে না। মিতন তার ঘরে ঘুমাইলে অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া তাকে বিমল অন্য ঘরে শুইতে বাধ্য করিয়াছে। তারপরে কতদিন রাত্রিতে সে ঘরের মধ্যে সামান্য শব্দ শুনিবামাত্র জাগিয়া

উঠিয়া খুঁজিয়াছে, দ্রুত হস্তে আলো জ্বালিয়া ফেলিয়াছে; কোথাও
নাই। অনেকদিন সারা রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইয়াছে, কাউকে দে
পায় নাই। অবশেষে সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, সে-রাত্রির অভি
স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। কিন্তু এক স্বপ্ন কি মানুষে দুইবার দে
পায় না? কেন পায় না!

জীবনের স্বপ্নসমুদ্রে বাস্তবের চর; কোথাও সে চর জলের উ
জাগিয়া উঠিয়াছে, কোথাও এখনো মাথা তোলে নাই, ঠিক নীচেই
বালির সৃষ্টি করিয়া করিয়াছে। বিমলের সপ্তডিঙা মধুকর এই
সমুদ্রের মধ্যে চরের বাধা এড়াইয়া, বাস্তবের চোরাবালি বাঁচা
কল্পনার পরপারবর্ত্তী কমলে-কামিনীর অন্বেষণে চলিয়াছে। কোথাও
আছে কি?

১৩

ফুল্লরার সে রাত্রে আর ঘুম আসিল না। বিমল যে এমন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে, সে কল্পনা করে নাই। সে শুনিয়াছিল বিমল বাঘ মারিতে গিয়া আঘাত পাইয়াছে, কিন্তু সে আঘাত যে এমন কে জানিত!

বিছানায় অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিবার পরেও যখন ঘুম আসিল না, সে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি বিসর্জ্জন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; ক্রমে জানালার চৌকাঠের উপরে মাথা রাখিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। তার চিন্তাসূত্রে কেমন যেন জট পাকাইয়া গিয়াছিল—সেটাকে পুনরায় সরল করিয়া আনিতে সে ব্যস্ত ছিল। তার সেদিনের কথা মনে পড়িল, বিমলের বন্দুক চাহিতে আসিবার দিন। কেন জানি না বিমলকে দেখিবামাত্র কেমন একটা অকারণ বিতৃষ্ণার ভাব তার মনে আসিয়াছিল। পতিতপাবনবাবু বন্দুকটা দিতে বলিলেন। সে চাবি খুঁজিবার অছিলায় ভিতরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—চাবি নাই। চাবি যেখানকার সেখানেই ছিল। সে ইচ্ছা করিয়াই বন্দুকটা দেয় নাই। ভাবিয়াছিল বন্দুক না পাইয়া বিমল ফিরিয়া যাইবে—বাঘ শিকার করা ঘটিয়া উঠিবে না? আজ মনে হইল কেন সে এমন কাজ করিয়াছিল! সেদিন যেন সে বিমলের মুখে একটা গর্ব্বের আভাস দেখিয়াছিল—ভাবিয়াছিল বন্দুকটা দিলে, বাঘ মারা পড়িলে সেই গর্ব্বে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে—তাই সে বলিয়াছিল বন্দুক পাওয়া গেল না!

কিন্তু ফুল্লরা নিজের মনটাকে আর একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে

পারিত শুধু এই জন্যই সে বন্দুক দেয় নাই, এমন নয়; আরও একটা কারণ ছিল; সে কথা আজ আর সে স্বীকার করিবে না—তবু ব্যাপারটা সত্য! পাছে ওই লোকটা বাঘ মারিতে গিয়া বিপন্ন হয়, এই আশঙ্কা তার মনে ছিল, তাই সে বন্দুক দেয় নাই। কিন্তু একজন অপরিচিত লোকের জন্য এমন আশঙ্কা কেন? কেন? তবে বলি শোন পরিচয়, অপরিচয়, এ সব সামাজিক ব্যাপার। সংসারের বিচারে হয় তো এর মূল্য আছে, কিন্তু মনের চাল অন্য রকম! মনের চলন দাবা খেলার ঘোড়ার চালের মত, একটা ঘরকে ডিঙাইয়া, আর এক ঘরে গিয়া উপস্থিত হয়—মাঝখানে যে ফাঁক পড়িল, সেটাতেই যত গোলমাল বাধে!

সেদিন সন্ধ্যাতেই সে শুনিয়া ছিল বিমল আহত হইয়াছে। শুনিয়া কেমন যেন সে খুসী হইয়া উঠিয়াছিল! বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! কিন্তু এ খুসীর রং বেশিক্ষণ টিকিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল এই খুসী উৎসবের দীপ নয়, চিতার অগ্নিশিখা! রাত্রিটা সে ঘুমাইতে পারে নাই! শুধু সে রাত্রিটা নয়, তার পরের অনেক রাত্রি।

অবশেষে এই বিপদের জন্য নিজেকেই দায়ী করিয়াছিল। সে বন্দুকটা দিলেই পারিত, তা হইলে এমন বিপদ ঘটিত না!

মাঝে মাঝে পতিতপাবনবাবুর মুখে সে টুকরা টুকরা সংবাদ পাইত। বিমলের অবস্থা খারাপ, আজ একটু ভাল, আজ ডাক্তার এই বলিল—তিনি বোধ হয় অপারেশন করিবেন, বোধ হয় কলিকাতা লইয়া যাইতে হইবে। একদিন পতিতপাবনবাবু বিমলের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—বিমল অজ্ঞান হয়ে আছে, মানুষ চিন্‌তে পারছে না, কি হয়।

সেদিন রাত্রে সে এমনিভাবে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। বাড়ীতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িল এমন কি চাকরদের ঘরের সাড়াও বন্ধ হইয়া আসিল। গুমোট গরমে ফুল্লরার ঘুম আসিতেছিল না। হঠাৎ সে এক কাজ করিয়া বসিল! ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া বিমলের বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। সে ভাবিয়াছিল বিমলের বাড়ীতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে। প্রথমে তাও ভাবে নাই, ভাবিয়াছিল মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই বাড়ী ফিরিবে। ক্রমে যখন সে নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনি বিমলের বাড়ী যাইবার কথা মনে হইয়াছিল! তার বাড়ীর কাছে গিয়া দেখিল সব নিস্তব্ধ। ঘরের কাছে গেল, দেখিল দরজা খোলা ভিতরে সকলে বোধ হয় নিদ্রিত। ভিতরে যাইবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। লোভও বটে, আবার ভয়ও বটে, এক কথায় কৌতূহল। ভিতরে সে বেশিক্ষণ থাকে নাই—কেবল এক মুহূর্ত্ত! বিমল কি তাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল!

ফুল্লরা হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল। গালে কি যেন অনুভব করিয়া হাত দিল; দেখিল চোখ হইতে জল পড়িতেছে! অবাধ্য চোখের জলের ফোঁটা একটা আর একটাকে অনুসরণ করিয়া গাল ভিজাইয়া জানালার চৌকাঠে গিয়া পৌঁছিতেছে!

সে বাহিরে তাকাইল—আকাশ অন্ধকার, আর অন্ধকার ভরিয়া হাজার হাজার তারা। দূর বনে বাতাস উঠিয়াছে, তারই মর্ম্মর শব্দ! এখনি শালফুলের গন্ধ বহিয়া বাতাস আসিয়া পৌঁছিবে! তার দৃষ্টি ক্রমে মধ্যাকাশ হইতে দিগন্তের দিকে নামিয়া আসিল—সেখানেও কয়েকটা তারা! কিন্তু ওদের মধ্যে সব ক'টাই কি তারা, না, একটা পৃথিবীর দীপও আছে? সে বুঝিতে পারিল—অদূরে, অন্ধকারের জন্য

দূরে বলিয়া মনে হইতেছে, বিমলের বাড়ীর একটা আলো দেখা যাইতেছে। তারা এবং দীপ এবং রোগশয্যা, এবং রুগ্ন মুখ। কোথা হইতে কোথায় আসিল! এ সেই দাবাখেলার ঘোড়ার চাল মাঝে একটা ঘর ডিঙাইয়া আর এক ঘরে উপস্থিতি!

ফুল্লরা বিছানায় গিয়া শুইল—কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। সৈন্য বাহিনী দেশত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে সেতু ভাঙিয়া দিয়া যায় শুধু স্তম্ভ ক'টা পড়িয়া থাকে; বিপক্ষ শত্রুদল আসিয়া সেই স্তম্ভগুলির উপরে কাঠ, লোহা ফেলিয়া যাতায়াতের পথ তৈয়ারি করিয়া লয় মানুষ নিজে একাধারে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ। জীবনপথের সেতুগুলি সে ভাঙিয়া দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে—আবার হঠাৎ কখন দরকার পড়ে সে সেই সেতুবন্ধ করিতে বসিয়া যায়। ফুল্লরার আজ এই রকম সেতুবন্ধ করিবার পালা!

এ রকম যে হয় তার কারণ মানুষের চৈতন্যে কাল নিরবচ্ছিন্ন নয়, কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টি মাত্র। এখানে একটি বিন্দু, ওখানে একটি, মাঝখানে আর একটি; এই বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলিকে অবসর সময়ে সে কল্পনার দ্বারা পূরণ করিয়া লয়, তাই কালকে অখণ্ড প্রবাহ বলিয়া মনে হয়। আর বাস্তবিক পক্ষেও কাল জলপ্রবাহের মত অবিচ্ছিন্ন নয়, বোধ হয় তার গতিকে প্রবাহ বলাই ভুল। কালের গতি ব্যাঙের লাফের মত, এখান হইতে ওখানে, সেখান হইতে এখানে সে চলে— মাঝখানে বড় বড় ফাঁক, যেখানে কালের কোন চিহ্ন পড়ে না।

ফুল্লরার মনে পড়িল শৈশবের ভদ্রপুর গ্রাম, নলহাটির কাছেই। তাদের বাড়ীর সম্মুখে একটা মাঠ; বাঁ দিকে গভীর খোয়াই; আর একটু দূরে গোটা কয়েক উঁচু টিলা; সেখানকার লোকে সেগুলিকে পাহাড় বলে। সূর্য্যাস্তের সময়ে এই পাহাড়ে কি রকম ভাবে রং

বদলাইত; ছায়া পড়িত, ছায়া গাঢ়তর হইতে হইতে কখন হঠাৎ অন্ধকারে পরিণত হইত! শৈশবের স্মৃতির মধ্যে পাহাড়ের এই ছায়া বিছাইয়া দিবার কথাই তার বেশী মনে পড়ে। আর একটু বড় হইলে হঠাৎ একদিন মার মৃত্যু হইল। তার পিতা গ্রাম ছাড়িয়া তাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

মনে পড়িল মাঝে মাঝে সে মাতামহের বাড়ীতে, এই তালবনীতে আসিয়াছে। ভাবিতে চেষ্টা করিল তখন সে কি বিমলকে দেখিয়াছে! কই মনে পড়ে না। বছর দুই আগেও সে একবার আসিয়াছিল— তখনও বিমলকে দেখে নাই—এমন কি তার নামসুদ্ধ শোনে নাই। দেখিবে কি করিয়া বিমল তো ছেলেবেলা হইতে গ্রামছাড়া! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তারা দুইজনেই কলিকাতায় কাটাইয়াছে একটা গ্রামের লোক—অথচ কেহ কাহাকেও চিনিত না। কলিকাতার কোথায় সে থাকিত! কলিকাতার কথা মনে হইতে তার ইস্কুলের কথা মনে পড়িল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময়ে সে কি ভিড়! তার পিতার ইচ্ছা ছিল সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিলে কলেজে পড়িবে। পরীক্ষায় সে পাশ করিল। এমন সময়ে পিতার মৃত্যু হইল। পতিতপাবন-বাবু গিয়া তাকে লইয়া আসিলেন। পরীক্ষা এ জীবনে তার দেওয়া হইবে না। বিমল সব ক'টা পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। নিশ্চয়ই সে তাকে অবজ্ঞা করে। বিমলের আঘাত গুরুতর,—ডান হাতের সবটা এখনো ব্যাণ্ডেজে জড়ানো। বন্দুক ফাইলে এমনটি ঘটিত না। ফুল্লরাই এ জন্য দায়ী। কিন্তু বিমল কি জানিয়াছে! সে কি করিয়া বিমলকে সাহায্য করিতে পারে! কে তার ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া, ঘা ধুইয়া দেয়? বোধ হয় হরি ডাক্তার! হরি ডাক্তারের চেহারা মনে পড়িতে তার হাসি পাইল। কিন্তু সে ছিল বলিয়াই তো বিমল এ যাত্রা প্রাণে

বাঁচিয়া গেল। ওই যে জানালার ফাঁক দিয়া একটা তারা দে
যাইতেছে। না, ওটা তা নয়; বিমলের বাড়ীর আলো ওর চে
বড়। কিন্তু এ যাত্রা সে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে,—আর একটু হইলেই
সর্ব্বনাশ হইত! সে আর ভাবিতে পারিল না। এখন সে কি করিত
পারে। সেবা-শুশ্রূষা তার পক্ষে করা [illegible] নয়। এখন সম্পূর্ণ সারি
উঠিলে হয়। যদি রোগ আবার বৃদ্ধি পায়? এমন কি হয় না
ডাক্তারে বলিয়াছে ভয় নাই। ডাক্তারে এমন কত কথাই বলে; ত
পিতার মৃত্যুর সময়েও ডাক্তারতো অমন কত বলিয়াছিল। ত
মনে পড়িল চৈত্রসংক্রান্তিতে কঙ্কালীতলায় মেলা বসে। কঙ্কালীত
পীঠস্থান, কালী জাগ্রত দেবী। সে স্থির করিল বিমল সম্পূর্ণ সুস্থ হই
উঠিলে চৈত্রসংক্রান্তিতে কঙ্কালীতলায় গিয়া দেবীর পূজা দিয়া আসিবে
এতক্ষণ এই সহজ কথাটা তার মনে পড়ে নাই কেন? এই সঙ্কল্প করি
অনেকটা শান্তি পাইল—বহুক্ষণের দুশ্চিন্তার মনে মনেও একটা সমাধ
করিতে পারিয়াছে ইহাতেই সে স্বস্তি অনুভব করিল—এবং কখ
সে নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল।

বিমল এখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে, একটু আধটু হাঁটিতেও পারে, ডাক্তারে বলিয়াছে, একটু হাঁটিও; মিতন বলে, বেশী চলাফেরা ভাল নয়। বিমল কারো কথা বেশী শোনে না, ঘর ছাড়িয়া বাগানের মধ্যে চলাফেরা করিয়া বেড়ায়।

সেদিন চৈত্র মাসের বিকালবেলা। শরীরটা বেশ ভাল লাগিতেছে দেখিয়া বিমল বাগানের মধ্যে বেড়াইতেছিল। সারাদিনের গরমের পর মিহি বাতাসে মনটা ভারি ভাল লাগিতেছিল, তার মনে হইল কোথাও গেলে হয়। একবার সে মিতনের উদ্দেশে ডাকিল—দেখিল মিতন নাই। এমন সুযোগ আর মিলিবেনা ভাবিয়া সে মাঠের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। মাঠ পার হইয়া সে খোয়াই এর মধ্যে নামিয়া পড়িল। দেখিল বিবর্ণ রুক্ষ কঙ্করিত মাটির কাঁটা গাছগুলি নূতন পাতায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন কেবলি মনে হইয়াছে এ যাত্রা তার বাঁচিয়া ওঠা একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, কিন্তু এই কাঁটা গাছের সবুজ পাতা দেখিয়া মনে হইল—পৃথিবীসুদ্ধ প্রাণপণে বাঁচিতে চেষ্টা করিতেছে; ওটা কেবল তারই অভাবনীয় সৌভাগ্য নয়! আবার দেখিতে পাইল—অদূরে গোটা কয়েক আমের গাছ মুকুলে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। এরূপ অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে ক্রমে সে নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ নদীটা দেখিয়া বুঝিতে পারিল অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ভাবিল নদীটা পার হই না কেন? সে জায়গায় জল অত্যন্ত কম—হাঁটু পর্য্যন্তও নয়। ধীরে ধীরে সে নদী পার হইল। ওইতো আম বাগানের মধ্যে পতিতপাবনবাবুর বাড়ী! বিমল ভাবিল

এতদূরে আসিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা না করিয়া যাওয়া ভাল নয়, বিশেষ তিনি অনেক কয়েকবার তাকে দেখিতে গিয়াছেন! এই রকম পাঁচ সাত ভাবিতে ভাবিতে সে পতিতপাবনবাবুর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। বাগানে একটা চাকর ছিল—বিমল জিজ্ঞাসা করিল—বাবু আছেন?

লোকটা বলিল—বাবু নাই—

বিমল বলিল—কোথায় গিয়েছেন?

সে বলিল—বোলপুর।

—কখন ফিরবেন?

—জানিনা।

লোকটা বিমলকে চিনিত না, কাজেই বসিতে বলিল না, বিমল ফিরিবার উপক্রম করিল।

যখন সে পিছন ফিরিয়াছে, এমন সময়ে শুনিল—আপনি একটু বসে যাবেন না?

বিমল ফিরিয়া দেখিল ফুল্লরা। এ অবস্থায় কি করা উচিত, বিমল ভাবিয়া পাইল না, বসা উচিত, না, ফিরিয়া যাওয়া। কিন্তু বেশিক্ষণ সে ভাবিবার সময় পাইল না। ফুল্লরা বলিল—আপনি হাঁপিয়ে পড়েছেন, ভিতরে চলুন, বসবেন।

বিমল সত্যাই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এখানে না বসিলে মাঠের মধ্যে তাকে বসিতেই হইত। সে বুঝিতে পারিল—এতখানি চলাফেরা তার পক্ষে উচিত হয় নাই। সে ফুল্লরার পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একখানা কাঠের চেয়ারে বসিতে যাইতেছিল, ফুল্লরা গদিআঁটা একখানা আরাম-চেয়ার দেখাইয়া দিল—বিমল বসিয়া পড়িয়া অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল।

কিন্তু দু'জনেই যে নীরব। ফুল্লরা বুঝিল এরকম আর একটু চলিলে

কথা বলা আরও কঠিন হইয়া উঠিবে, কাজেই সে খানিকটা জোর করিয়া আরম্ভ করিল—

—আপনার এতদূর হেঁটে আসা উচিত হয়নি।

বিমল বলিল—এতদূর আসবো প্রথমে ভাবিনি, একটু একটু করে শেষ পর্য্যন্ত এসে পড়লাম।

ফুল্লরা জিজ্ঞাসা করিল—দাদামশায়ের সঙ্গে কোন কথা ছিল?

বিমল বলিল—কথা আর কি! তিনি অনেকবার দেখতে গেছেন, আমার একবারও না আসা ভাল দেখায় না।

ফুল্লরা বলিল—অসুখ হ'লে তো লোকে দেখতে গিয়েই থাকে, তাই বলে অসুখ না সারতেই আপনার আসতে হবে!

বিমল হাসিয়া বলিল—অসুখ সেরেছে বই কি!

ফুল্লরা বলিল—সেরেছে কোথায়? এইটুকু আসতে আপনি কি রকম হাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনি বসুন, একটু চা ক'রে দি।

বিমল বলিল—চায়ের দরকার নেই।

কিন্তু ফুল্লরা শুনিল না, চা করিতে চলিয়া গেল।

আসলে ফুল্লরা বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। বিমলকে ভিতরে আনিয়া বসানো পর্য্যন্ত এক রকম ঝোঁকের মাথায় করিয়া ফেলিয়াছিল, দু'চারটা কথাও আরম্ভ করিয়াছিল—কিন্তু তারপরে ক্রমে তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল; এই সমস্যার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য চা তৈরি করিবার নামে প্রস্থান করিল।

মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান ব্যবহার করিতে বড় ভয় পায়, হয় তারা পুরুষের উপরে আধিপত্য করে, নয় তারা পুরুষের কাছে নত হইয়া স্বস্তি অনুভব করে।

বিমলের অবস্থাও বড় আশাপ্রদ নয়! সে যে অনাত্মীয় মেয়ের

সঙ্গে কথাবার্ত্তা কখনো বলে নাই, এমন নয়, কিন্তু আজ তার কেন
বড় বাধ-বাধ লাগিতেছিল! ফুল্লরা চলিয়া গেলে সে স্বস্তি অনু
করিল, কিন্তু বোধ করি এর চেয়ে সেই সুখদ বিক্ষোভ-ই ভাল ছি
সে ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ্য করিতে লাগিল—টেবিল চেয়ার, এ
বইয়ের আলমারি, এক পাশে ফরাস বিছানা, তার উপরে একটা জায়
কালি পড়িয়া অষ্ট্রেলিয়ার মানচিত্র, দেওয়ালে একটি রমণীর ফটোগ্রা
টেবিলের উপরে একটা ফুলদানিতে এক গোছা শালের ফুল; তাই ব
এতক্ষণ যে শালফুলের গন্ধ পাইতেছিল তাহা বাহিরের গাছের ন
ঘরের বাহিরে গোটা দুই শালগাছ ফুলে ফুলে বোঝাই হইয়া গিয়াছি
শালফুল দেখিয়াই তার সে দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল।

ফুল্লরা বলিল—বড় দেরী হয়ে গেল।

বিমল বলিল—দেরী কোথায়? এত শীগ্গীর চা করলেন কি ব
তাই ভাবছি।

ফুল্লরা চায়ের পেয়ালা ও কিছু খাবার আগাইয়া দিল। বিমল
পান সুরু করিল। এবারে ফুল্লরার সুযোগ, বিমলের চোখ চা
পেয়ালার দিকে, কাজেই আর চোখে চোখে হইতেছে না। সে জিজ্ঞা
করিল—এখন তাহ'লে কল্‌কাতা যাচ্ছেন না।

বিমল বলিল—ঠিক তার উল্টো। ডাক্তারে অনুমতি দিয়েছে, অ
কয়েকদিন পরেই রওনা হ'ব।

ফুল্লরা বলিল—কিন্তু শরীর যে এখনো দুর্ব্বল—সেখানে দেখাশো
করবে কে?

—এখানেই বা দেখ্‌বার লোক কে আছে?

প্রশ্নটা করিয়াই ফুল্লরা মনে মনে আহত হইয়াছিল—আবার বিমলে
উত্তর সেই কাটাঘায়ে বেশ করিয়া নুনের ছিটা দিল। সে আলাপে

মোড় ফিরাইয়া লইবার জন্য যে নূতন প্রসঙ্গ তুলিল, জানিত না নূতনতর আর এক বিপদের দিকে তার মুখ।

ফুল্লরা বলিল—যেখানেই যান, আর বাঘটাঘ শিকার করবেন না।

পুরুষের পৌরুষের প্রতি নারীর এই ইঙ্গিতে সে আহত হইল। বলিল—পুরুষেরা যখন ঠকে যায়, তার পিছনে থাকে মেয়েদের ভুল।

বিস্মিত ফুল্লরা—কেন?

—কেন কি? ভেবে দেখুন তো আপনি যদি সেদিন আলমারির চাবিটা না হারাতেন তবে কি এমন বিপদ ঘটতো!

তা বটে। চাবিহারানোর কথা ফুল্লরা ভুলিয়াই গিয়াছিল। তার কান দুটি লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু বিমল তা বুঝিতে পারিল না—সে বলিল একটু সরে বসুন, রোদ এসে পড়েছে আপনার মুখে।

সত্যই সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি সর্ব্বজ্ঞ দিবাকরের শ্লেষহাস্যের মত ফুল্লরার মুখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

ফুল্লরা সরিয়া বসিলে, বিমল বলিল—আমার এই বিপদের মূলে আপনার অসাবধানতা! কোথায় সে জন্য আপনি দুঃখিত হবেন, না, ঠাট্টা করছেন!

ফুল্লরা বিপদ গণিল! সে দেখিল এ সময়ে কিছু না বলিতে পারিলে সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা বিষাদান্তক নাটকের সৃষ্টি হইবে। তাই সে বলিল—বেশ তো বন্দুক পেলেন না বলে অমনি খালি হাতে বাঘ শিকার করতে যাবেন! সেটাও কি আমার দোষ নাকি?

—আমি কি ভেবেছিলাম শিকার করব? সেখানে গিয়ে দেখি একটা বন্দুক জুটে গেল! ভাঙা বন্দুক নিয়ে যে লোক শিকার করতে এসেছে তা কি করে জান্‌বো?

ফুল্লরা শ্লেষের সঙ্গে বলিল—সেটাও কি আমার দোষ নাকি?

বিমল বলিল—আমার কি মনে হয় জানেন—বল্‌বো ?

ভীত ফুল্লরা বলিল—বলুন—

—আপনার চাবি মোটেই হারায় নি।

—কেন ?

—আমাকে বন্দুক দেবার ইচ্ছাই আপনার ছিল না।

—এমন অনিচ্ছা আমার হ'তে যাবে কেন ?

—সেটা এখনো ঠিক আবিষ্কার করতে পারিনি, হয় তো শিকারে প্রতি করুণা—

—নয় তো ?—

—শিকারীর প্রতি কৃপা !

—সে কি রকম ?

—আপনি হয় তো ভেবেছিলেন বন্দুক না পেলে আমি ফিরে যাবো ! শিকার করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটা হারাবো না।

কঠিন বাটালির ঘায়ে শিল্পী যেমন পাথরের টুকরা ভাঙিয়া ফেলে তেমনি ভাবে ফুল্লরা আঘাত করিল—একজন অপরিচিত লোকের প্রতি আমার এমন করুণা হতে যাবে কেন ?

বিমল তার রকম সকম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—পরিচয় অপরিচয় বেছে চলা কি করুণার স্বভাব !

তুইজন যুযুৎসু লড়িতে লড়িতে সুগভীর এক খাদের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে, আর এক পা অগ্রসর হইলেই দুজনেরই মৃত্যু ! তারা সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইল।

ফুল্লরা বলিল—আর একটু চা দিই।

বিমল বলিল—না শুধু এক চামচ চিনি।

ফুল্লরা বলিল—পেয়ালা যে খালি।

বিমল বলিল—ওঃ তাই তো! তবে থাক্।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—পতিতপাবনবাবুর আসতে দেরী হবে যেন।

ফুল্লরা বলিল—তাই তো মনে হচ্ছে!

—তবে আমি আসি। আপনি তাঁকে বলবেন যে আমি এসেছিলাম।

—আপনার সঙ্গে একটা লোক দিই পথে—

বিমল বাধা দিয়া বলিল—না পথে বাঘ বসে নাই।

দুজনেই হাসিয়া ফেলিল! বিমল ধীরে ধীরে রওনা হইল!

বিমল বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলে ফুল্লরা বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপস্রিয়মান, সন্ধ্যার অন্ধকারে ম্লায়মান সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

ফুল্লরা দাঁড়াইয়া রহিল, আর বিমল চলিতে লাগিল, কিন্তু দুজনেরই মনে চিন্তার প্রবাহ একই খাতে প্রবাহিত হইতেছিল! মনে মনে তারা দুজনের কত পরিচিত। আজ এক মাসের উপরে বিমলের রোগশয্যায় একমাত্র চিন্তার সঙ্গী ছিল ফুল্লরা। আর ফুল্লরার চিন্তা অদূরবর্ত্তী একটি রোগশয্যার অভিমুখী ছিল। বাস্তবের পরিচয় আজ এই প্রথম। এর আগে যে পরিচয় তা নেহাৎ মৌখিক মাত্র।

নদীর উপর স্রোতের গতি এক রকম, জলের কিছু নীচে স্রোতের গতি আর এক রকম—এই স্রোতবৈষম্যের ফলে অনেক সময় দক্ষ সাঁতারুও ডুবিয়া মরে। মানুষের মনের নদীরও অনেকটা সেই দশা। বাস্তবের স্রোত আর মানসিক স্রোতে বৈষম্য উপস্থিত হয়, কত অভাগ্য তলাইয়া যায়। আজ সেই রকম একটা স্রোতের দুর্ব্বিপাকে এই দুটি প্রাণী আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে তাদের পরিচয় কত স্বল্প! মনে তাদের পরিচয় কত গভীর! এই আবর্ত্ত তাদের কোথায় লইয়া তুলিবে? চোরাবালিতে না ডাঙায়! না, একেবারে রসাতলের তলে টানিয়া লইয়া যাইবে?

১৫

চৈত্রসংক্রান্তি সন্ধ্যা। ফুল্লরা কঙ্কালীর পীঠস্থানে পূজা দিতে গিয়াছিল। বাড়ীতে বলিয়া যায় নাই, মনে করিয়াছিল সন্ধ্যা হইবার আগেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিলম্ব হইয়া গেল। বিশেষ, পাকা পথ ছাড়িয়া অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছে, ফিরিবার সময়েও পাকা পথ দিয়া আসিতে পারে নাই—বিলম্ব হইবার সে-ও এক কারণ বটে।

বেলা কতটা আছে সেদিকে তার দৃষ্টি ছিল না, পারুল ডাঙার মাঠে আসিয়া প্রথমে খেয়াল হইল সন্ধ্যা হইতে আর দেরী নাই। সে ভাবিল ঘুরিয়া গেলে এক প্রহর রাত্রি হইয়া যাইবে—তাড়াতাড়ি ফিরিবার জন্য সে পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া খোয়াই-এর মধ্যে নামিয়া পড়িল! সে ঠিকই ভাবিয়াছিল খোয়াই দিয়া গেলে পথ অল্প, কিন্তু কাঁকরে আর ঢেউ খেলানো বন্ধুরতায় পথ যে দুরূহ তা ভাবে নাই।

এমনটি সাধারণতঃ হইবার কথা নয়, এ অঞ্চলের পথ, ঘাট সব তার পরিচিত। কিন্তু আজ তার মন আপন কর্ত্তব্যে বিমুখ হইয়াছিল। একেবারে অকারণে নয়।

কঙ্কালীতলায় পূজা দিয়া যখন সে কোপাই নদী পার হইয়া ফিরিতে যাইবে—তখন এক বেদেনীর সঙ্গে তার দেখা হইল। তারা নদীর ধারেই ডেরা গাড়িয়াছিল। সেই ঘাঘরী-পড়া, মাথায় রুমাল-জড়ানো, গোলাপী গালের উপরে কালো চুলের বেণীদোলানো, বিদেশিনী হিন্দি-বাংলার হাস্যকর সংমিশ্রণে তার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেই মূর্ত্তি এবং তার কথা ফুল্লরার মনে বারম্বার পড়িতেছিল। বেদেনীর নাম

মিশ্‌কি! মিশ্‌কি বলিয়াছিল তার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে! ফুল্লরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে জানিল কিরূপে! তার উত্তরে মিশ্‌কি একগাল হাসিয়া বলিল—যে তারা বেদেনী! ফুল্লরা অপ্রস্তুত হইবার ভয়ে এই তথ্যটাকেই একটা চরম কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তারপরে ফুল্লরার কাছে একটা টাকা আদায় করিয়া মিশ্‌কি জামের মত কুচ্‌কুচে কালো এবং গোল একটা পাথর দিল; আর বলিয়া দিল এই পাথরটা প্রথম যে পুরুষের হাতে পড়িবে সে তার ভাবী বর। বলিয়া একগাল হাসিল! ফুল্লরা পাথরটা আঁচলে বাঁধিতে যাইতেছিল—মিশ্‌কি বলিল খোঁপায় গুঁজিয়া রাখো—আর বাড়ীতে গিয়া চালের হাড়ির মধ্যে রাখিয়া দিবে।

ফুল্লরার মনে মিশ্‌কির চেহারা, কালো পাথরটা, আর এই দৈববাণী মিলিয়া একটা আরব্যোপন্যাসের রাজত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিল। সেই কাহিনীর প্রকোষ্ঠে ঘুরিতে ঘুরিতে তার যে গতি বারম্বার মন্দ হইয়া পড়িতেছিল তা সে বুঝিতে পারে নাই। এক একবার থামিয়া গিয়া সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, আবার দ্রুত চলিতে চলিতে কখন থামিয়া গিয়াছে—দেরী হইবার আসল কারণ ইহাই।

খোয়াই-এর মধ্যে নামিয়া পড়িয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল কিন্তু পথ রোধ করিয়া মিশ্‌কির মূর্ত্তি ভাসিয়া ওঠে। সে দ্রুত চলিবার আশা ছাড়িয়া আপন মনে চলিতে আরম্ভ করে—ক্রমে দৃষ্টি পথের দিক হইতে মনের মধ্যে চলিয়া গেল—শেষে এমন হইল যে কোন্ পথে সে যাইতেছে খেয়াল রহিল না। হঠাৎ একটা বুনো শিয়ালের ডাকে চমক ভাঙিল—ফুল্লরা দেখিল চারিদিক প্রায় অন্ধকার, কেবল পশ্চিম আকাশে অস্তগত সূর্য্যের বর্ণচ্ছটা, আর সেই সূর্য্যাস্তের পটে, অদূরে একটা উঁচু মাটির ঢেউয়ের শীর্ষে কালো একটা মনুষ্য মূর্ত্তি! মিশ্‌কি নাকি? সে

চমকিয়া উঠিল! কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়াই বুঝিল মূর্ত্তি যারই হোক —সে স্ত্রীলোক নয়! ফুল্লরা আশ্বস্ত হইল! কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিতে পারিলেও কেমন যেন তার ধারণা হইয়া গিয়াছিল, মিশ্‌কির সঙ্গে পরিচয় ও তার ভবিষ্যদ্বাণী তার পক্ষে শুভফলদায়ক হইবে না।

ফুল্লরা ভাবিল মূর্ত্তিটাকে এড়াইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু খোয়াই-এর এক মাত্র পথ আগ্‌লাইয়া মূর্ত্তি দণ্ডায়মান; ফিরিতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়—তা'তে রাত্রি আরও বাড়িবে। সে দু'চার পা অগ্রসর হইতেই দেখিল মূর্ত্তিটাকে যতদূরে মনে হইয়াছিল ততদূরে নয়—হঠাৎ যেন কাছে আসিয়া গিয়াছে। আলো-আঁধারি রহস্যে দূরত্ব ঠিক ধরিতে পারে নাই। তখন সে বুঝিতে পারিল—মূর্ত্তিটা আর কারো নয়—স্বয়ং বিমলের।

বিমল এতক্ষণ ফুল্লরাকে দেখে নাই—হঠাৎ কাঁকরের উপরে মানুষের পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে?

ভয়ে ফুল্লরার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল—সে বিকৃতস্বরে উত্তর দিল—আমি।

বিমল সে স্বর চিনিতে পারিল না; কিন্তু ভাল করিয়া দেখিতেই বুঝিতে পারিল সেই আব্‌ছায়া নারীমূর্ত্তি ফুল্লরা। বলিল—আপনি এখানে এমন অন্ধকারে?

ফুল্লরা—একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বিমল বলিল—তাই আপনাকে বাড়ী গিয়ে পাইনি!

—বাড়ীতে গিয়েছিলেন্ নাকি?—ফুল্লরা হাঁপাইতেছিল।

বিমল বলিল—হাঁ। আজ শেষরাত্রে কল্‌কাতা যাবো—তাই একবা দেখা করতে গিয়েছিলাম।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—ভালই হ'ল দেখা হয়ে গেল।

হঠাৎ যেন চারদিকের অন্ধকার ফুল্লরার কাছে ঘনতর মনে হইল। ভাগ্যে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে—ফুল্লরার বেপথু আর কেহ দেখিতে পাইবে না। কিন্তু গলার স্বরের কম্পন কেমন করিয়া চাপিয়া রাখিবে? সে যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলিল—ওঃ আজই যাবেন।

বিমল এত বুঝিতে পারিল না; সে বলিল—হাঁ, আর দেরী করা যায় না; এমনিতেই অনেক দিন হ'য়ে গেল।

তারপরে প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া বলিয়া চলিল—আর যে শীঘ্র ফিরবো এমন আশা নেই। তাই আজ আপনার সঙ্গে দেখা না হলে—হয়তো আর জীবনে দেখাই হ'ত না।

ফুল্লরা অস্ফুটস্বরে বলিল—কেন?

—কেন কি?' চিরকাল কি এই মাঠের মধ্যে বসে' থাক্‌বেন নাকি? বিয়ে হলেই তো কোথায় চলে যাবেন তার ঠিক্ নেই!

বিবাহের প্রসঙ্গে ফুল্লরার মনে মিশ্‌কির দেওয়া সেই পাথরটির কথা মনে পড়িয়া গেল। সে খোঁপায় হাত দিয়া দেখিল পাথরটি যথাস্থানে আছে। তখন সে বলিল—আমার তো এই মাঠ খুব ভাল লাগে।

বিমল হাসিয়া বলিল—ওটা কেবল কবিত্ব হ'ল। এই ফাঁকা মাঠে ভাল্ লাগ্‌বার কি আছে?

—কল্‌কাতাতেই বা ভাল লাগবার কি আছে?

—ভাল লাগে বলেই যে কল্‌কাতায় চলেছি তা কে বল্‌ল? আসল কথা কি জানেন—অন্নের চেষ্টা কল্‌কাতায় টেনে নিয়ে চলেছে।

তখন ফুল্লরা বলিল—আপনার পক্ষে এ মাঠ ভাল না লাগ্‌বার যথেষ্ট কারণ আছে! এখানে এসে যে-অভিজ্ঞতা আপনার হ'ল তা বোধ করি জীবনে ভুলতে পারবেন না।

—নেহাৎ মিথ্যা বলেন নি। এই মাঠ প্রায় আমাকে গ্রাস করে ফেলছিল।

ফুল্লরা একটু খোঁচা দিয়া বলিল—ভবিষ্যতে আর অমন অসাবধান হ'য়ে বাঘ শিকার করতে যাবেন না।

বিমল আর একটু বড় খোঁচা দিয়া বলিল—ভবিষ্যতে আর অমন অসাবধান হ'য়ে বন্দুকের বাক্সের চাবি হারিয়ে ফেল্‌বেন না।

এ প্রশ্নোত্তরের পথে ফুল্লরার আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই দেখিয়া সে প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিল—শেষরাত্রের গাড়ীতেই কি যাবেন?

—তাইতো ভাবছি।

তার পরে বলিল—ওই যে অভিজ্ঞতার কথা বল্‌লেন না, এবারকার অভিজ্ঞতাকে বুকের কাছে এক মস্ত ক্ষতচিহ্নে বহন করে চল্‌লাম।

ফুল্লরা জিজ্ঞাসা করিল—সে দাগ কি মিলিয়ে যায়নি?

বিমল বলিল—ও দাগ জীবনে মিলাবার নয়।

তারপরে হাসিয়া বলিল—ওটা আমার বুকের উপরে প্রান্তরলক্ষ্মীর বীরত্বের পদক হ'য়ে রইল।

ফুল্লরা হাসিয়া বলিল—ভালই হ'ল। বন্ধুরা দেখে খুব বাহবা দেবে।

বিমল হাসিয়া বলিল—হয় তো দেবে। কিন্তু আপনি তো কেবল বিদ্রূপই করলেন।

ফুল্লরা বলিল—রাত্রি অনেক হ'ল।

বিমল আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল—হাঁ বোধ হয় আট-টা বাজবে। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

ফুল্লরা বলিল—না, না, তার দরকার নেই। এই তো বাড়ীর কাছে এসে পড়েছি।

ফুল্লরা কিছুতেই বিমলকে সঙ্গে লইতে রাজি হইল না। পাছে

বিমল তার সঙ্গে আসে সেই ভয়েই যেন ভালভাবে বিদায় না লইয়াই দ্রুত রওনা হইয়া গেল।

বিমলের বাড়ী ফিরিবার তাড়া ছিল না। সে বসিয়া পড়িল। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল—সিগারেট ধরাইবার জন্য দেশলাই জ্বালিল; দেশলাইয়ের আলোতে সে দেখিতে পাইল মাটিতে একটা কালো পাথর চক্‌চক্ করিতেছে। সে হাতে তুলিয়া দেখিল কালো জামের মত মসৃণ একটা ছোট্ট পাথর। একটু হাতে নাড়িয়া সেটাকে পকেটে ফেলিল। তারপর আবার একটা কাঠি জ্বালাইয়া সিগারেটটা ধরাইয়া একাকী বসিয়া টানিতে লাগিল।

*   *   *

যাত্রার ব্যস্ততায় বিমলের ঘুম মাঝরাতেই ভাঙিয়া গেল—ঘড়িতে কেবল দুটা। সে বারান্দায় আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিল। সে দেখিল মিতন তখনো জাগে নাই—মিতন যে ঠিক সময়ে উঠিয়া তাকে জাগাইবে—সে সন্দেহ তার ছিল না। কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে নিরিবিলি একটু বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। আকাশ চৈত্র মাসের অজস্র নক্ষত্রভারে আনত; পশ্চিম দিগন্তে এক বিস্ময়কর রহস্য! কৃষ্ণদ্বাদশীর কলাশেষ চন্দ্র তখন ধীরে ধীরে অস্তগমনের উদ্যোগ করিতেছিল; ত্রিপুর বিনাশের পরে ক্লান্ত মহাদেবের ভূমিনিক্ষিপ্ত রুধিরাম্বিত পিনাকটার মত চন্দ্রকলা বাঁকিয়া যেন কিয়দংশ মাটিতে ্সিয়া গিয়াছে! চিরকালের চেনা চাঁদের এমন পৌরাণিক সৌন্দর্য্য সে কখনো দেখিবে আশা করে নাই! আর কিছু নয়—এই সীমাহীন আকাশপ্রান্তে এই চন্দ্রকলা কোন্ জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্য্যামীর তৃতীয় নেত্রের মত জাগ্রত রহিয়াছে! তার মনে হইল ওই অলৌকিক তৃতীয় নেত্র যেন একান্তে কেবল তাকেই দেখিতেছে—একেবারে তার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত। বিমল নিজেকে ভীত

অপরাধী বলিয়া মনে করিল। কি তার অপরাধ! যতই সে চন্দ্রকলার দিকে তাকাইয়া থাকিতে লাগিল—ততই নিজেকে সঙ্কুচিত অনুভব করিতে থাকিল! ওই রুষ্ট করুণ নির্ব্বাক্ দৃষ্টির কি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে! সে ওই দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া মনের মধ্যে তাকাইল। যদি সত্যই কোন অভিযোগের কারণ থাকে! উপকথায় শোনা মন্ত্রপড়া রাক্ষসপুরীর কথা তার মনে হইল; মানব-সন্তান সেখানে প্রবেশ করিয়া আরামে থাকিত—কিন্তু পলায়নের উদ্যোগ করিলেই কোনো নিষ্ঠুর একাগ্র দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিত। বিমলের মনে হইল ওই রাক্ষসের তেমনি যেন কার সতর্ক দৃষ্টি! সে বিনানুমতিতে এই প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে—এইটিই যেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ!

• • •

ওই চন্দ্রকলার ঠিক নীচেই মাঠের শেষে সাঁওতাল পল্লী তখনো ঘুমে আচ্ছন্ন, একটিও আলো দেখা যায় না—একটিও শব্দ নাই; সমস্ত প্রান্তরটা নিস্তব্ধ নির্জন হইয়া আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া একেবারে অস্তিত্বের প্রান্তে যেন মিলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। তার বাগানের আমগাছে একটা রাতজাগা পাখী পাখা ধড়ফড় করিয়া স্বপ্ন দেখিয়া ডাকিয়া উঠিল; সেই শব্দে পাশের গাছের গোটা দুই পাখীও স্বপ্নের অভ্যাসে প্রত্যুত্তর দিল! আবার সব নিস্তব্ধ!

বিমল এমন করিয়া প্রকৃতিকে কখনো দেখে নাই। দিনের বেলায় দেখিয়াছে বটে—কিন্তু সেতো মানুষের সঙ্গে মিশ্র-প্রকৃতি। তাতে আনন্দ আছে—তাহা কেবল মুগ্ধ করে। রাত্রিবেলা নিঃসপত্ন প্রকৃতিকে সে কখনো দেখে নাই; একাকী মানবশিশু সে এই আদিমসত্তার দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে ভীত সঙ্কুচিত অনুভব করিল! সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—না, না, আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না; তোমার অনভিপ্রেত করিব না।

কতক্ষণ সে এমন ভাবে বসিয়াছিল জানে না। চট্‌কা ভাঙিলে দেখিল একটা লণ্ঠন হাতে মিতন আসিতেছে। একটা মানুষ দেখিয়া সে স্বস্তি অনুভব করিল। বলিল—মিতন নাকি?

মিতন বলিল—দাদাবাবু, আমি উঠেছি! ইষ্টিশানে যাবার গাড়ী তৈরি যে!

বিমল উঠিতে যাইতেছিল—কিন্তু হঠাৎ সেই অনস্তগত চন্দ্রকলার দিকে দৃষ্টি পড়িল; অপরাধী আবার অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন হইল! বলিল—আজ রাত্রে আর যাওয়া হ'ল না মিতন!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কারণ দর্শাইবার জন্য বলিল—শরীরটা ভাল নেই।

মিতন একটু বিস্মিত হইলেও, মোটের উপরে খুসীই হইল। তাই সে আর খোঁচাখুঁচি না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিমল বসিয়াই থাকিল।

* * *

শেষরাত্রে ফুল্লরা ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিল—মিশ্‌কির পাথরটা কোথায় রাখিয়াছে? সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিবার পরে নানা কারণে মনের অবস্থা এমন ছিল যাতে পাথরটার কথা মনে না থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষ, বিকালের পথশ্রমে সে এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যাতে বাড়ী ফিরিয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—আহার করিয়াছে কিনা মনে পড়ে না।

সে খোঁপায় হাত দিয়া দেখিল পাথরটা নাই। বিছানার উপরেও নাই। ঘরের মেঝেতেও নাই—ঘরের মধ্যে কোথাও নাই; কি সর্ব্বনাশ! তখন সে আলো লইয়া সারা বাড়ী খুঁজিল, বাগানের ভিতরেও,—কোথাও নাই! তখন ভাবিল হয় তো খোয়াইএর মধ্যে যেখানে দাঁড়াইয়া বিমলের

সঙ্গে কথা বলিয়াছিল সেখানে পড়িয়া থাকিবে। সে ভাবিল কাল সকালে গিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাইল নদীর ওপারে বিমলের বাড়ীতে আলো যাতায়াত করিতেছে—বুঝিল বিমলের শেষ-রাত্রের গাড়ীতে যাইবার উদ্যোগ চলিতেছে। কি জানি কি মনে ভাবিয়া ভারি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। সে পুনরায় শুইতে গেল। ঘুম বড় একটা আসিল না—কেবলি সেই বেণীদোলানো মাথায় রুমালজড়ানো ঘাঘরা-পরা গোলাপী-গাল বেদেনীর চেহারা মনে পড়িতে লাগিল। তার হাসিটা কি অদ্ভুত! কালবৈশাখী ঝড়ের বিদ্যুতের মত—এখনই যেন অতর্কিতে শিলাবর্ষণ করিতে পারে। না! পাথরটা হারানো ভালো হয় নাই।

পরদিন সকালে খোয়াই-এ গিয়া খুঁজিয়া আসিল। পাথরটার কোন চিহ্ন নাই। পাথরটা না জানি কার হাতে পড়িল! ফুল্লরার মন ভার হইয়া রহিল।

১৬

তারপর চারমাস কাটিয়া গিয়াছে,—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ,—এখন ভাদ্র মাসের প্রথম। বিমলের কলিকাতা যাওয়া হয় নাই। কেন যে সে কলিকাতা গেল না, তা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই—অন্যকে কি বুঝাইবে। কলিকাতার বন্ধুরা চিঠি লিখিয়া লিখিয়া ক্রমে তার আসিবার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। গাঁয়ের লোকেরা তার অস্বাভাবিক গ্রাম-প্রীতির অর্থ বুঝিতে পারে নাই। প্রথমে প্রথমে সুরেশ পোদ্দার ও হরিহর মুদি আসিত; বিমলের পিতৃস্থানীয় বলিয়া তাকে অকারণে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করিতে উপদেশ দিত! সে ধৈর্য্য ধরিয়া সব শুনিত—এবং যাইবার কোন লক্ষণ দেখাইত না।

তাদের একদিনের সংলাপ শুনিলেই ধরণটা বোঝা যাইবে!

সুরেশ পোদ্দার বলিল—বাবাজী কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

হঠাৎ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছে না বুঝিতে পারিয়া বিমল জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ কাজের কথা বল্‌ছেন?

সুরেশ বলিল—এই যে এতগুলো পাশ করে বসে থাক্‌লে!

তখন হরিহর আর একদিক্ দিয়া আক্রমণ করিল—বাবাজীর যে অবস্থা তাতে কি আর বসে' থাকা চলে না? তা নয়। দাদাবাবু একটা জজ ম্যাজিষ্টর হলে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হত!

হরিহর আগাইয়া যায় দেখিয়া সুরেশ বলিল—আঃ আমিও তো সেই কথা বলছি গো!

তারপরে হরিহরকে একহাত লইবার জন্য বলিত—যে টাকা তার গাঁয়ের মধ্যে লাগানো আছে তা আদায় করে খেলেই তো এক জীবন কেটে যায়।

হরিহর বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—টাকা তো টাকা! যে জমি জিরেত আছে, তা যদি অপরের গোরু বাছুর থেকে বাঁচিয়ে চাষ করা যায়—তবে অত খায় কে?

সুরেশ বুঝিল মুদি একহাত লইয়াছে। দুইজনে তখন পরস্পরকে আক্রমণ ছাড়িয়া বিমলের উপরে গিয়া পড়িত, বলিত—তবে আমি বলছি কি? আছে তো সবই। তাই বলে কি আর বাড়াতে হবে না! বলি জানো তো কুবেরের সম্পত্তি—

আর বলিতে হইত না—প্রবাদটা উভয়েরই অত্যন্ত পরিচিত, দুই জনে একসঙ্গে মাথা নাড়িয়া পরস্পরকে সমর্থন করিত।

বিমল চুপ করিয়া থাকিয়া আর যখন পারিত না, বলিত—শীগ্‌গীরই যাবো ভাবছি।

দুইজনে আশালাভ ও উৎসাহদানের মাঝামাঝি সুরে বলিত—যাবেই তো, যাবেই তো।

তখন দুইজনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিত—বিমলের কাছে যারা লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে পারেনা—এমন তাদের পরিচিত কতজন আবগারী দারোগা হইয়া গিয়াছে! বিমল যে একটু ইচ্ছা করিলেই অন্ততঃ জেলার জজসাহেব হইতে পারে দুইজনে সমস্বরে সে শুভ সংবাদ বিমলকে জানাইয়া দিত।

এইরূপ কতক্ষণ যে চলিতে পারিত তার ঠিক নাই—কিন্তু প্রায়ই মিতনের অভিযোগের তীক্ষ্ণ সুরে অকালে সভাভঙ্গ হইত—বিমল বাঁচিয়া যাইত।

মিতন বাগানের প্রান্ত হইতে চীৎকার করিয়া উঠিত—তবেরে শালার গোরু! দিন তাড়াই দিন আসে।

সুরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিত—দাঁড়াও দেখে আসি গোরুটা কার? গোরু কার সে নিশ্চয় জানিত। কিন্তু আবার প্রতিপক্ষকে একাকী রাখিয়া যাইতেও সাহস হয় না, কি জানি তার অনুপস্থিতির সুযোগে কি বলিয়া বসে। সে একরকম মুদিকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া যাইত। বিমল মনে মনে মিতনকে অভিনন্দন জানাইত।

এই সময়ের মধ্যে পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে;—তার চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে ফুল্লরার সঙ্গে। ওদের বাড়ীতে গেলে সে একটু কথা বলিবার সুযোগ পাইত। তার পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র পতিতপাবনবাবুই তাকে কলিকাতায় যাইবার জন্য তাগিদ দিতেন না।

তিনি বলিতেন—কি করবে হে কলকাতায় গিয়ে?

বিমল বলিত—চাকুরীর সন্ধান।

পতিতপাবনবাবু বলিতেন—হাঁঃ চাকরি। আজকাল চাকুরীর যে বাজার। এই দেখনা কেন—

এই বলিয়া সকাল বেলাকার খবরের কাগজখানা তুলিয়া বিজ্ঞাপনের স্তম্ভের একটা স্থান দেখাইয়া বলিতেন—দেখ, এম, এ পাশ মাষ্টার চেয়েছে মাইনে পঞ্চাশ টাকা। তাকে আবার ষ্ট্রং ইন্ ম্যাথেম্যাটিক্স, স্যান্সক্রিট্, ইংলিশ আর জিওগ্রাফি ?'তে হবে। একসঙ্গে তারা শেক্সপীয়র, নিউটন, বোপদেব চায়। জিওগ্রাফিতে কে পণ্ডিত তা জানিনে বাপু। এই তো চাকুরীর অবস্থা!

বিমল কুণ্ঠিতভাবে বলিত—তাছাড়া আর কি করবো বলুন?

—আরে তুমি কল্‌কাতায় চাকরি পেয়ে যে-ভাবে থাক্‌বে এই গ্রামে চাকুরী না করে তার চেয়ে সুখে থাকতে পারবে!

বিস্মিত বিমল বলিত—এই মাঠের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেবো?

—ক্ষতি কি? মাঠ ভগবানের সৃষ্টি—সহর মানুষের সৃষ্টি। ভগবানের হাতের কাজ কি মানুষের হাতের কাজের চেয়ে ছোট হল!

বিমল বলিত—ছোট নয়, বেশী দরকারী, এই মাত্র।

—দরকারী, না মাথা আর মুণ্ডু।

বলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। হাসিতে হাসিতে চোখে জল পড়িত, জল লাগিয়া চশমা ঘোলাটে হইয়া যাইত, তখন চশমা জোড়া খুলিয়া কোঁচার খুট দিয়া বেশ করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিতে থাকিতেন।

পতিতপাবনবাবু কোন কাজে উঠিয়া চলিয়া গেলে ফুল্লরা আসিয়া বসিত, বলিত,—দেখুন আমাদের এই মাঠের জাদু জানা আছে। কেউ একবার এলে হঠাৎ ছেড়ে যেতে পারে না।

বিমল উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিত—সে আবার কি রকম?

ফুল্লরা আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া ঠাকুরের হাতে ছুঁড়িয়া দিতে দিতে বলিত—এই দেখুন না কেন, আপনি তিন দিনের জন্য এলেন—আর এখন যেতে পারছেন না।

বিমল বলিত—আপনাদের মাঠে জাদু আছে কিনা জানিনা—তবে একটা বাঘ ছিল। তারই ফলে আমার এই দশা!

ফুল্লরা বলিত—সে তো বিছানায় শুয়ে কাটালেন। কিন্তু এখন,—ফুল্লরা হাসিত।

চকিতে বিমলের মনে সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত। তবে কি ফুল্লরা ভাবিতেছে যে তার জন্যেই সে এখানে পড়িয়া আছে।

বিমল গলায় কর্তব্যের সুরের আভাস আনিবার চেষ্টা করিয়া

বলিত—আসল কথা কি জানেন, সবাই যদি গ্রাম ছেড়ে যায়, তবে গ্রামগুলো যে উচ্ছন্ন যাবে।

ফুল্লরা হাসির ছোট্ট একটি আঘাত করিয়া বলিত—আপনার এই পল্লীপ্রীতি খুব সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।

—সম্প্রতি কেন? আজকালকার চিন্তাধারাই তো এই রকম।

—আমিও তো সেই কথাই বলছি—হয় আজকার, নয় বড় জোর কালকার। খুব বেশী পুরানো নয়, কি বলুন!

বিমল বলিত—যদি গাঁয়ের ভালবাসাতেই এখানে থেকে যাই—তাতে আপত্তি কি?

—আপত্তি কিছুই নেই। কিন্তু গাঁয়ের প্রতি যে আপনার খুব বেশী ভালবাসা আছে তা মনে হয় না।

—কি করে জানলেন?

—এটা কি বোঝা খুব শক্ত? গাঁয়ের কোন লোকের সঙ্গে তো আপনাকে মিশতে দেখি না!

অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে বিমল বলিত—তবে কি জন্য আছি আপনার মনে হয়?

—ওই যে বললাম—এই মাঠের জাদু আছে!

.বিমল বলিত—সে আবার কি?

ফুল্লরা হাসিতে হাসিতে বলিত—তা জানেন না বুঝি! জানবেন বা .কি করে? আপনি তো গ্রামে বড় আসেন না। এখানকার মাঠের মধ্যে রাত্রিবেলা এক কবন্ধ ঘুরে বেড়ায়!

কবন্ধ? বিমল কৌতুক অনুভব করিত।

—কবন্ধ বই কি!

বিমল শুধাইত—কবন্ধটা কি উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়?

ফুল্লরা বলিত—কোন্ এক লড়াইয়ে বেচারার মাথা কাটা গিয়েছিল—আজও সে সেই কাটা মাথা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বিমল বলিত—আপনি অবশ্য দেখেননি!

কিন্তু দেখিনি বলেই নেই—এ আমি বিশ্বাস করিনা।

বিমল হাসিয়া বলিত—ওসব জিনিষ দেখলেই বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু কবন্ধের সঙ্গে আমার মিল কোনখানে? আমার তো ধারণা আমার মুণ্ডটা এখনো যথাস্থানে আছে!

ফুল্লরা হাসিয়া উঠিত, বলিত—সেটা যথাসময়ে বোঝা যাবে। জানেন তো এক সময়ে এই মাঠে ডাকাতের দল ছিল; তারা ডাকাতি করে' লোকের টাকাকড়ি কেড়ে নিত—এখন ডাকাতের দল আর নেই। কিন্তু ডাকাতির অভ্যাস রয়ে গিয়েছে।

বিমল শুধাইত—কার?

ফুল্লরা বলিত—এই মাঠের।

বিমল হাসিয়া বলিত—তবু ভাল, মানুষের নয়।

তখন দুই জন সমস্বরে হাসিয়া উঠিত।

খুব সঙ্কীর্ণ পথে নৌকা চলিয়াছে—একটু এদিক ওদিক হইলেই বানচাল হইবার আশঙ্কা। একটা হাসির তুফানে নৌকাখানাকে এই বিপদের পথ পার করিয়া দিত। দুইজনে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত।

বিমল উঠিয়া পড়িত।

ফুল্লরা বলিত—চল্লেন।

বিমল বলিত—কল্‌কাতায় নয়—বাড়ীতে। শীগ্‌গির এখান থেকে যাচ্ছিনা—সেই কবন্ধটার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।

ফুল্লরা বলিত—বাঘের সঙ্গে যেভাবে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেভাবে যেন যাবেন না।

বিমল বলিত—আর গেলেও এবারে আপনাকে ফিরে ফোঁস দেওয়া যাবে না, কারণ বন্দুক দিয়ে কবন্ধ শিকার করবার ইচ্ছা আমার নেই।

ফুল্লরা বলিত—আবার কবে আসছেন?

বিমল বলিত—এই এক দিন আস্‌বো।

ফুল্লরা বলিত—একদিন নয়, পরশু দিন। পরশু আপনাকে আসতে হবে, আমার জন্মদিন!

—জন্মদিন! আসবো বই কি!

তারপরে একটু ভাবিয়া বলিত—যদি না এর মধ্যে মরি।

ফুল্লরা বলিত—বাঘ শিকারে না গেলে সে আশঙ্কা নেই!

—কি জানি আছে কি না? আপনাদের মাঠের নাকি জাদু জানা আছে?

ফুল্লরা বলিত—যারা পালাতে চায় তাদের উপর জাদু প্রয়োগ করে—আপনি তো আর পালাচ্ছেন না।

দুই জনে কথা বলিতে বলিতে বাগানের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিত। বিমল নদীর দিকে রওনা হইলে ফুল্লরা বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতে থাকিত।

বিমল ভাবিল ফুল্লরাকে জন্মদিনে কিছু দিতে হইবে; কিন্তু কি দেওয়া যায়? দামী জিনিষ দেওয়া চলে না—কলিকাতা হইতে কিছু আনিবার সময় নাই। ভাবিতে ভাবিতে টেবিলের দেরাজের মধ্যে সেই কালো পাথরটা নজরে পড়িল। সেদিন রাত্রে সেটাকে ভালো করিয়া দেখে নাই—আজ মনে হইল পাথরটা মন্দ নয়—ঘনকালো, মসৃণ, গোলাকার সুপক্ক কালো জামের মত! সে স্থির করিল পাথরটাকে সোনায় ঝুলাইয়া একটা লকেটের মত করিয়া ফুল্লরাকে দিবে—সে মালায় পরিতে পারিবে। পাথরটা লইয়া সে সুরেশ পোদ্দারের কাছে গেল, এবং তার ফরমাইস মত দুই দিনের মধ্যে একটা লকেট গড়িয়া দিতে বলিল।

* * *

সেদিন বিকাল বেলা লকেটটি লইয়া বিমল নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিল।

কোপাই নদীতে বান্ আসিয়াছে! সকাল বেলাতেও নদীতে জল অল্প ছিল। বেলা দশটার সময় জল বাড়িতে আরম্ভ করে—এখন বন্যার পূর্ণ প্রভাব। নদীর উৎসের কাছে উচ্চ মালভূমিতে আগের দিন বৃষ্টি হইয়াছে—সেই জলরাশি বিরাট অজগরের মত দুই তীর গ্রাস করিতে করিতে নামিয়া আসিয়াছে! সেই শুষ্কপ্রায়, মৃদুভাষী কোপাইকে এখন আর চিনিবার উপায় নাই! বন্যার জল এখনো পরিণতির সীমান্তে পৌঁছে নাই—প্রতি মুহূর্ত্তেই বাড়িতেছে। বিমল অনেকদিন কোপাইর বান দেখে নাই—কিন্তু এত প্রবল বন্যা সে কখনো দেখিয়াছে

মনে হইল না। দুই তীরের ধানের ক্ষেত, আখের ক্ষেত অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে। জল বাড়িতে বাড়িতে এ পারের তেঁতুল গাছটার তলাতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এ গাছটা নদী হইতে প্রায় দু'শ গজ দূরে—কাজেই বন্যার বেগ যে কত প্রবল তা সহজেই বোঝা যায়। আর সে কি গর্জ্জন! কোপাই স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী; অন্য সময়ে শালিকের কিচিমিচি, চড়ুয়ের পাখার শব্দকে ডুবাইয়া দিতে পারে না—এমন তার মৃদুস্বর! অবগুণ্ঠিতা কুলবধূকে ভূতে পাইলে যেমন নির্লজ্জ তাণ্ডব করিতে থাকে—দুকূলে অবগুণ্ঠিতা কোপাইর তেমনি দশা।

* * *

বিমল দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল কি করা যায়। বান যে হঠাৎ কমিবে এমন আশা নাই—দু'তিন দিনও থাকিতে পারে। সে খুঁজিতে লাগিল—পার হইবার জন্য তালের ডোঙা পাওয়া যায় কিনা! একখানাও ডোঙা দেখিতে পাইল না—অধিকাংশ ডোঙা হয় তো জলের তোড়ে ভাসিয়া গিয়াছে; যা দু'একখানা আছে তা-ও পার করিবার লোক নাই। বিমল ওরই একখানা চাপিয়া পার হইবে স্থির করিল—নৌকা বাহিতে সে জানে—তালের ডোঙাতেও কখনো কখনো চড়িয়াছে—কিন্তু ভীষণ বন্যার মুখে ডোঙা চালানো যে কত বিপদ্‌জনক তাহা সে জানিত না—কিন্তু জানিতে বড় বেশী বিলম্বও হইল না।

ডোঙা খুলিয়া দিতেই স্রোতের মুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল—বিমল যতই লগি দিয়া ঠেলে সেটা যেন ততই স্রোতের মুখে আরও বেগে ছুটিতে থাকে। ডোঙা বাহিতে জানিলে স্রোতের বিপরীতে চালাইতে চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে ওপারে যাইবার আয়োজন করা উচিত ছিল—এবং এই রকম করিয়া চলিলে হয় তো মাইল দুই দূরে নীচের এক জায়গায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত। কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছিবার

তাড়ায়, আর ডোঙা বাহিবার কৌশল না জানায়, বিমল ক্রমাগত ভুল করিতে লাগিল—ডোঙা স্রোতের বিপরীতে ঠেলিতে লাগিল। ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্যস্ততার আতিশয্যে যেমনি সে জোরে লগি মারিতে গিয়াছে—অমনি ডোঙাখানা টলিয়া কাৎ হইয়া গেল—বিমল জলে গিয়া পড়িল। সে ফিরিয়া ডোঙা ধরিতে গিয়া দেখিল—বহুদূরে গেরুয়া জলের মধ্যে ডোঙার উল্টাপিঠ দেখা যাইতেছে—আর এক মুহূর্ত্ত পরেই বাঁকের মুখে ডোঙা অদৃশ্য হইয়া গেল। ডোঙার দিক হইতে যখন নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল—দেখিল যে কাঁঠাল গাছের কাছে সে জলে পড়িয়াছিল সে গাছটা ইতিমধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। ওঃ বিমল আধ-মিনিটের মধ্যে কতদূরে চলিয়া আসিয়াছে!

বিমলের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই—সে সাঁতারে দক্ষ। কিন্তু আজ তার ভুল করিবার পালা—সে ডোঙা ঠেলিতে গিয়া যে ভুল করিয়াছিল—সাঁতার দিতে গিয়া তারই পুনরাবৃত্তি করিল—সে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল। ফলে সে একহাতও অগ্রসর হইতে পারিল না এবং ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। মিনিট পাঁচেক এইরকম ব্যর্থ সাঁতারের চেষ্টা করিয়া সে বুঝিল হাত ভারিয়া আসিতেছে—তখন সে অগ্রসর হইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের মুখে গা ছাড়িয়া দিল—বিমল জলের তোড়ে ভাসিয়া চলিল—এবং সেই বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাঁকের পরে নদী একেবারে অনেকটা প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। জলতল হইতে মুখ তুলিয়া বিমল দেখিতে পাইল বন্যার গেরুয়া চাদর দুই তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া গ্রামের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছে। নদীর স্রোত এখানে প্রবলতর, ঢেউ উচ্চতর, খাদ গভীরতর। সে তখনো সাঁতার দিয়া তীরে উঠিবার ইচ্ছা ছাড়ে নাই—মাঝে মাঝে

াতার কাটিতে চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু বরাবর তার একটা ভুল হইতেছিল—স্রোতের বিপরীতে যাইতেছিল; এইরূপে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে গা ভাসাইয়া দেয়—তখন দ্রুতগতিতে ভাসিয়া চলে; পর্য্যায়-ক্রমে সাঁতারের ক্লান্তি ও ভাসিয়া চলার পরে সে অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িল, শেষে সাঁতার দিবার শক্তি আর তার রহিল না—সে নিষ্ক্রিয়ভাবে ভাসিয়া চলিল।

বিমল দেখিতে লাগিল—শন ক্ষেতের মাথা অবধি ডুবিয়া গিয়াছে—হলুদবর্ণ ফুলগুলি জাগিয়া আছে—একটা ফুলের উপরে একটা ডাঁশ জাতীয় মাছি বসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু জলের তোড়ে-কাঁপা ফুলটাতে কিছুতেই বসিতে পারিতেছে না; তার পাশ দিয়া তীব্রবেগে কোন্ গ্রামের দড়ি-ছেঁড়া একখানা ডোঙা ভাসিয়া চলিয়া গেল; আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল মাথার উপরে, কত উপরে কে জানে, নীলের উপরে দুটা শাদা ফোঁটা—দুটা বকও হইতে পারে, দুটা মেঘখণ্ডও হইতে পারে; নদীর তীরে লোক নাই, গৃহপালিত কোন পশু পর্য্যন্ত নাই—এতবড় জনপদের মধ্যে জনসমাগমের কোন চিহ্ন নাই; হঠাৎ পরিচিত সংসারের বুক চিরিয়া কোথা হইতে একটা ধ্বংসের স্রোত যেন ছুটিয়া আসিয়াছে।

বিমল ভাবিতেছিল এমনি করিয়া ভাসিয়া যাইতে যাইতে নদীর কোন সঙ্কীর্ণতর স্থানে উঠিয়া পড়িবে—কিম্বা ইতিমধ্যে মানুষের দেখা পাইলে উদ্ধার পাওয়া সহজ হইবে। মৃত্যুর কথা একবারও তার মনে হয় নাই।

* * * *

হঠাৎ এমন সময়ে তার কানে একটা ক্রুদ্ধ কোলাহল আসিয়া পৌঁছিল—ব্যাপার কি বুঝিতে তার মুহূর্ত্তখানেক লাগিল—সে বুঝিতে

পারিল আজ তার রক্ষা পাওয়া কঠিন। এতক্ষণ তার মনে পড়ে নাই, পড়িলে হয় তো এমন অনায়াসে ভাসিয়া না চলিয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু এখন মনে পড়িয়া গেল—অদূরে, এক ক্রোশের মধ্যে কোপাইএর উপরে রেলের সাঁকো আছে। সেই সাঁকোর স্তম্ভগুলির চারিদিকে পাহাড়প্রমাণ পাথর ঢালা আছে, বন্যার সময়ে সেখানে জল প্রহত হইয়া একটা প্রলয় কাণ্ড বাঁধায়—অনেকবার সে তীর হইতে ইহা দেখিয়াছে—এতদূর হইতে, বন্যার শব্দ ছাপাইয়া সে শব্দ বিমলের কানে আসিয়া পৌঁছিল। বিমল বুঝিল সম্মুখে শব্দিতমৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে। গর্জ্জন ক্রমেই স্পষ্টতর, স্রোতের টান ক্রমেই দ্রুততর, বিমলের দেহ ক্রমেই অসাড়তর হইতে লাগিল; তখনও তার যেটুকু চৈতন্য ছিল তা'তে একটা রহস্য সে লক্ষ্য করিল যে মৃত্যুকে আদৌ ভীষণ বলিয়া মনে হইতেছে না; সে শুনিয়াছিল মৃত্যুর সময়ে জীবনের সমস্ত ঘটনা নাকি একটা স্মৃতির বিদ্যুৎ চমকে চোখের সম্মুখে খেলিয়া যায়; বড় বড় ঘটনাগুলি নাকি অত্যন্ত উগ্র হইয়া দেখা দেয়—তার অভিজ্ঞতায় এসব কিছুই হইল না।

কলিকাতায় তার বাসার সম্মুখে এক উড়ে ঠাকুর পান বেচিত, কেন জানি তার চেহারা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল, শীতের রাতে এক ভিক্ষুক-দম্পতি কিম্ভূত সুরলয়যোগে অজ্ঞাত ভাষায় গান গাহিয়া বেড়াইত—সেই গান যেন কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তার মনে পড়িয়া গেল সুরেশ পোদ্দারের মজুরি দেওয়া হয় নাই—একবার পকেটে হাত দিয়া দেখিল পাথর-বসানো লকেটটি ঠিক আছে—কিন্তু কেন সে লকেট তৈয়ারি হইল, কোথায় সে চলিয়াছিল, সে কথা তার মনে পড়িল

না। এমনকি সে যে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে—এক একবার তাহাও ভুলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সেই গর্জ্জন একটা বিরাট তরঙ্গের মত তার অবসন্ন চৈতন্যের উপর আসিয়া পড়িয়া তাকে শেষবারের জন্য অত্যন্ত সচেতন করিয়া দিল—সে দেখিল অদূরে, ওই সম্মুখে, স্তম্ভের মূলে পাথরের পাহাড়ের উপর ঢেউ পড়িয়া জল ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, ফাটিয়া ফুটিয়া, ঘুরিয়া, ঘোলাইয়া, নাচিয়া, মাতিয়া, ফেনাইয়া, ফুপাইয়া, রাগিয়া, গর্জ্জিয়া তাণ্ডব করিতেছে; স্রোত হুড় হুড় করিয়া ঢুকিতেছে—পাথরের রাশ হুড় হুড় করিয়া খসিয়া পড়িতেছে, অমনি স্রোতের একটানা গর্জ্জনে তাল কাটিয়া গিয়া মর্ম্মান্তিক ধ্বনি উঠিতেছে—আর স্তম্ভের অব্যবহিত গোড়াতে কি হইতেছে উচ্ছৃত জলকণার পর্দ্দার জন্য তাহা দেখিবার উপায় নাই। ওখানে গিয়া পড়িলে কি আর রক্ষা আছে! বিমল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল, কিম্বা প্রস্তুত হইবার কোন কারণ ছিল না, কারণ স্বভাবতঃ মানুষ জীবন-মৃত্যুতে যে ছেদ কল্পনা করে—বিমলের কাছে তা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল—বরঞ্চ ওই স্থানে গিয়া পৌছিলে কেমন লাগে জানিবার জন্য কেমন যেন তার কৌতূহলের মত বোধ হইতেছিল! আর এক মিনিটের মধ্যেই সে ওই জলের বিরাট হাতুড়িটার তলে গিয়া পড়িবে; কতক ভয়ে, কতক বিরক্তিতে, কতক কৌতূহলে সে চোখ বুজিয়া স্রোতের অন্তিমটানে আত্মসমর্পণ করিল। এক, দুই, তিন—; চার, পাঁচ, ছয়—কই সে তো হাতুড়িটার তলে এখনো গিয়া পড়ে নাই! এক মিনিট সময় কি তবে এত দীর্ঘ! বিশ হাত পথ কি তবে এত অফুরান্; বিমল চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল—প্রতি মুহূর্ত্তে সে অননুভূত একটা অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কোথায় সে অভিজ্ঞতা! সে কি কোনক্রমে মৃত্যুকে এড়াইয়া গেল! তা তো হইবার নয়—মৃত্যু নিশ্চিত এবং অদূরবর্ত্তী! কিংবা—

কিংবা বিমল চমকিয়া উঠিল—ইহাই মৃত্যু! হয় তো কখন্ সে মৃত্যুর সুরঙ্গটা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বুঝিতে পারে নাই; পারিবে কেমন করিয়া? কে পারে? মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আর কার থাকে! মহানন্দে পড়িয়া সে চোখ খুলিয়া ফেলিল—উপরে আকাশ, সম্মুখে রেলের সাঁকো, ওই সেই জলোচ্ছ্বাস—ব্যাপার কি?

ব্যাপার আর কিছু নয়, জল আর পাথরের অরাজকতায় ঠিক স্তম্ভের মূলে গিয়া একটা বিপরীতমুখী আওড়ের সৃষ্টি হইয়াছে, বিমল ভাগ্যক্রমে তেমনি একটা আওড়ে পড়িয়া গিয়াছে—ফলে সে পাথরের উপরে গিয়া না পড়িয়া আওড়ের মধ্যে পড়িয়া ধীরাবর্ত্তিত স্রোতে মৃদুমন্দ পাক খাইতেছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রথমে কেমন একটা নৈরাশ্যের ধাক্কা তার মনে লাগিল! তার পর মুহূর্ত্তেই উল্লাস। তার পর মুহূর্ত্তে পাছে আবার উল্টা স্রোতে গিয়া পড়ে ভাবিয়া ত্রাস। তার পর মুহূর্ত্তে এতক্ষণ কি বিপদের মধ্যে সে ছিল ভাবিয়া ভীতি। এইরকম নানাভাবের নাগরদোলায় পাক খাইতে খাইতে সে ধীরে ধীরে বিপরীতমুখী আওড়ের টানে ডাঙার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে এক সময়ে কখন্ তার পিঠ গিয়া ডাঙায় ঠেকিল! ডাঙার নিশ্চিত আশ্রয় পাইয়া সে শুইয়া পড়িল—এবং এক-আধ মিনিটের মধ্যেই সুপ্তি, ক্লান্তি, মূর্চ্ছার মধ্যে তার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ফুল্লরা নিজের জন্মতিথি কখনো পালন করিত না—এবারে শুধু বিমলকে নিমন্ত্রণ করিবার একটা উপলক্ষ্য হিসাবে জন্মতিথির অবতারণা করিয়াছিল। বিকাল বেলায় আশমানী রঙের একখানা শাড়ী পরিয়া খোঁপাতে শিউলিকুঁড়ির মালা গাঁথিয়া, থালাতে কিছু খাবার সাজাইয়া পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল——কিন্তু বিমল আসিল না। বেলা পড়িয়া আসিল, রৌদ্র ম্লানতর হইতে লাগিল, তালগাছের তুলিগুলা মাঠের উপরে ছায়ার কালো কালো সুদীর্ঘ পোঁচ টানিয়া দিতে আরম্ভ করিল, কঁচি আমনধানের ক্ষেত হইতে তপ্ত উদ্ভিজ্জ নিঃশ্বাস উঠিতে থাকিল, পশ্চিমের অস্তাচলের ঘাটে ছেঁড়া-ছাড়া মেঘের মধ্যে সূর্য্যাস্তের ভরাডুবি ঘটিয়া নানারঙের অরাজকতা চলিতে লাগিল—কিন্তু বিমল আসিল না।

বিমলের আজ কি হইয়াছে? সে নিমন্ত্রণ ব্যাপার কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে? যে-ভোলা মানুষ অসম্ভব কি? এমন ভোলামন থাকিলে ভদ্রলোক জীবনে কত কষ্টে পড়িবে! যদি এটা সামান্য নিমন্ত্রণ না হইয়া চাকুরীর 'ইণ্টারভিউ' হইত! ভদ্রলোকের চাকুরি হইত না। এমন করিয়া কত লোকের তো চাকুরী গিয়াছে। বেশ হইত। ভদ্রলোকের জব্দ হওয়া উচিত। এর পরে কখনো দেখা হইলে বেশ করিয়া শুনাইয়া দিব। না, কথা বলিয়া তার সঙ্গে পারিব না, কাজেই সব চেয়ে ভাল হইবে কথা না বলিলেই।

—আমার বড় দেরী হয়ে গেল।—

বলিতে বলিতে বিমল ঘরে প্রবেশ করিল। ফুল্লরাকে প্রতীক্ষমানা দেখিয়া বলিল—একি আমার জন্য আপনি অপেক্ষা করে' আছেন!

ফুল্লরার মন বলিল—কথা শোন একবার। অপেক্ষা করে' আছেন? মুখ বলিল—না, না এই বসেছিলাম!

কিন্তু সে যে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে তার চিহ্ন ও আয়োজন এমন প্রকট যে লুকাইবার কোন উপায় ছিল না, কাজেই এই বাস্তব সত্যকে ঢাকিবার জন্য মানসিক সত্যকে নিয়োগ করিল।

বিমল বলিল—আর সকলে কোথায়?

বিমল জানিত না যে এ আয়োজন কেবল তারই জন্যে; আর কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি।

ফুল্লরা বলিল—সকলে কি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে' থাক্‌তে পারে! তারা তো কাজের লোক!

বিমল বলিল—কাজের কথাই যদি বল্‌লেন, তবে শুনুন আমিও কম কাজের লোক নই। তবে কিনা কাজ দু'রকমের—কাজ আর অকাজ!

ফুল্লরা ঈষৎ বাঁকিয়া বসিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করিল—অকাজটা কি?

বিমল বলিল—একবার ভাল ক'রে আমার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন—টীকাটিপ্পনী দরকার হলে পরে করবো।

ফুল্লরা এবারে ভাল করিয়া তার দিকে তাকাইল, চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি? কাপড়চোপড় যেন ভিজে, চুল উস্কোখুস্কো, হাত পা ছড়ে গিয়েছে? কি হয়েছে?

তারপরে শঙ্কা ও কৌতূহলের মাঝামাঝি স্বরে বলিল—আবার কি বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন নাকি?

বিমল হাসিয়া বলিল—এবারে বাঘ নয়, বাঘিনী।

—না, না, শীগ্‌গীর বলুন ব্যাপার কি?

তবে শুনুন। আমার ধারণা ছিল এখানে আমার একমাত্র

শত্রু ছিল সেই বাঘটা। কিন্তু এখন দেখছি তারও চেয়ে বড় শত্রু আছে।

শঙ্কিতকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল—কে? বাঘিনী?

কৌতুকিত কণ্ঠ উত্তর দিল—না, কোপাই নদী।

—সে কি, খুলে বলুন।

তখন বিমল বানের মুখে তার দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিতে লাগিল; আর ফুল্লরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। কাহিনী শেষ হইল; অনেকক্ষণ পরে ফুল্লরা হাঁপ ছাড়িল, কিন্তু তার বড় বিস্ময় বোধ হইল এই দেখিয়া যে, এই ঘটনায় তার যে পরিমাণ দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল, আশ্চর্য্য এই যে সে পরিমাণ দুঃখ সে অনুভব করিল না। বেদনার শলাকায় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ বিদ্ধ হইতেই আনন্দের উচ্ছল ভোগবতীধারা বাহির হইয়া আসিল।

ইহা লক্ষ্য করিয়া বিমল বলিল—আপনি যেন আমার কাহিনী বিশ্বাস করলেন না?

—কেন?

—কারণ আপনার মুখে যে পরিমাণে কৌতুকের আভা দেখছি, সেটা তো বিশ্বাসদ্যোতক বলে মনে হয় না।

ফুল্লরা এবারে লজ্জিত হইল; এই ব্যাপারে যথোচিত দুঃখিত না হইবার জন্য লজ্জা। আবহাওয়াটাকে বদলাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল—আপনি বসুন, একখানা শুক্‌নো ধুতি এনে দি।

বিমল বলিল—সে কি হয়। কাপড়চোপড় ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। আর আন্‌লেও বদলাতাম না।

—এ আবার কি খেয়াল?

—খেয়াল নয়, পুরস্কার। এই ভেজা কাপড়, ছেঁড়া হাত পা, এতেই

আজ এই নিমন্ত্রণের চরিতার্থতা। বুঝলেন ফুল্লরা দেবী, যে-কালে জন্মেছি, তাতে বড় রকম একটা কিছু করবার অবকাশ নেই। সেকালের লোক হ'লে হয় লক্ষ্যভেদ, নয় ধনুর্ভঙ্গ করতে হ'ত। আর যদি মধ্যযুগে জন্মাতাম তবে হয়তো পৃথ্বীরাজের মত সংযুক্তাকে নিয়ে প্রতিকূল রাজন্য জনতার মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যেতাম। নদীসন্তরণ, অরণ্য অতিক্রম, প্রান্তরপরিক্রমণ, গিরিলঙ্ঘন, এ সকল এখন কাল্পনিক হ'য়ে পড়েছে। এহেন রোমান্স-বিরলতার মরুভূমিতে যদি ভাগ্যক্রমে একটা এড্‌ভেঞ্চার জুটেই থাকে, তবে তার চিহ্ন কি সহজে ছাড়তে পারি ?

কথাগুলা যে ফুল্লরার কর্ণকটু লাগিতেছিল তা নয়—কিন্তু নিষেধ না করিলেও নয়—তাই সে বলিল—

—তা তো বুঝলাম এখন আপনার মুখ বন্ধ করবার উপায় কি ?

বিমল হাসিয়া বলিল—মুখ বন্ধের আয়োজন তো সম্মুখেই দেখছি।

ফুল্লরা হাসিয়া খাবারের থালা অগ্রসর করিয়া দিল। বিমল খাইতে লাগিল। আহার ও চা-পান শেষ হইল।

বিমল বলিল—আপনার জন্মতিথির স্মারকরূপে কিছু দেবো ভেবে একটা জিনিষ সংগ্রহ করেছিলাম। শঙ্কিত হবেন না, দাম কিছু নয়। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে ঈর্ষ্যাবশে কোপাই সেটা আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল—আমাকে ডুবিয়ে মেরে। সেই জন্মই তো ওকে আমার শত্রু বলছিলাম।

ফুল্লরা বলিল—আপনার সেই মহামূল্য রত্নটি কি দেখি—যা স্বয়ং কোপাই সংগ্রহ করবার চেষ্টায় ছিল।

তারপরে হাসিয়া বলিল—তা হলে দেখা যাচ্ছে আমি যে-সে লোক নই, যার সঙ্গে কোপাইএর রেষারেষি, যার উপহার স্বয়ং কোপাই ছিনিয়ে নিতে চায়, তাকে আপনি ছোট মনে করবেন না।

বিমল বলিল—না, না, প্রতিযোগিতার কথা হচ্ছে না, ওকথা বলবেন না। প্রকৃতির সঙ্গে রেষারেষির কথা মনে আনবেন না—তাতে ভাল হয় না।

ফুল্লরা বিমলের এই অলৌকিক আশঙ্কায় হাসিয়া ফেলিল—বলিল,—আচ্ছা, না হয় না-ই বল্‌লাম এবারে আপনার মহামূল্য রত্নটা কি দেখি।

বিমল পকেট হইতে কাগজের মোড়ক খুলিতে লাগিল, ফুল্লরা উৎসুক হইয়া বসিয়া রহিল। মোড়ক খুলিতে কাগজের ছোট একটি বাক্স।

বিমল বাক্সটি তার হাতে দিয়া বলিল—এবারে খুলে দেখুন, তুচ্ছ জিনিষ দেখে হাসবেন না।

ফুল্লরা বাক্স খুলিয়া চমকিয়া উঠিল—সেই কালো পাথরের টুক্‌রা; সোনায় গ্রথিত হইয়া লকেটে পরিণত হইয়াছে।

বিমল বলিল—এই দেখুন আগেই বলেছি, জিনিষ এত সামান্য যে দেখে আপনি খুসী হতে পারেন না।

শঙ্কিত ফুল্লরা জিজ্ঞাসা করিল—এ পাথর আপনি পেলেন কোথায়?

বিমল হাসিয়া বলিল—এর জন্য আমাকে কাশ্মীরে, গোলকুণ্ডায়, ইস্পাহানে, সমরকন্দ কোনখানে যেতে হয়নি। এখানকার এই শুক্‌নো খোয়াই-এ কুড়িয়ে পেয়েছি।

—কবে পেলেন?

বিমল বলিল—সে কথা আমার বরাবর মনে থাক্‌বে। মনে আছে সেই দিন সন্ধ্যাবেলা খোয়াই-এর মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ফুল্লরা মাথা নাড়িয়া জানাইল—মনে আছে।

বিমল বলিতে লাগিল—আপনি তো চলে গেলেন, তখনো আমি দুর্ব্বল ছিলাম, বসে সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বালিয়েছি, আলোতে

ঝলকে উঠল—এই পাথরের টুক্‌রো। আশ্চর্য্য লাগল! ভাবলাম এখানে এমন পাথর এলো কোত্থেকে। একবার ভাবলাম আপনার হাত থেকে তো পড়েনি।

তারপরে একটু থামিয়া সে বলিল—তা যে পড়েনি তা বেশ বুঝতে পারছি—পড়লে এতদিনের মধ্যে নিশ্চয় জানতে পেতাম। তারপরে আমার কাহিনী সংক্ষেপ, পাথরটা নিয়ে রেখে দিলাম, সেই সেদিনের সন্ধ্যার স্মারক হিসাবে! এত শীগ্‌গীর যে সেটাকে বৃহত্তর আর এক ব্যাপারের স্মারক করে আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো, তা ভাবিনি।

তারপরে একটু হাসিয়া বলিল—এই দুই তিথির স্মারককে চেয়েছিল কোপাই কেড়ে নিতে, মরতে মরতে সেটাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসে দিলাম আপনাকে।

ফুল্লরা এতক্ষণ মূঢ়ের মত বসিয়াছিল; মূঢ়ের মতই বলিল—এখন কি করবো এটাকে নিয়ে!

বিমল বলিল—গলায় পরুন আর সামান্য জিনিষ মনে করে যদি পরতে লজ্জা হয়, তবে নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিন গিয়ে চালের হাঁড়ির মধ্যে।

ফুল্লরা আবার চমকিয়া উঠিল। মিশ্‌কিতো পাথরটাকে চালের হাঁড়িতেই রাখিতে বলিয়াছিল বটে। সে জিজ্ঞাসা করিল—চালের হাঁড়িতে কেন?

বিমল হাসিয়া বলিল—ওই তো হ'ল মেয়েদের সেভিংস ব্যাঙ্ক—সেফ ডিপজিট ভল্ট।

এই ব্যাপারে ফুল্লরা এমন বিমনা হইয়া গেল যে কথা আর ভাল জমিতেছিল না। বিমল উঠিয়া পড়িয়া বলিল—তা হ'লে চলি!

ফুল্লরা বাধা দিল না। কারণ নির্জ্জনে বসিয়া মনের সঙ্গে তার একবার বোঝাপড়া করা দরকার। সে কেবল বলিল—এবারে সাবধানে নদী পার হবেন।

বিমল বলিল—তার দরকার হবে না। এতক্ষণে জল কমে গিয়েছে।

ফুল্লরা বলিল—বিশ্বাস কি? কোপাই যে আপনার শত্রু।

বিমল কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল—আমার শত্রু, কিন্তু আপনার সপত্নী।

কথাটা ফুল্লরার কানে গেল না—ইতিমধ্যে বিমল অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিজের কানে গেল—সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল—ছিঃ ফুল্লরা শুনিলে কি ভাবিত?

সে রাত্রে ফুল্লরার ঘুম আসিল না। মিশ্‌কির ভবিষ্যদ্বাণী, সেই পাথরের পরিণাম, বিমলের বিপদ্, বিমলের প্রতি তার মনোভাব, আর কোপাই নদী সবসুদ্ধ মিলিয়া কেমন যেন বারংবার তালগোল পাকাইয়া যাইতে লাগিল। শরৎকালের দুপুরের আকাশে লঘু মেঘভার যেমন ক্ষণে ক্ষণে অপ্রত্যাশিত নব নব আকার ধারণ করে,—তার কতক লৌকিক, কতক অলৌকিক, তেমনি করিয়া ওই কয়েকটি বিষয় মুহুর্মুহু তার মনের মধ্যে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিতে থাকিল।

মিশ্‌কির কথা কি সত্য? সে তো পড়িয়াছে যে জিপ্সিরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বেড়ায়, অনেকের জীবনে সে-সব কথা অদ্ভুতভাবে সত্য হয়। যদি সত্য না হইবে, তবে সে পাথর এমন স্থানে পড়িয়া যাইবে কেন, যাহা একমাত্র বিমলের হাতেই পড়ে?

ফুল্লরা চমকিয়া ওঠে। তবে কি সে বিমলকে ভালবাসে? নিজের কাছে সে কথা লুকাইয়া কি লাভ? বিশেষ এই রাত্রে নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ অন্ধকারে নিজের কাছেই নিজে যখন বিলীন হইয়া গিয়াছে—তখন

প্রকাশ করিতেই বা কি ক্ষতি! হাঁ, বিমলকে সে ভালবাসে—কিন্তু মিশ্‌কির ভবিষ্যদ্বাণী যে অন্যরূপ। এই দুইয়ে মিলিয়া বিমলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নূতন আলোতে প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু এর মধ্যে আবার কোপাই আসিল কি প্রকারে? বিমল অবশ্যই বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছে যে কোপাই পাথরটা কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছিল। দিনের বেলাতে কথাটাকে তারও ঠাট্টা মনে হইয়াছিল—কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহা তেমন অনুমান হইল না। নদী, পর্ব্বত, অরণ্য এরা কি জীবিত নয়? কবিরা তবে এতকাল কি শিক্ষা দিয়া আসিতেছে? যদি তাদের কথা সত্য হয়,—তবে ঘটনা আরও জটিল হইয়া দাঁড়ায়। কোপাই ইহা কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছিল? কেন? ফুল্লরা জানে না। কিন্তু তাহার ইপ্সিত ধন ভোগ করিলে কি ফুল্লরার ক্ষতি হইবে না? বিমলের ভাল হইবে? বিমলের সেই সাবধানবাণী মনে পড়িল—প্রকৃতির সঙ্গে রেষারেষি করা ভাল নয়।

হঠাৎ তন্দ্রাহীন প্রহরের নিস্তব্ধতাকে ছাপাইয়া কোপাইর বন্যার কলগর্জ্জন কানে আসিল। বন্যার প্রকোপ এখনো কমে নাই। ফুল্লরার মনে হইল, কোপাই ব্যর্থচেষ্টায় ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন করিতেছে—ফুল্লরাকে, বিমলকে, দুপারে সুপ্ত দুই ক্ষুদ্র প্রাণীকে। না, না, কোপাইকে ফাঁকি দিয়া এ জিনিষ সে ভোগ করিবে না। নদী হইতে কখনো কারও ক্ষতি হয় নাই—ইহা কে বলিল? আর কিছু না হোক ডুবাইয়া মারিবার ক্ষমতা তো নদী রাখে।

ফুল্লরা স্থির করিল সে এখনি গিয়া নদীর জলে পাথরটা ফেলিয়া দিবে; কোপাই-র মুখের গ্রাস ফাঁকি দিয়া সে ভোগ করিবে না।

পাথরটা লইয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া, বাড়ী ছাড়িয়া নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে কালো নদী কালীর

গললম্বিত কালনাগিনীর মত ফুঁসিতে ফুঁসিতে ছুটিয়া চলিয়াছে ; সে গর্জ্জন নির্জ্জীব জলপ্রবাহের নয় ; রুষ্ট না হইলে সে গর্জ্জন সম্ভব নয় ; নদী রাগিয়াছে ; কালো প্রবাহের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোক স্ফুরিতেছে—সে কি ক্রুদ্ধচক্ষুর দৃষ্টি ! ভীত ফুল্লরার বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস হইল না, সে একবার পাথরটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নদীর প্রবাহে নিক্ষেপ করিল ; জল খল খল করিয়া উঠিল ; সে কি হাসি ! রাগের, অবজ্ঞার না প্রতিহিংসার ! সে আর সহ্য করিতে পারিল না —পিছন ফিরিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। বিছানায় গিয়া সে শুইয়া পড়িল —কিন্তু কিছুতেই কান হইতে, মন হইতে নদীর একটানা গর্জ্জনকে সে দূর করিতে পারিল না। সারারাত্রি তার নিদ্রাকে নদী-গর্জ্জন করাতের মত চিরিয়া চিরিয়া কাটিতে লাগিল।

বন্যা চলিয়া গেলে দুই দিন পরে একদিন ফুল্লরা নদীপার হইতে ছিল—হঠাৎ দেখিল বালুর তলে অর্দ্ধমগ্ন অবস্থায়, ছোট একখানা পাথরে ঠেকিয়া সেই কালো লকেটটি চক্ চক্ করিতেছে—বন্যা প্রবাহ তাহা লইয়া যায় নাই।

ফুল্লরা লকেটটি তুলিয়া লইল। নদী পাথরটা ফেলিয়া গেল কেন ? ফুল্লরার ত্যাগ সে গ্রহণ করে নাই—ফুল্লরার ক্ষমাপ্রার্থনা সে লঙ্ঘন করিয়াছে ? ফেলিয়া গেল কেন ? অবজ্ঞায় ! ফুল্লরার দুর্ভাগ্য কি তবে শেষ হয় নাই ? ক্রোধে ? ফুল্লরার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ? ফুল্লরা লকেটটি ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইতে পারিল না। অস্বস্তি জড়িত আশঙ্কায় তাহা মালার মধ্যে ও মনের মধ্যে বহন করিতে লাগিল।

১৯

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় মাসখানেক পরে একদিন বিকালে বিমল বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। কোপাই নদীর দক্ষিণ দিকে ডাঙাজমি ক্রমোচ্চ হইয়া গিয়া সদর রাস্তায় মিশিয়াছে। সে সেই মাঠের পথ ধরিয়া চলিতেছিল, এমন সময়ে দেখিতে পাইল দূরে ফুল্লরা আসিতেছে। সে দাঁড়াইল। সেই দিনের পরে তার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই—একবার দেখা হওয়া দরকার। ফুল্লরা কাছে আসিয়া পড়িলে বিমল জিজ্ঞাসা করিল—বেড়াতে বেড়িয়েছেন ?

ফুল্লরা বলিল—অনেকদিন পরে আজ বেরিয়েছি। দাদামশায় থাক্‌লে বড় বেরোনো হ'য়ে ওঠেনা। আজ তিনি বোলপুরে গেছেন।

বিমল বলিল—ভালই হয়েছে, চলুন একটু ঘুরে আসা যাক।

ফুল্লরা বলিল—এ আপনার কল্‌কাতা নয়, যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়ানো লোকে এখানে পছন্দ করে না।

বিমল বলিল—ওটা আপনার ভুল হ'ল। আমার সঙ্গে তো আপনি বেরোননি ; পথে হঠাৎ দেখা, আর মনে করুন না কেন যে আপনার পায়ের ধাপ আর গতিবেগ যদি আমার সমান হয়—তবে এক পথে চলতে গেলে দু'জনকে এক সঙ্গে বাধ্য হয়ে চলতে হবে। বোধ করি এখানকার লোক গণিতশাস্ত্রের অতিপ্রাথমিক এই নিয়মটাকে অস্বীকার করে না।

ফুল্লরা বলিল—কিন্তু গোড়ায় যে ভুল করে ফেল্‌লেন। যদি আমি আপনার পরেই বের হয়ে থাকি, আর, দু'জনের গতিবেগ সমান হয়, তবে তো আপনার সঙ্গে দেখাই হ'তে পারে না।

বিমল বলিল—দেখা হ'য়ে গিয়েছে, সেটা তো অস্বীকার করতে পারেন না। এখন আপনি যেমন খুসী ধাপ ফেলে চলুন, আমি সেই তালে চল্‌বো।

দু'জনে কথা বলিবার সময়ে দাঁড়াইয়া ছিল না, চলিতেছিল; এখন গণিতশাস্ত্রের জন্যই হোক বা অতিগণিত কোন কারণেই হোক, দুজনে এক সঙ্গেই চলিতেছিল।

আশ্বিন মাসের শেষ। দু'পাশে থাকে থাকে কচি আমনের ক্ষেত; ভিজে ক্ষেত হইতে দিবসের তাপাবসানে স্নিগ্ধ সিক্ত উদ্ভিজ্জ ভাপ উঠিতেছে; মানুষের পায়ের শব্দে চকিত বাবুই পাখী উড়িয়া স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসিতেছিল; মাঝে মাঝে যেখানে একটু জল জমে সেখানে কেয়া গাছের ঝোপ—দু' একটা ফুল ফুটিয়া আছে, সেই অলক্ষ্য ফুলের গন্ধ; আবার বা কতকটা মাঠ, যেখানে কোনো কালে লাঙলের রেখা দাগ টানে নাই।

কিছুক্ষণ চলিবার পরে তারা মাঠের উচ্চতম স্থানে আমলকি মহুয়া বনের আড়ালে কাঁচবাংলার উপাসনা মন্দিরের লৌহচূড়া দেখিতে পাইল।

ফুল্লরা বলিল—অনেকটা আসা হ'য়েছে। কাঁচবাংলার চূড়া দেখা যাচ্ছে।

বিমল বলিল—এতটাই যখন আসা হ'ল—চলুন না জায়গাটা দেখে আসি। আপনি গিয়েছেন কখনো?

ফুল্লরা বলিল—আমি যাইনি—অথচ আমরা এত কাছে থাকি, কত দেশ-বিদেশ থেকে ওখানে লোক আসছে।

দু'জনে কাঁচবাংলার দিকে চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে লাল সদর রাস্তা অতিক্রম করিয়া তারা কাঁচবাংলার লোহার গেটে প্রবেশ করিল। বাঁ হাতে উপাসনার জন্য নির্ম্মিত কাঁচের

একটা মন্দির; উপরে ঢালু টালির ছাদ, লোহার রেলিং-ঘেরা সেই মন্দিরে উঠিতে হইলে এক শ্রেণী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। তারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ভিত্তি শ্বেতপাথরে মণ্ডিত, নানা রঙের কাঁচখণ্ডের মধ্য দিয়া নানা রঙের আলোকখণ্ড ভিত্তিকে বর্ণবিন্যাসে অলৌকিক করিয়া তুলিয়াছে। এক পাশে আচার্য্যের বসিবার জন্য গালিচা ও শ্বেত পাথরের ছোট ছোট তিন খানি জলচৌকি।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া দেখিল পূবদিকে একটা অসমাপ্ত পুকুর —বোধ হয় খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া শেষে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তার পূর্ব্বপারে একটি মাটির টীলা, বটগাছ, আমলকি গাছে জঙ্গলিত,—ওই পুকুর-খোড়া মাটির স্তূপ!

মন্দিরের দক্ষিণে দোতালা একটি বাড়ী; বোধ হয় অতিথিসজ্জন আসিলে সেখানে থাকিতে পায়—সেই বাড়ীর সম্মুখে কাঁকর-ঢালা পথের দুই দিকে দীর্ঘ আমলকির শ্রেণী। বাড়ীটার পশ্চিমে এক সার দেবদারু; দেবদারুর পশ্চিমোত্তর কোণে গোটা দুই প্রাচীন ছাতিম বৃক্ষ। তারা শুনিয়াছিল এই বৃক্ষযুগলই নাকি এই জনপদের আদিম বৃক্ষ—সেখানে শ্বেতপাথরের নির্ম্মিত কোন সাধকের উপাসনার স্থান।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন লোকজন সেখানে তারা দেখিতে পাইল না; বুঝিল খুব সম্ভব পূজার ছুটি হইয়া গিয়াছে, তাই সব শূন্য পড়িয়া আছে। তারা বাড়ীটাকে পাশে রাখিয়া অপর দিকে যাইতেই অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য দেখিতে পাইল। এক বিরাট পুরুষ আসিতেছেন—দেহ-বিলম্বিত আসমানী রঙের ঢিলাপোষাক চলার তালে তালে আন্দোলিত হইতেছে; লম্বিত বাহুদ্বয় পিঠের দিকে পরস্পর মুষ্টিবদ্ধ; শুভ্র শ্মশ্রু; শুভ্র শিথিল কেশ, বাতাসে ইতস্ততঃ ভ্রষ্ট; আর তার ঠিক নীচেই সরস্বতীর শ্বেত লেখপট্টের মত শুভ্র নিরঞ্জন ললাট।

এই বিরাট পুরুষ আপন মনে একাকী আসিতেছেন; দীর্ঘ দেহ যেন সম্মুখে ঈষৎ নত, কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই মাটির দিকে তাকাইয়া চলিতেছেন।

তারা চমকিয়া দাঁড়াইল। এখন কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার আগেই স্বাভাবিক অনুভূতির প্রেরণাতেই যেন অগ্রসর হইয়া গিয়া তারা সেই পুরুষের পদপ্রান্তে প্রণতি করিল।

তারা উঠিয়া দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা বাড়ী যাওনি?

বলাবাহুল্য তিনি তাদের কাঁচবালার লোক মনে করিয়াছেন। তারা দেখিল অপরাজিতার মত স্নিগ্ধ কোমল কৃষ্ণাভ সেই পুরুষের চোখ দুটি। এমন সময়ে তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে পড়িল—অমনি তিনি নত হইয়া কয়েক টুকরো ভাঙা কাঁচ হাতে তুলিতে তুলিতে বলিলেন—মানুষের প্রতি এমন নির্ম্মম অবজ্ঞা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোথাও নেই।

এই বলিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া কাঁচের টুকরাগুলি আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য রক্ষিত একটি পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন।

ফুল্লরা বিমল দাঁড়াইয়া রহিল; বোধ হয় চলিবার বা বলিবার শক্তি তখন তাদের ছিল না। সেই পুরুষ আমলকি-বীথিকা ধরিয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমে মাঠের পথ ধরিয়া উত্তরদিকের একটি বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁর অদৃশ্য হইবার পরে বিমল যেন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল; সে বলিল—ফুল্লরা দেবী আজ এখানে না আসলে কি রকম ঠক্‌তে হ'ত!

ফুল্লরার বোধকরি তখনো সম্পূর্ণ বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় নাই—সে শুধু বলিল—চলুন।

তারা চলিতে চলিতে দেখিতে পাইল ডাইনে, বামে আম্রকুঞ্জ—

আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মাটির কোঠা, খড়ের বড় বড় ঘর—দু'একটি বা ইটের পাকা বাড়ী; সম্মুখে পূবপশ্চিমে লম্বা এক পথ—তার দক্ষিণ দিকে দীর্ঘ শাল গাছের শ্রেণী।

সারি সারি ঘর—লোক নাই; একদিকে খেলার মাঠ—নির্জ্জন; ফুলের বাগান ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে; সদ্য-ঝরা শিউলি ফুলের তলে আধ-শুক্‌নো শিউলি রাশি,—তার তলে আরও শুক্‌নো—তার তলে আরও শুক্‌নো ফুলের রাশি। যারা এখানকার ফুল কুড়াইত, মালা গাঁথিত, তারা আজ হয় তো দেশে বিদেশে নিজের বাড়ীর ফুল কুড়াইতেছে, মালা গাঁথিতেছে—কে বলিতে পারে! সেইসব কচি মুখগুলির কথা স্মরণ করিয়া আম্রকুঞ্জের পল্লবে পল্লবে এক একবার দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়া হাওয়ার হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে।

বড় রাস্তা ছাড়িয়া একটি ছোট গলিতে আসিয়া তারা উপস্থিত হইল—গলির এক পাশে ফুটিয়াছে বেলফুল, আর একপাশে শিউলি। বিমল আপন মনে কতকগুলি শিউলি ফুল তুলিল; আর একদিক হইতে ফুল্লরা তুলিয়া লইল কয়েকটি বেলফুল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া ফুল্লরা বলিল—এবার ফিরলে হ'ত না।

বিমল বলিল—তার আগে একটু ব'সে জিরিয়ে নিলে হয়—অনেক ঘোরা হ'য়েছে।

অদূরে ছোট ছোট পাঁচটি শাল গাছের বেষ্টনীর মধ্যে একটি বাঁধানো বেদী ছিল। বিমল বলিল—আসুন এখানে বসা যাক্‌। দুইজনে গিয়া সেই বেদীতে বসিল।

বিমল বলিল—যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস কিছু কিছু পড়েছো, সন্ধির নিশানের রং কি বলুন তো?

ফুল্লরা তার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না—তবু বলিল—শাদা।

বিমল বলিল—তবে এই নিন, শান্তির নিশান আমি প্রেরণ করলাম।

এই বলিয়া সে-শিউলি ফুলগুলি ফুল্লরার হাতে দিল। ফুল্লরা বলিল—সে কি! যুদ্ধ আরম্ভ হ'বার আগেই সন্ধি। কই আমি তো যুদ্ধ ঘোষণা করিনি!

বিমল বলিল—করেছেন, জানেন না। আর এ যুদ্ধ ঘোষণা, আপনি, আমি যে শুধু করেছি তা নয়। যখন আদিম প্রাণকণারূপে পৃথিবীর শৈশবে দুইজনে শৈবালপুঞ্জের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছিলাম, তখন থেকেই যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে—যার নাম জীবনসংগ্রাম।

ফুল্লরা হাসিয়া উঠিল,—বলিল আপনি কথাগুলো এমন নিটোলভাবে বানিয়ে বলেন যে ওগুলোকে সত্য বলে মনে হয় না।

বিমল বলিল—ফুল্লরা দেবী—এ আপনার অবিচার হ'ল—আমি সত্যই বলি, তবে সে সত্য নিজে বানিয়ে বলি; বানিয়ে-বলা সত্যেই তো বাণীর সম্মতি!

ফুল্লরা বলিল—কিন্তু স্বাভাবিক কথায় যে শৈথিল্য দেখা যায়, আপনার ভাষায় তার অভাব।

—তার মানে আপনি বলতে চান, উদ্ভিদ জগতে ঘেঁটুফুল যেমন সত্য পদ্মফুল তেমন সত্য নয়। কিন্তু একথা কে মানবে! দেখুন না, বিধাতা সৃষ্টি করেছেন হীরের টুকরো, শিল্পী তাকে কত যত্নে কত কৌশলে কুঁদে কুঁদে কেটে শিল্পবস্তু করে তোলে—তবে তো তার শতমুখে ফোটে কৌতুক-রশ্মি-ভাষণ।

ফুল্লরা শুধু বলিল—বুঝলাম।

বিমল বলিল—আমি একটা কথা এখনো বুঝলাম না, আমি যখন সন্ধি করতে উৎসুক আপনি কি বিগ্রহের অবস্থা রাখতে চান?

ফুল্লরা শুধাইল—কেন?

—তবে আপনার হাতে যে সন্ধির পতাকা দেখছি তা এখনো প্রেরণ করলেন না কেন?

ফুল্লরা হাসিয়া, যেন কত অনিচ্ছাতে, যেন কেবল তার কথা রাখিবার জন্যই নিজের হাতের বেল ফুলগুলি বিমলের হাতে দিল। বিমলের আঙুলের সঙ্গে তার আঙুলের ডগা ছুঁইয়া গেল।

কথা বলিতে বলিতে তারা মাথা তুলিয়া দেখিল চারিদিক সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। শরৎকালের স্বচ্ছ আকাশে অজস্র তারকার ফোটা-আঁকা অন্ধকার ভীত কৃষ্ণসারের মত লঘুচরণে ছুটিয়া চলিয়াছে—পশ্চাতে ধাবমানা কোন্ মনোহারিণী ব্যাধ-কুমারীর কোমরে তীক্ষ্ণ হ্রস্ব রক্তোজ্জ্বল ছুরিকাফলার মত তৃতীয়ার চন্দ্রকলা।

জোনাকীর ফুল-তোলা, শেফালি-মালতীর [illegible]ভের নক্‌সা আঁকা, বাষ্পঘন তমিস্রার নীলাম্বরী নলদময়ন্তীর শাড়ীখানা [illegible] তাদের ক্রমেই জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে তাদের কথার কৌতুকোজ্জ্বল চটুল[illegible] কমিয়া আসিল, নিরন্তর বাক্-প্রবাহে ছেদ পড়িতে লাগিল, এবং ব[illegible] উভয়ের অজ্ঞাতে মুখরতার আসনে মৌন আসিয়া আসন পাতিল।

দু'জনে পাশাপাশি বসিয়াছিল—প্রায় গায়ে গায়ে লাগালাগি; বাতাসে ফুল্লরার দু'চারগাছি অলক উড়িয়া বিমলের কপোলে স্পর্শ করিল; ফুল্লরার আঁচল এক একবার বিমলের স্কন্ধে উড়িয়া পড়িতে লাগিল; একবার তাহা সরাইবার জন্য ফুল্লরা হাত নাড়িল—সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়ির গোছা রিনি রিনি করিয়া বাজিয়া উঠিল—আর সেই

কম্পন বিমলের চিত্তসরোবরে ক্রমবর্দ্ধমান তরঙ্গবলয় তুলিয়া ব্যাপকতর হইতে লাগিল—সেই তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে হতভাগ্যের হৃদয় অসহায় পদ্মটীর মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকিল।

অন্ধকারে হাত নাড়িতে গিয়া বিমলের আঙুল ফুল্লরার হাতে ঠেকিল—ফুল্লরা হাত সরাইয়া লইল। তারপরে একবার ফুল্লরার হাত কি করিয়া বিমলের হাতে ঠেকিল—বিমল হাত সরাইয়া লইল না, ফুল্লরা হাত টানিয়া লইল। এবার বিমলের হাত ফুল্লরার হাতে গিয়া পড়িল—ফুল্লরা হাত টানিয়া লইতে যাইতেছিল—বিমল চাপ দিয়া ধরিল, যেন সে বুঝিতেই পারে নাই ফুল্লরার হাতে চাপ দিতেছে এমনভাবে, ফুল্লরা হাত টানিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। এখন ফুল্লরার কোলের উপরে ফুল্লরার হাতেই উপরে বিমলের হাত পড়িয়া আছে। কেহ নড়াইতে সাহস করিতেছে না, পাছে এই সত্যটা উগ্র হইয়া ওঠে যে দুটি হাত ধরা পড়িয়াছে, দুটি মন ধরা পড়িবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তারা চমক ভাঙিয়া অনুভব করিল—বিমলের মুষ্টিতে ফুল্লরার পাণি আবদ্ধ।

তখন রাত্রি গভীরতর হইয়াছে, অন্ধকার ঘনতর হইয়াছে, আকাশে নক্ষত্ররাজি অজস্রতর হইয়াছে; পৃথিবী নিঃসঙ্গ, জনপদ নির্জ্জন, প্রকৃতি নিস্তব্ধ; তারা এমনভাবে কতক্ষণ বসিয়াছিল জানে না! যখন তাদের চমক ভাঙিল, যখন শাখা হইতে শিউলিকুঁড়িটিতে ঝরিল, যখন লতা হইতে মালতী ফুল খসিল, যখন অন্তিম চন্দ্রকলা নত হইতে হইতে দিগন্তে গিয়া স্পর্শ করিল, তখন বিমলের মুখ ধীরে ধীরে নুইয়া পড়িয়া উদ্বোথিত, অসম্বৃত, অর্দ্ধচৈতন্য ফুল্লরার ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করিল। সেই কম্পিতকপোলের লজ্জার অরুণাভা তার মুখমণ্ডলের চারিদিকের অন্ধকারকে ক্ষণকালের জন্য যেন স্বচ্ছ করিয়া তুলিল।

ফুল্লরার ডায়ারীর কয়েক পাতা।

অদ্ভুত এই লোকটি—আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে।

সেদিন রাতে আরও একটু বসতে বলছিলেন, আমার ইচ্ছা ছিল না তা নয়, কিন্তু কেমন যেন ভয় লাগছিল। কোন পুরুষের এত কাছে কখনো বসিনি। যখনি বসবার প্রস্তাব করলেন, বুঝলাম আজ বিপদ আছে। কিন্তু না বলতে পারলাম না, আর বললেই বা কে ছাড়ত; অসম্ভব ব্যাপারকেও কথায় যে লোক সম্ভব ক'রে তুলতে পারে, তার হাত থেকে মুক্তি পাবো কি উপায়ে? আর সত্যি কথা বলতে কি মুক্তি তো চাইনি। বসতে হ'ল।

অমন সুন্দর ভাবে কথা বলতে কাউকে শুনিনি; ক'জন লোকের কথা বা শুনেছি, তা নয়, বইতো পড়েছি। তা'তেও তো কথার অমন ফুলঝুরিবর্ষণ চোখে পড়েনি। কিন্তু একহিসাবে কথা ভাল, যতক্ষণ কথা চলছিল বিপদ ছিল না, কিন্তু কথা যখন পড়ে এ'ল, মনে কেমন এক অজানা ভয় জাগ্‌ল—এবারে বৃষ্টি নামবে; নাম্‌লও তাই। আমার উচিত ছিল খোঁচা দিয়ে দিয়ে তাঁর কথার উৎসাহ জাগিয়ে রাখা। কিন্তু সুপরিপাটি কথামালার কাছে আমার কথা কইতেই লজ্জা করে। আর জাগিয়ে রাখবই বা কেন। আমি তো অপছন্দ করি না। স্পর্শসুখ কেবল বইয়ে-ই পড়েছিলুম—ভাবতাম সুখকর কিছু। কিন্তু এখন বুঝছি, বইয়ের সত্য অর্দ্ধসত্য, মিথ্যার কাছাকাছি; জগতে সব জিনিষই আছে, কিন্তু যতক্ষণ তা জীবনের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে না আসছে, ততক্ষণ তা না থাকবারই সামিল। সেইজন্য যার জীবনের অভিজ্ঞতা

যত ব্যাপক, তার জগতও তত বড়; তোমার জগৎ, আমার জগৎ নয়; মাঝে মাঝে এক আধবার হয় তো জগৎ মণ্ডল ঘুরতে ঘুরতে পরস্পর ছুঁয়ে স্পর্শ করে যাচ্ছে।

স্পর্শসুখের কি মোহ! সেই অভিজ্ঞতাকে আবার ভোগ করবার জন্যে বর্ণনা করতে ইচ্ছা করছে। আবার, বলা বোধ হয় ভুল হ'ল। কারণ সে মুহূর্তে কি হয়েছিল তা মনে নেই। যাই হোক—তাকে সুখ বলা ভুল। কিম্বা এতদিন যাকে সুখ মনে করে আসছি তা-ই ভুল! কিম্বা সুখদুঃখ সোনার হাতল-ওয়ালা ইস্পাতের তরবারি।

মনে হ'ল কোন্ কৌতূহলী দেবতার অক্ষয় তূণ থেকে অলৌকিক শূল নিক্ষিপ্ত হ'ল আমার মর্ম্মের গভীরতম স্থানে। চিত্তের যে গভীরতাকে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি—বেদনার বিদ্যুৎ-বিকাশে তা উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল।

মনে হ'ল সেই সুখকর, দুঃখকর, মোহকর, উন্মাদকর বজ্রপ্রলেপে আমার রক্তমাংস গলে বাষ্প হ'য়ে কুয়াশার মত আদিম নীহারিকায় গিয়ে মিশে গেল; মত্তহস্তী যেমন শুঁড় দিয়ে সরোবরের তলাকার মাটি থেকে মৃণাল-মূলকে উৎখাত করে নিতে বদ্ধকর, জলতলের পদ্মটিতে মাত্র সে আর সন্তুষ্ট নয়, তেমনি কোন্ অজ্ঞাত শক্তি আমার অস্তিত্বের মূলকে নিয়ে টানাটানি করছে—এই চেষ্টায় দু'জনের বিলয় হ'য়ে যায়—সেও আচ্ছা!

মনে হ'ল—আর কি মনে হ'ল জানি না। আত্মবিস্মৃতি এতদিন শোনাকথা মাত্র ছিল—সেদিন সত্য বুঝলাম আত্মবিস্মৃতি কি! আত্ম-বিস্মৃতি সুখও নয়, দুঃখও নয়; সুখদুঃখের পরিণাম।

মোহ ভঙ্গ হলে তিনি বললেন—আরও একটু বসতে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হ'লাম না। যে-রত্ন আমি অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ

করেছি, তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে চাই। অপ্রত্যাশিতকে বিশ্বাস কি! তার আসতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ।

উঠে পড়বার আগে কেন জানিনা বলে ফেললাম আজ আর নয়, আর একদিন আপনার কথা রাখবো।

তিনি বললেন—তা হ'লে তিন সত্যি করুন।

করলাম—না করলে ছাড়া পেতাম না।

সে দিনও শাসিয়ে গিয়েছেন, যে তাঁর অনুরোধ পালন করবার সত্যি দিয়ে এসেছি। এমন একটা কড়া অনুরোধ করবেন, যাতে আমি ঠ'কে যাবো। কড়া না হোক, অদ্ভুত কোন অনুরোধ যে করবেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

অদ্ভুত এই লোকটি! আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে।

সেদিন যখন ভিজেকাপড় ছেঁড়া হাত-পা নিয়ে এসে হাজির হ'লেন কি ভয়ই না পেয়েছিলাম। কিন্তু একটা কথা স্বীকার না করে' পারি না—ভয় পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু যে বিপদ্ তিনি পেরিয়ে এসেছেন, যাতে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব ছিলনা, সে বিপদের কথা স্মরণ করে, তেমন দুঃখ পাইনি। হয়তো ভয়টা নিজের জন্য, দুঃখটা পরের জন্য; তাই ভয় হ'য়েছিল, দুঃখ হয়নি।

কিন্তু সেই ভেজাকাপড়, ছেড়াজামায় যেমন লোকটিকে মানিয়ে ছিল—এমন আর কিছুতে মানায় না। বুক-খুলে ময়লা শার্টের মাঝ দিয়ে বক্ষপেশী দেখা যাচ্ছে; জামার একটা আস্তিন গুটানো, আর একটা বোধ হয় ছিঁড়ে খুলে পড়ে গিয়েছে; বজ্র-চালনা করতে পারে এমন দুই পরিপুষ্ট বাহু; ভেজা-কাপড় লেপ্‌টে রয়েছে মাংসল দুই উরুর সঙ্গে; পায়ে নেই জুতো, মাথার চুল কতক রুক্ষ—বাতাসে যেমন খুসী উড়ছে; একগোছা তখনও ভেজা ছিল—লেপ্‌টে রয়েছে কপালের

উপরে; ডান হাতের কব্জীতে কাটা দাগ—তখনো রক্ত দেখা যাচ্ছে —সে কি রক্তের রং যেন গলন্ত চুনির ফোঁটা।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের এই যে বন্যার তাড়নাতেও পকেট থেকে লকেট-টা হারায়নি। ওই কালো পাথরটা আমার সৌভাগ্যের কষ্টি পাথর। সেদিন কি রকম ভয় যে আমার ধরেছিল। ভদ্রলোক এমন ভাবে সব অসম্ভব কথা বলেন যেন—সেইটেই একমাত্র সত্য। কোপাই নাকি ওই পাথরের টুক্‌রো কেড়ে নেবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র করেছিল—এখন ওর গ্রাস থেকে ছিনিয়ে ওটাকে ভোগ করলে আমার মঙ্গল হবে না। ভয়ে আমি অমন সুন্দর লকেটটা হারাতে বসেছিলাম। বোকার মত ফেলে দিলাম গিয়ে নদীর জলে। কিন্তু নদী নদীই—ভদ্রলোকের বর্ণিত লুব্ধ রুষ্ট রমণী নয়, কাজেই যেখানকার পাথর সেখানে ফেলে রেখে বন্যা চলে গেল। এখন পাথরটা আমার মালার মাঝখানে, বুকের কাছে দুল্‌ছে।

মিশ্‌কি শয়তানী। মিছি মিছি একটা টাকা ঠকিয়ে নিয়ে একটা পাথর দিয়ে আমাকে বোকা বানিয়ে দিল। আবার বলে কিনা যার হাতে প্রথমে ওটা পড়বে, সে হবে আমার বর। আচ্ছা যদি ওটা প্রথমে ও লোকটির হাতে না পড়ে আমার ঝি মিনুর হাতে পড়ত? কিংবা মিতন মালীর হাতে পড়ত?

কিন্তু ওইখানেই বাধে আমার গোল। সবই যখন হ'তে পারতো —তখন আর সব না হ'য়ে এমন হ'তে গেল কেন? খোয়াই-এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল কেন? সেখানে পাথরটা পড়ল কেন? তিনিই বা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখতে পেলেন কেন? আমিই বা মিছি মিছি একটা জন্মতিথি করতে গেলাম কেন? ও উপলক্ষ্য সৃষ্টি না করলে তো তাঁর লকেট দেবার কথা মনে পড়ত না! হয়

তো কিছু আছে। আছে তো থাক্—যা হয়েছে তা বেশ হয়েছে—লকেটটি ভারি সুন্দর।

আচ্ছা ভদ্রলোকটি কল্‌কাতা ফিরে গেলেন না কেন? এখানে হঠাৎ এমন কি সোনার খনি পেলেন যে এমন কলকাতার কথা ভুলেই গেলেন?

আবার বলেন কিনা—আমার দোষ! সেদিন বন্দুক না পাওয়াতেই নাকি তাঁর জীবনের স্রোত ঘুরে গেল। বন্দুক পেলে না জানি কি হ'ত? আর যাই হোক, এতদিনে বোধ হয় ভদ্রলোকের শিকারের বাতিক গিয়েছে।

লিখবার সময়ে লিখছি ভদ্রলোক, লোকটি, বলবার সময়ে কি বলে ডাক্‌বো ভেবে পাইনে। তিনি আবার ঢং করে' ডাকেন ফুল্লরা দেবী, যেন আমি সত্যিই কোন দেবী। শুধু ফুল্লরা বলতে কি মুখে বাধে! লোকটির প্রতি আমার যথার্থ মনোভাব কি বুঝে পাইনে—কখনো তাঁর কথা মনে পড়লে রাগ হয়, কখনো হাসি পায়, কখনো বিরক্তি ধরে—কখনো বা আবার দুঃখ পাই। আসল মনোভাব কি বুঝতে পারিনে। আজকে সন্ধ্যাবেলায় বুঝতে পেরেছি, বিশেষ কোন কারণ যে ছিল তা নয়, অনেক দিন দেখাই হয়নি। কাছে থাক্‌লে দূরে যেতে ইচ্ছা করে—দূরে থাক্‌লে মনে হয় কাছে যাই। কাছে থাক্‌লে মনে হয়—একটি লোকেই আমার জগৎ পূর্ণ করে' রেখেছে—দ্বিতীয় [illegible]নের আর স্থান নাই। একটি লোক দূরে চলে গেলে মনে হয়—জগৎ শূন্য হ'য়ে গেছে—পৃথিবীতে আর লোক নেই! এতদিনে ঠিক কথাটি মনে এসেছে—আমি ভালবাসি—তাকে ভালবাসি।

২১

তারপরে কয়েক মাস চলিয়া গিয়াছে—কয়েক মাস আর তিনটি ঋতু; ফুল-ফোটানো শরৎ, ধান-পাকানো হেমন্ত, আর পাতা-ঝরানো শীত।

মাসের পরে মাস, ঋতুর পরে ঋতুর পাক খুলিয়া বিশ্ব-বসন বাড়িয়া চলিয়াছে আর তার দুই প্রান্তে দুটি পাড়ের মত মানব ও প্রকৃতি সমান্তরাল ভাবে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, নিত্য সংযুক্ত কিন্তু মিলিতে পারিতেছে না; ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কিন্তু সম্বন্ধ হইবার উপায় নাই; অবিচলিত দূরত্ব হইতে পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেছে—কিন্তু স্পর্শাতীত; বিশ্ব-বসনের সৌন্দর্য্য, সৌভাগ্য, সম্পদ্‌ এই দুটি পাড়—মানব ও প্রকৃতি।

বসন্ত আসিয়াছে। কোপাই নদীর তীরে বনে যেমন বসন্তের সমারোহ—এমন বাংলাদেশের আর কোথাও নহে। তালবনী গ্রামের উত্তরে কোপাই নদীর তীরে বহু ক্রোশ জুড়িয়া কোন গ্রাম নাই—কেবল অরণ্য; ঘন অরণ্য নয়—গ্রামের নিকটে, অথচ গ্রাম হইতে বিবিক্ত।

পলাশগাছের শেষ পাতাটি পড়িয়া গিয়াছে—গোড়া হইতে চূড়া পর্য্যন্ত কেবল ফুল আর ফুল;—এমন শত শত গাছ; শিমূলগাছ বড় বড় উচ্চ দীর্ঘ শাখাগ্রে রক্তিম ফুল ফুটাইয়া আকাশটাকে রঙ করিতে চাহিতেছে; গুলমোরের অজস্র পুষ্পসম্ভারের সঙ্গে আকাশ-ফাটা বিরাট একটা রক্তিম অট্টহাসি ছাড়া আর কিছুর তুলনা হয় না; এমন ক্রোশের পর ক্রোশ—নির্জ্জন অরণ্য—কোপাই-এর দুই তীর ব্যাপিয়া। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, অজস্র রক্তিম পুষ্পশিখায় পুরাকালের খাণ্ডবদাহনের পুনরভিনয় হইতেছে।

আর একদিকে শালের বন—বলিষ্ঠ শাখাগুলি হস্তিদন্তাভ পুষ্পদলের ভারে আনত ; মাটিতে এক হাটু গভীর হইয়া পুষ্পদল ঝরিয়াছে—চলিতে গেলে ফুলের মধুতে পা আঁটিয়া যায় ; মাঝে মাঝে আমের গাছ—পাটল মঞ্জরীতে আকণ্ঠপূর্ণ ; তলে চলিতে গেলে ফোঁটা ফোঁটা মধু মাথায় পড়ে ; এক একবার দমকা বাতাস আসে—একরাশ মুকুল ঝরিয়া পড়ে ; একদল মৌমাছি গুন্ গুন্ করিয়া ওঠে, আবার সব নিস্তব্ধ—কেবল কোকিলটার ছুটি নাই—নন্দনে আদিদম্পতির নিদ্রাভঙ্গের যে-গান সে শিখিয়াছিল—সেই কুহু শর সে নিক্ষেপ করিয়াই চলিয়াছে।

এমন সময়ে একদিন মিতন ফুল্লরাকে একখানি চিঠি দিয়া গেল। ফুল্লরা চিঠি খুলিয়া দেখিল, বিমল লিখিতেছে—

ফুল্লরাদেবী,

সেদিন তিন সত্যি করে' বিদায় নিয়েছিলেন, আমার একটি অনুরোধ রাখবেন—আজ সেই অনুরোধ রক্ষার তিথি উপস্থিত।

কাল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। কোপাই নদীর তীরে বনলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণলিপি পেয়েছি, তাতে বিশেষ করে' নির্দ্দেশ আছে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

যে-অঙ্গীকার করেছেন, তা'তে আমার অনুরোধ হ'লে রক্ষা করতে হ'ত—কিন্তু এ একেবারে স্বয়ং বনলক্ষ্মীর আমন্ত্রণ—জানি এ লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা আপনার নাই।

কাল বিকেল বেলা রেল-রাস্তার লেভেল ক্রসিং গেটের কাছে উপস্থিত থাকবেন—দু'জনে বসন্তের দরবারে যাবো। একাকী যাবার চেষ্টা করবেন না—পথ খুঁজে পাবেন না। একাকী হবেন না—ভয় নেই ; সেখানে আপনার একটি সঙ্গিনী পাবেন, তার নাম কোপবতী। ইতি

বিমল।

পরদিন বিকালবেলা লেভেল ক্রসিং-এর কাছে পৌঁছিয়া ফুল্লরা দেখিল বিমল তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

বিমল বলিল—যাক্, তবু ভাল, এসেছেন যে। আমি ভাবছিলাম বনলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ বুঝি রক্ষা করবেন না।

ফুল্লরা বলিল—সঙ্গিনীটি কোথায় ?

বিমল হাসিয়া বলিল—এতক্ষণে বুঝলাম ; তাকে দেখবার কৌতূহলে এসেছেন, নিমন্ত্রণের জন্য নয়।

ফুল্লরা বলিল—নয় কি করে' জানলেন ? দুটো কথাই তো একসঙ্গে ছিল।

বিমল বলিল—তা যদি হয়, তবে যথাসময়ে, অর্থাৎ নিমন্ত্রণক্ষেত্রে পৌঁছে দেখ্‌তে পাবেন।

ফুল্লরা শুধাইল—ক্ষেত্রটি কোথায় ?

চলুন সেখানে যাওয়া যাক্।—বলিয়া বিমল চলিতে আরম্ভ করিল, ফুল্লরা পাশে পাশে চলিল।

দু'জনে রেলপথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

বিমল বলিল—দেখেছেন বসন্তের স্পর্শে কেমন কাঁটাগাছগুলি অবধি কচিপাতায় ভরে গেছে।

ফুল্লরা বলিল—নতুন পাতায় কাঁটাগুলো আর চোখে পড়ে না।

—ওই দেখুন ক'টা বুনো টিয়ে যাচ্ছে—ওদের পালকে নূতন রং ধরেছে ; গলার কাছে লাল বেষ্টনীটি কেমন রক্তিম হ'য়ে উঠেছে। শীতকালে এমন ছিল না।

ফুল্লরা বলিল—মানুষের তো এমন হয় না !

বিমল বলিল—ওরা প্রকৃতির আপন ধন কিনা ! তাই প্রকৃতি নিজ হাতে তুলি ধরে' ওদের রাঙিয়ে দেয়। আর মানুষকে রাঙাবার ভার

মানুষের উপরে—তাই তারা কাপড় রাঙায়, চাদর রাঙায়, শাড়ী রাঙায়; যে পারে সে নিজের মনটা রাঙায়।

—কতদূরে যেতে হবে?

বিমল বলিল—রেলের সাঁকোর কাছে গিয়ে নীচে নামতে হবে।

কিছুক্ষণ চলিবার পরে তারা রেলের সাঁকোর কাছে আসিয়া পৌঁছিল, এবং রেলের বাঁধ হইতে অত্যন্ত সন্তর্পণে নীচে নদীর তীরে নামিয়া আসিল।

বিমলকে অনুসরণ করিয়া ফুল্লরা আরও খানিকটা চলিল—অবশেষে বিমল একস্থানে থামিল। বলিল—এই হচ্ছে বনলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণের সভামণ্ডপ!

ফুল্লরা বলিল—কিন্তু সঙ্গিনীটি?

বিমল বলিল—ফুল্লরাদেবী, কৌতূহল সম্বরণ করুন, এখনি দেখ্‌তে পাবেন। তার আগে সভাস্থল দেখুন, কেমন সাজিয়েছে।

এই বলিয়া সে ফুল্লরাকে লইয়া জায়গাটা ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিল।

—এই দেখুন কচি কোমল ঘাসের কিংখাব বিছানো—তা'তে কেমন লাল, বেগুনী ঘাসের ফুলের কাজ-করা।

ফুল্লরা খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল—দেখুন কত করবীগাছ—আর কি ফুল ফুটেছে! এই জঙ্গলে করবী গাছ এলো কোত্থেকে?

বিমল বলিল—ওই তো ভুল হ'ল! জঙ্গল কোথায়? এ যে স্বয়ং বনলক্ষ্মীর সভা।

—জানেন, আমি করবীফুল ভালবাসি, লাল করবী!

—আমি জানি আর না জানি, স্বয়ং বনলক্ষ্মী জানেন, সেই জন্যই এত ফুল ফুটিয়েছেন!

বিমল বলিল—আর ওই দেখুন শিরীষগাছে, অপ্সরীদের চামরের মত কত ফুল ধরেছে !

স্থানের মাহাত্ম্য ক্রমে ফুল্লরাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল—সে উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—ঠিক, বলেছেন শিরীষফুল তো দেখতে অপ্সরীদের চামরের মতই বটে !

তারপরে আর একদিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই যে কাঞ্চনফুল ; লাল, শাদা—আবার লালে-শাদায় মেশানো ! ওগুলো অপ্সরীদের কি বলুন তো !

বিমল বলিল—ওগুলো অপ্সরীদের বাতি ; কত রং-বেরঙের কাঁচে তৈরি !

ফুল্লরা বলিল—চলুন একটু ঘুরে দেখি ।

বিমল বলিল—চলুন, কিন্তু বেশি দূরে যাওয়া হবে না। ওদিকে ঘন বন।

সেদিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিল, পলাশে, শিমূলে আর গুলমোরে রঙের মাতামাতি লাগিয়া গিয়াছে—শত শত পিচকারীতে লাল রঙের পাগলামি—বৃন্দাবনের কোন বনে শ্যামবসনধারী রাখাল বালকেরা যেন হোলিতে মাতিয়াছে।

বিমল বলিল—চলুন এবার সঙ্গিনীকে দেখিয়ে আনি।

এই বলিয়া সে নদীর দিকে ফিরিল—ফুল্লরাও ফিরিল। বিমল দেখাইল—ওই দেখুন নদীর ওপারে কেবল শালের বন—এত বড় বন এদিকে আর নেই। বনের মাথায় যেন ফুলের একটা প্রলেপ পড়ে' গিয়েছে। আর বনে যদি গিয়ে উপস্থিত হন—তবে দেখবেন এক হাঁটু পুরু হ'য়ে ফুলের দল ঝরে' পড়েছে—ফুলের মধুতে পায়ের চারদিকে ফুলের মোজা এঁটে যায়।

তারা নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফুল্লরা শুধাইল—সঙ্গিনী কোথায়?

বিমল বলিল—তার নাম কি বলুন তো?

ফুল্লরা বলিল—কোপবতী—

বিমল—তবে ওই সম্মুখে দেখুন।

—ও তো নদী! কোপাই!

বিমল বলিল—ডাক নাম কোপাই, ভাল নাম কোপবতী!

ফুল্লরা শুধাইল—তবে ইনিই আপনার সঙ্গিনী?

—কেন পছন্দ হ'ল না নাকি?

ফুল্লরার মন হইতে একটা অর্দ্ধ-অস্বস্তির ভার নামিয়া গেল—সে বলিল—হয়েছে বই কি! যেমন আপনি তেমনি আপনার সঙ্গিনী!

বিমল বলিল—আমি যেমনি হই, আমার সঙ্গিনীকে মন্দ বলতে পারেন না।

এই বলিয়া সে ক্ষীণ নদীর দ্রুত জলধারার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—দেখুন তো কেমন গঙ্গাজলী ডুরে শাড়ীখানা কোমরে পেঁচিয়ে পরে ছুটে চলেছে। এঁটে-পরা শাড়ীর সীমান্তে দেহের সীমা কেমন মিশ খেয়েছে—প্রতিপদক্ষেপে কেমন দেহ তরঙ্গিত হ'য়ে উঠেছে—কোথাও জড়তার লেশ মাত্র নেই।

বিমল অদূরে নদীর মধ্যে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আর ওই দেখুন শাড়ীতে কত রঙের ফুলের ছাপ। ওই দেখুন পলাশফুলের ছায়া পড়ে কেমন ফুল-কাটা; আবার ওইখানে গুল-মোরের ফুলের ছায়াতে কেমন চমৎকার লাল; আর ওই-ই ওপারের তীর ঘেসে দেখুন শাল ফুলের শাদা ছায়া কেমন কাশ্মীরিনক্সা তুলে দিয়েছে। আর কি উচ্ছল হাসি শুনেছেন?

ফুল্লরা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—হাসি শুনলেন কোথায়?

বিমল বলিল—কেন ওই নুড়িগুলো এক একবার স্রোতের তোড়ে বেজে বেজে উঠ্‌ছে! ওই তো হাসি! স্রোতের কলধ্বনিতে ওর ভাষা!—তারপরে ফুল্লরার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেমন নয়?

ফুল্লরা বলিল—তা'তে যদি খুসী হ'ন তবে তা-ই!

বিমল শুধাইল—কেন আপনি কি খুসী হলেন না?

তারপরে নিজের মনেই যেন বলিতে লাগিল—তা বটে খুসী হবেন কেমন করে? একজন মেয়ের প্রশংসা আর একজন শুনলে কখনো খুসী হ'তে পারে না।

ফুল্লরা বলিল—ও তো নদী।

বিমল বলিল—বর্ণনায় তো ওকে আমি মেয়ে করে তুলেছি—তাতেই যথেষ্ট! কি বলেন?

ফুল্লরা কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্ত বলিল—বেশ হাল্কা গরম হাওয়া দিচ্ছে, স্নান করতে পারলে বেশ হ'ত।

বিমল বলিল—বেশ করুন না। নিমন্ত্রণে যাবার আগে স্নান করে' যাওয়াই তো উচিত!

ফুল্লরা বলিল—কিন্তু অতিরিক্ত শাড়ী তো আনিনি!

বিমল বলিল—চলুন না দেখা যাক্, বনলক্ষ্মী কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা!

দুইজনে কতদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল একটি পলাশ গাছের ডালে দুটি পুঁটুলি বাঁধা আছে! বিমল একটা পুঁটুলি খুলিতেই বাসন্তীরঙের শাড়ী, ওড়না আর একটা কচিকলাপাতার রঙের কাঁচুলি বাহির হইয়া পড়িল।

ফুল্লরা শুধাইল—এ কি করে হল? নিশ্চয় আপনার কাজ!

বিমল বলিল—নিমন্ত্রণ করেছেন বনভূমি, আমি কেন ব্যবস্থা করতে যাবো ?

ফুল্লরা বলিল—বনভূমি খুব বেশি হ'লে বল্কলের আয়োজন করতে পারে। শাড়ী ওড়না পাবে কোথায় ?

বিমল বলিল—কালিদাসের শকুন্তলা পড়লে একথা বলতে পারতেন না! শকুন্তলার বিদায়ক্ষণে মালিনীর বনভূমি শকুন্তলাকে শাড়ী অলঙ্কার উপহার দিয়েছিল—জানেন ?

ফুল্লরা বলিল—ও পুঁটুলিতে কি ?

—বোধ হয় আমার জন্যে কিছু আছে।

সে পুঁটুলি খুলিতে বাসন্তী রঙের ধুতি, চাদর বাহির হইল।

বিমল বলিল—এবার আর আপনার স্নানের কোন বাধা নেই। নদীর ওই বাঁকটার আড়ালে আপনি স্নান করতে পারেন। এদিকে আমি স্নান করবো!

দুইজনে কাপড় লইয়া নদীর দিকে চলিল।

ফুল্লরা বলিল—এই নদীকেই তো কিছু দিন আগে আপনি ভয় করতেন—আজ আবার তার সঙ্গে মিতালি হ'ল কি করে ?

বিমল বলিল—ভয় এবং ভালবাসা সগোত্র-অনুভূতি—ভালবাসার পাত্রকেই তো লোকে ভয় করে। ভয়ের পাত্রকে ভাল না বাসতেও পারে।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে নদীর ধারে আসিয়া থামিল—এবং স্নানের জন্য নদীর বাঁকের দুইদিকে দুইজনে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে স্নান সারিয়া উঠিয়া ফুল্লরা দেখিল অদূরে বিমল দাঁড়াইয়া আছে—তার পরণে বাসন্তীরঙের ধুতিচাদর! বিমল দেখিল—বাসন্তী রঙের শাড়ীতে আর ওড়নায় ফুল্লরাকে স্বয়ং বনলক্ষ্মীর মত

দেখাইতেছে—ওড়নার ফাঁক দিয়া কাঁচুলির কচিকলাপাতার রং দেহের গৌরবর্ণকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে; ভেজাচুলের রাশ দুলিতেছে—কাঁধের উপর দিয়া দু'চার গাছা বুকের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে; চোখের সিক্ত পক্ষ্মগুলি পরস্পর জুড়িয়া আছে; শুভ্র গ্রীবাতে দু'চার ফোঁটা জল।

বিমল হাসিল—ফুল্লরা হাসিল।

ফুল্লরা বলিল—আপনার বনলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ কি এই পর্য্যন্ত নাকি? খাবার আয়োজন তো দেখ্‌ছি না।

বিমল বলিল—এইবার দেখ্‌তে পাবেন।

দুই জনে সেই করবীকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল।

বিমল বলিল—এবারে এখানে আসুন—ওই দেখুন কাঞ্চনগাছ গুলোতে!

ফুল্লরা দেখিল—কাঞ্চন গাছের ডালে নানারকম ফল দুলিতেছে—আপেল, কমলা, আখরোট, কলা!

ফুল্লরা বলিল—আপনি কি জাদু জানেন নাকি?

বিমল হাসিয়া বলিল—জাদু জানলে কি এই দুর্দ্দশা হয়! আর ফলগুলো যে জাদু নয় তা হাত দিলেই বুঝতে পারবেন।

ব্যাপার আর কিছু নয়—এই রকম একটা নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিবার মতলব কয়েকদিন আগে বিমলের মাথায় আসিয়াছিল—তখন সে কলিকাতা হইতে নানা রকম দুষ্প্রাপ্য ফল ও রঙীন শাড়ী প্রভৃতি আনাইয়া লইয়াছিল। আর আজ সকালবেলা এখানে একপাক আসিয়া পূর্ব্ববর্ণিতভাবে সব সাজাইয়া রাখিয়াছিল। জায়গাটা এত নির্জ্জন যে চুরি হইবার কোন ভয় ছিল না।

বিমল বলিল—চলুন ওগুলো সংগ্রহ করা যাক; আমার তো খিদে পেয়েছে।

তখন দুইজনে মিলিয়া কোঁচড় ভরিয়া আপেল, কমলা, কলা পাড়িয়া ঘাসের উপরে গিয়া বসিল।

কিন্তু তারপরে হইল বিপদ। ফুল্লরা কিছুতেই বিমলের আগে খাইবে না।

বিমল বলিল—এখানে দু'জনেই আমরা সমানভাবে নিমন্ত্রিত, আগে পরে খেলে চলবে কেন?

ফুল্লরা বলিল—ওসব কথা রাখুন। আমি আগে খাবোনা!

কাজেই বিমলকে আগে খাইতে হইল!

বিমল বলিল—এবারে আপনি খান।

ফুল্লরা বলিল—খাবো, কিন্তু আপনার সামনে নয়।

—সর্ব্বনাশ! বনলক্ষ্মী তা হ'লে রাগ করবেন।

—করুন গে। এক আচ্ছা বনলক্ষ্মী খাড়া করে আপনার যা খুসী করিয়ে নেবেন তা হবে না! অমন করলে আমি মোটেই খাবোনা।

ভয় পাইয়া বিমল বলিল—তথাস্তু আপনি আড়ালে বসেই খান।

ফুল্লরার খাওয়া যখন শেষ হইল—তখন পূর্ব্বদিগন্তে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদ তখনো দিগ্‌রেখা ছাড়াইয়া উপরে ওঠে নাই—গাছপালার পূর্ব্বদিকের ফাঁক দিয়া কিরণরেখা অমৃতের পিচকারির ধারার মত বনের মধ্যে পড়িয়াছে। ওপারের শালবনে আবছা-অন্ধকার। নদীর ওপারের জল কালো—এপারের জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

দুইজনে মুখ তুলিয়া দেখিল চন্দ্রোদয়ের সোনার কাঠির স্পর্শে একমুহূর্ত্তে প্রকৃতির স্বরূপ বদ্‌লিয়া গিয়াছে—হয় তো সে পরিবর্ত্তনের স্পর্শ মানুষের মনের মধ্যেও লাগিয়াছে।

ওপারের বন হইতে শালফুলের নেশাধরানো গন্ধ—এপারের বন

হইতে আমের মুকুলের স্বপ্ন-লাগানো সৌরভ; ওপারের বনের ছায়া—এপারের বনের আলো; ওপারের বনের টিট্টিভ—এপারের বনের কোকিল; ওপারের নিস্তব্ধতা—এপারের নির্জ্জনতা—আর মাঝখান দিয়া কালোনদী কোপাই।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পরে বিমল বলিল—ফুল্লরা দেবী আমার একটা প্রাপ্য আছে।

শঙ্কিত ফুল্লরা বলিল—কি?

—মনে আছে, আপনি বলেছিলেন একটা অনুরোধ রাখবেন।

ফুল্লরা বলিল—সেই অনুরোধের জন্যই তো এখানে এসেছি।

—এখানে এসেছেন বনলক্ষ্মীর আমন্ত্রণে—আমার অনুরোধে নয়। চিঠিতে একথার উল্লেখ আমি করেছিলাম।

ফুল্লরা বলিল—আর একদিন আপনার অনুরোধ রাখবো।

বিমল বলিল—হয় আজ রাখবেন, নয় দরকার নেই।

ফুল্লরা বলিল—কি অনুরোধ আগে শুনি!

—সে রকম তো কথা ছিল না!

ফুল্লরা মনে মনে প্রমাদ গণিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভীতস্বরে বলিল—রাখবো।

তারপরে উচ্চকণ্ঠে বলিল—এবারে বলুন কি অনুরোধ?

বিমল বলিল—আপনাকে ফুল দিয়া সাজাবো।

ফুল্লরার বুকের উপর হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। কিন্তু যেমন স্বস্তি পাইবে আশা করিয়াছিল তেমন পাইল না; কেমন যেন একটা খোঁচা অনুভব করিল, আশাভঙ্গের খোঁচা। হায় রে মানুষের মন!

তখন বিমল উঠিয়া চাঁদের আলোতে ফুল পাড়িয়া আনিল।

করবী, কাঞ্চন, পলাশ, শিমূল, গুলমোরের থোলো! আমের মুকুল, শিরীষফুল, বনজ্যোৎস্না, বনচামেলি—রাশি, রাশি, অজস্র!

বিমল বলিল—এবারে সেজে নিন।

ফুল্লরা বলিল—তার জন্যে চাই নেপথ্যবিধান।

বিমল বলিল—এখানে নেপথ্য কোথায় পাবেন? কিম্বা সবটাই এখানে নেপথ্য!

ফুল্লরা বলিল—সে হবে না। আপনার সামনে আমি সাজতে পারবো না। তার চেয়ে আমি আড়ালে যাই।

বিমল তাকে বাধা দিয়া বলিল—না, না, ওদিকে অন্ধকারে যাবেন না —এখনো ভালো করে জ্যোৎস্না ওঠেনি। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক—আমি চোখের পাতার যবনিকা ফেলে আমার দৃষ্টিকে আড়াল করছি—আপনি সেজে নিন।

ফুল্লরা বলিল—চোখের পাতার মালিককে বিশ্বাস কি?

—তবে এক কাজ করুন।—এই বলিয়া সে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিল—এই নিন আমার চোখ বেঁধে দিন!

ফুল্লরা বলিল—ঠিক হ'য়েছে।

ফুল্লরা উঠিয়া আসিয়া রুমাল দিয়া কষিয়া বিমলের চোখ বাঁধিয়া দিল।

—দেখতে পাচ্ছেন?

বিমল বলিল—পাচ্ছি।

—কা'কে?

আপনাকে, আপনি হাসছেন।

ফুল্লরা হাসিতেছিল বটে!

—কি সর্ব্বনাশ।

বিমল বলিল—ভয় নেই, দেখাটা মানসনেত্রে!

—আচ্ছা বলুন তো ক'টা আঙুল।

বিমল বলিল—মানসনেত্রে আঙুল গণনায় অক্ষম।

ফুল্লরা বলিল—তা হলেই চলবে। এবার ভালছেলের মত চুপ করে' বসে থাকুন—রুমাল খুলবার চেষ্টা করবেন না।

বিমল কৃত্রিম নৈরাশ্যের স্বরে বলিল—আমার ভাগ্যে এমন পূর্ণিমা তিথি অমবস্যায় পরিণত হ'ল।

ফুল্লরা সাজিতে সাজিতে উত্তর দিল—ভয় নেই এখনই পূর্ণশশীর উদয় হবে।

কিছুক্ষণ পরে ফুল্লরা বিমলের চোখের রুমাল খুলিয়া দিল।—বিমল দেখিল সম্মুখে পুষ্পিতা ফুল্লরা।

সে হাসিয়া বলিল—সম্মুখে পূর্ণশশী-ই দেখছি বটে!

অপ্রস্তুত ফুল্লরা বলিল—আমি তা মনে' করে বলিনি!

বিমল বলিল—কার মনের কথা কে জানে?

বিমলের খুব বেশি বলিবার অবকাশ ছিল না, কারণ তখন সে ফুল্লরাকে দেখিতেছিল।

তার আলগোছেবাঁধা খোপা ঘিরিয়া করবী ফুলের বেড়; কানে একটি করিয়া শিরীষ; কণ্ঠে বিনিসূতায় গাঁথা কাঞ্চনের হার—আর কটি ঘিরিয়া কিংশুকের মেখলা; হাতে আমের মুকুলের মঞ্জরী।

ফুল্লরা বলিল—এবারে চলুন।

বিমল বলিল—রাত বেশি হয়নি—বসুন।

ফুল্লরা বসিল।

বিমল বলিল—ফুল্লরা দেবী—

তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। ফুল্লরা প্রমাদ গণিল। সে উত্তর দিল বটে—কিন্তু এত মৃদুভাবে যে বিমল শুনিতে পাইল না।

বিমলও চুপ করিয়া রহিল। কেবল উদীয়মান জ্যোৎস্নায় ওপারের বন স্ফুটতর হইতে লাগিল—আর এপারের বনের অজস্র শাখাপ্রশাখা ভেদ করিয়া চাঁদের কিরণ বনভূমিতে আলোছায়ার নূতন নূতন ছক কাটিতে লাগিল।

হঠাৎ কখন্ এক সময়ে কি করিয়া সমস্ত বাধা ঠেলিয়া এক নিঃশ্বাসে বিমল বলিয়া ফেলিল—আপনাকে আমি ভালবাসি।

নিস্তব্ধ অরণ্যপ্রান্তে সেকথার উত্তর দিবার জন্য কেহ ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে আবার বিমল কথা বলিল—বলিল—শুনেছেন?

ফুল্লরা বলিল—আমি তার কি করবো!

এমন যে বাক্‌পটু বিমল, সে-ও কিছু উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

কেবল মূঢ়ের মত বলিল—আপনাকে বলছিলাম।

ফুল্লরা বলিল—কে বলতে বলেছে।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—ওসব বাজে কথা কে বলতে বলেছিল?

বিমল চুপ করিয়া থাকিল।

ফুল্লরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল উদ্গতঅশ্রু যেন চোখ ছাপাইয়া না পড়ে; সে আকাশের দিকে তাকাইয়া অশ্রুর অধোগমন বন্ধ করিবার চেষ্টায় ছিল।

অশ্রুর কারণ সে বুঝিতে পারিল না। তার নিজের দিকের কথা তো সে ডায়ারীর পাতার কোণে প্রকাশ করিয়াছিল—আজ যদি অপরের দিকের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে—তাহাতে অশ্রু কেন?

কাব্যে যে আনন্দাশ্রুর কথা পড়া যায়—আর যাই হোক এ অশ্রু তেমন আনন্দের নয়। আনন্দের চেয়ে দুঃখের সঙ্গে এর বেশি মিল! কিন্তু দুঃখই বা কিসের! ভালবাসিলে, অন্যের ভালবাসা পাইলে

পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের আত্মবিলোপের সময় আসন্ন হইয়া ওঠে; যে-অস্তিত্ব এতদিন ধরিয়া ব্যক্তির একমাত্র নির্ভর থাকে, তাকে এখন ত্যাগ করিতে হইবে—সেই প্রত্যাসন্ন বিদায়-ব্যথাতেই হয় তো এই অশ্রুর উৎস! কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফুল্লরা বলিল—আমি চললাম।

বিমল বলিল—চলুন, আমিও যাচ্ছি।

নিঃশব্দে দুইজনে পাশাপাশি চলিল। রেললাইনে উঠিয়া ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল—তখনো কেহ কথা বলিল না; জ্যোৎস্না-প্রণোদিত বিশ্ব তখন হাতীর দাঁতে খোদাই-করা একখানি শুভ্রপটের মত দেখাইতেছিল—সেই পটভূমিকায় দুটি ক্ষুদ্র চলমান মনুষ্যমূর্ত্তি মনের মধ্যে ঘোর অন্ধকার বহন করিয়া গ্রামের দিকে, অদৃষ্টের পরিণামের দিকে নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিল।

২২

সেদিন চৈত্রমাসের সংক্রান্তি। সন্ধ্যার দিকে বিমল দ্রুতগতি বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিল—এত তাড়াতাড়ি সে বেড়াইয়া ফেরেনা, কিন্তু আজ তাড়া ছিল; আকাশে কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়াছিল।

পথ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে আরও আগে সে ফিরিতে পারিত; মন খারাপ ছিল, কোন্ পথে যাইতেছে তার খেয়াল ছিলনা।

সেই পূর্ণিমা রাত্রির পরে ফুল্লরার সঙ্গে আর তার দেখা হয় নাই। দু'তিন বার সে ফুল্লরাদের বাড়ীতে গিয়াছে কিন্তু শুনিতে বাধ্য হইয়াছে সে বাড়ীতে নাই; বাড়ীতে অবশ্যই ছিল—আর কোথায়ই বা যাইবে? বেড়াইতে যাইবার সময় এখন নয়। বোধ করি সে বেড়াইতে বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, নতুবা মাঠের মধ্যে, বা কোপাই নদীর ধারে দেখা হওয়া উচিত ছিল; এমন অনেকবার আগে হইয়াছে।

মিতনের হাতে দুই দিন চিঠিও পাঠাইয়াছে—কোন উত্তর পায় নাই।

বিমল ভাবিতেছিল সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে? ভালবাসার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে—এইমাত্র! কিন্তু ফুল্লরার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, ব্যবহার দেখিয়া তার মনে হইয়াছিল বিমলকে সে-ও ভালবাসে। অন্ততঃ বিমলের মুখে ভালবাসার কথা শুনিলে সে যে রাগ করিবে না—ইহা নিশ্চয় সে বুঝিয়াছিল।

কিন্তু ফুল্লরা যে রাগ করিয়াছে—তাহা কে বলিল! লজ্জাও তো হইতে পারে। কিন্তু এতদিন ধরিয়া লজ্জা! তখনি তার মন বলিয়া উঠিল—লজ্জা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না;—কিম্বা দীর্ঘকাল স্থায়ী লজ্জাকে রাগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বিমল স্থির করিল পতিতপাবনবাবুর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিবে —দেখি ফুল্লরা তখন কেমন রাগ করিয়া পালাইয়া বেড়ায়!

হঠাৎ বিমলের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—ফুল্লরাকে ধরিবার একটা উপায় পাওয়া গিয়াছে। সহসা এই সিদ্ধান্তে তার মন হাল্কা হইয়া গেল—এতক্ষণে পথের দিকে তাকাইবার অবকাশ পাইল।

কিন্তু অবকাশ প্রায় ছিল না। কালবৈশাখীর অতর্কিত ঝড় আসিয়া পড়িয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা দমকা বাতাস তার উপরে আসিয়া পড়িল; তারপরে আবার সব নিস্তব্ধ।

বিমল গতি দ্রুততর করিয়া দিল—কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে পারিবে কেন! আর একটা দমকা বাতাস; তারপরে আর একটা—তারপরে আর একটা! বাতাসের বেগে মাঠের কাঁকর ছর্‌রাগুলির মত ছুটিয়া গায়ে বিঁধিতে লাগিল; বালু উড়িয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া দিল; চোখ খুলিলে বালু ঢুকিয়া পড়ে; চোখ বুজিয়া চলিলে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। ঝড়ের মধ্যে ছুটিতে গিয়া সে আছাড় পড়িল; কাপড় ছিঁড়িয়া গেল—পা ছড়িয়া গেল—চুল এলোমেলো হইয়া গিয়া ভাজে ভাজে বালুর স্তর জমিয়া গেল।

এমন সময় সে অনুভব করিল বায়ুমণ্ডল যেন হঠাৎ শীতল হইয়া পড়িল—ব্যাপার কি ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই তড়্‌বড়্‌ করিয়া চারিদিকে শিল পড়িতে আরম্ভ করিল।

বিমল বুঝিল কোথায়ও আশ্রয় না পাইলে সমূহ বিপদ্। কিন্তু এই মাঠে আশ্রয় কোথায়? দুই একটা বড় গাছ আছে বটে, কিন্তু ঝড়ের যে বেগ ডাল ভাঙিয়া পড়িতে কতক্ষণ! ইতস্ততঃ ভাঙাডাল ইতিমধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

বালু, শিলা ও জলের নিষেধ ভেদ করিয়া তার চোখে পড়িল— রেলের বাঁধ। আর একবার দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, সাঁকোর কাছে

সে আসিয়া পড়িয়াছে। মনে আশা হইল—কারণ সে জানিত রেলের বাঁধের উপরে, সাঁকোর কাছে একটি পরিত্যক্ত গুমটি ঘর আছে—সেখানে আশ্রয় পাওয়া যাইবে; বিমল সেইদিকে ছুটিল।

গুমটির কাছে পৌঁছিয়া দেখিল ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিল দরজা খুলিল না; প্রাণপণে ডাকিল—দরজা খুলিল না; খুলিবে কি করিয়া ভিতরে যদি কেহ থাকেই তবে সে নিশ্চয় বিমলের ডাক শুনিতে পায় নাই—যে ঝড়ের গর্জ্জন, মেঘের শব্দ! গুমটির টালির ছাদে শিলার তড়বড়ি,—আর নীচে ক্ষুব্ধ নদীর কলধ্বনি।

কিন্তু আর নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব—এবারে বেশ বড় বড় শিল পড়িতেছে—ইতিমধ্যেই কয়েকটা বিমলের মাথায় হাতে পায়ে পড়িয়াছে। সে অন্য কোন প্রবেশপথ আছে কিনা দেখিবার জন্য ঘুরিতে লাগিল; দেখিতে পাইল পিছনের দিকে ছোট একটি জানালা রহিয়াছে; কপাট বন্ধ; ধাক্কা দিতেই কপাট খুলিয়া গেল; একটা শীতল দমকা হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিল—এবং পর মুহূর্ত্তেই তাকে অনুসরণ করিয়া বিমল ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল; ঠিক সেইক্ষণে একবার বিদ্যুৎ চমকিল—বিমল দেখিল ঘরের অন্য প্রান্তে কে যেন জড়সড়ো হইয়া বসিয়া আছে। আর একবার বিদ্যুৎ চমকিলে লোকটা কে সে চিনিতে পারিত বটে—কিন্তু জানালা খোলা রাখিবার উপায় ছিল না—জল, শিলা, বাতাস সবেগে প্রবেশ করিতেছিল। বিমল জানালা বন্ধ করিয়া দিল—ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল, সম্পূর্ণ অন্ধকার এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ—কেবল বাহিরে তখন ঝড়ে জলে, শিলাতে বিদ্যুতে, মেঘে নদীতে তুমুল তাণ্ডব চলিয়াছে।

বিমল এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে প্রথমে কথা বলিতে পারিল না; একটু জিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওখানে কে?

নিজের স্বরে সে নিজেই চমকিয়া উঠিল—ভয়ে, ঠাণ্ডায়, পরিশ্রমে তার স্বর কেমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

আবার জিজ্ঞাসা করিল—আবার। কেহ উত্তর দিল না।

তখন তার মনে পড়িল পকেটে দেশলাই আছে। দেশলাই বাহির করিয়া আলো জ্বালাইতে চেষ্টা করিল। জলে দেশলাই ভিজিয়া গিয়াছে আলো জ্বলিল না। অনেকগুলি কাঠি বৃথা নষ্ট করিয়া একটা জ্বলিল—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই লোকটা উঠিয়া আসিয়া ফুঁদিয়া আলো নিভাইয়া দিল—বিমল লোক চিনিতে পারিল না।

বিমলের সন্দেহ হইল চোর বা বদ্‌লোক হইতে পারে। সে আবার আলো জ্বালিল—এবার সাবধান হইয়াছিল যা'তে লোকটা আলো নিভাইতে না পারে। লোকটা আলো নিভাইবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছিল—আলো নিভাইয়া দিলও বটে—কিন্তু তার আগেই বিমল দেখিয়া ফেলিল—লোকটি ফুল্লরা!

বিমলের হাত কাঁপিয়া দেশলাই পড়িয়া গেল—ফুল্লরা কুড়াইয়া লইতে লইতে বলিল—আর যাতে আলো জ্বালতে না পারেন তাই ওটা আমার কাছে রইলো।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কি করে?

বিমল বরাবর তাকে আপনি বলে, কিন্তু হঠাৎ আজ আপনি বলিতে কেমন যেন বাধিল—অথচ তুমি বলিতেও সাহস হইল না—তাই সর্ব্বনাম পদ একেবারে বাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কি করে?

ফুল্লরা বলিল—আপনি যেভাবে এসেছেন।

বিমল বলিল—আমি তো বেড়াতে গিয়ে—

ফুল্লরা বলিল—আমিও তবে তাই।

বিমল শুধাইল—আমার ডাক কি ভিতর থেকে শোনা যায়নি?

—না।

—তবু ভাল। আমি ভাবলাম আমাকে দণ্ড দেবার জন্যই দরজা খোলা হয়নি।

ফুল্লরা না-বোঝা স্বরে শুধাইল—কিসের দণ্ড?

—দণ্ড আবার কিসের হয়?

ফুল্লরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি অপরাধ, কার কাছে অপরাধ—কে তার দণ্ড দেবে?

'আপনি', 'তুমি' কি বলিবে বিবেচনা করিতে করিতে হঠাৎ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—আমার ধারণা তুমি আমার উপরে রাগ করে আছ?

'তুমি' শুনিয়া ফুল্লরার অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল। সে স্বাভাবিক স্বরে বলিল—কেন?

—সেদিনের সেই ঘটনার পরে!

ফুল্লরা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—আপনার যেমন কাণ্ড! আমি তো ভাবছি আপনিই রাগ করে বসে আছেন, এর মধ্যে দেখাশুদ্ধ করলেন না।

বিমলের মন হইতে জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল—এই প্রলয়ে, ঝড়ের গর্জ্জন ছাপাইয়া ফুল্লরার ওই লঘু হাসিটি আকাশে থরে থরে পাঁপড়ি বিস্তার করিয়া কোন্ এক পারিজাতের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

তখন বিমলের দুঃখ হইল! বোকার মত নিজের মনে কত কি ভরিয়া জীবনের দুর্লভ কয়েকটা দিন সে নষ্ট করিয়াছে—আর সে সব দিন ফিরিবে না। জীবনের একটি প্রহরও আর বৃথা নষ্ট করিবে না সে স্থির করিল।

বিমল শুধাইল—ফুল্লরা তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তুমি বলিতে বিমলের আদৌ বাধিতেছিল না—বরঞ্চ এতদিন যে কি করিয়া আপনি বলিত তাহাই ভাবিয়া পাইল না।

ফুল্লরা বলিল—কঙ্কালীতলার মেলায়।

—কঙ্কালীতলার মেলায় কেন?

ফুল্লরা বলিল—আজ যে চৈত্রসংক্রান্তি।

বিমলের খেয়াল ছিল না।

সে বলিল—তা বটে! কিন্তু তারপরে বলিল—হঠাৎ সেখানে যেতে গেলে কেন?

ফুল্লরা বলিল—বাঃ রে হঠাৎ কিসের! বছরে একটা দিন মেলা বসে—দেখতে গিয়েছিলাম।

কিন্তু আসল কথা ফুল্লরার বলিবার উপায় ছিল না। গত বছর এই দিনে মেলাতে সে গিয়াছিল—তারপরের ঘটনা পাঠকের অবিদিত নাই। মিশ্‌কির দেওয়া সেই পাথরটা তার জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে নানা ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে, তার পরিণাম কি জানিতে স্বভাবতঃই ফুল্লরার ঔৎসুক্য হইবার কথা। মিশ্‌কির সঙ্গে আর একবার দেখা হয় কিনা ভাবিয়া সে এ বছরেও মেলাতে গিয়াছিল। মিশ্‌কির সঙ্গে দেখা হয় নাই।

বিমল শুধাইল—কিন্তু মেলা থেকে তো এপথে ফিরবার কথা নয়।

ফিরিবার কথা নয় সত্য। ফুল্লরা পরিচিত পথ এড়াইয়া চলিতেছিল—পাছে বিমলের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়, সে ভয়ও তার ছিল। কিন্তু এসব কথা তো বিমলকে বলা চলে না।

সে বলিল—আপনার বনলক্ষ্মীর সেই কুঞ্জটায় একবার যাবার ইচ্ছা ছিল—যদি একবার দেখা হয়—

—কার সঙ্গে ?

—বনলক্ষ্মীর সঙ্গে।

বিমল শুধাইল—কেন ?

—কেন কি ? যে কাঞ্চনফুলের গাছে আপেল ফলাতে পারে, তার দেখা পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা !

—তারপরে ?

ফুল্লরা বলিল—তারপরে আর কি ! হঠাৎ এল ঝড়, সঙ্গে বৃষ্টি—তাড়াতাড়ি এখানে এসে আশ্রয় নিলাম।....কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন ?

—বসবো কোথায় ?

ফুল্লরা বলিল—এই দেখুন না—আলো জ্বালুন।

বিমল আলো জ্বালিয়া দেখিল ঘরের মধ্যে একখানা পুরাতন চারপায়া আছে—ফুল্লরা তার উপরে বসিয়াছিল ; বিমল পাশে গিয়া বসিল ; দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলো নিভিয়া আবার অন্ধকার হইল।

তখন দুইজনে কথা বলিতে লাগিল—অত্যন্ত তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর সব কথা,—কোন পুস্তকের পত্রপুটে যাহা ধরিয়া রাখিবার মত নয়। সেই তুচ্ছ আলোচনার আড়ালে, দুইজনের অন্যমনস্কতার অবসরে কখন্ ফুল্লরার হাত বিমলের মুঠির মধ্যে বদ্ধ হইল ; কেহ জানিতে পারিল না—জানিতে পারিলেও কেহ স্বীকার করিল না। তারপরে এক সময়ে কখন্ কথার স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু নদীর উপরের জল কম বলিয়াই নীচের জল বেশী ; আবার উপরে যেখানে একেবারে শুষ্ক—নীচে সেখানে রসের স্রোত নিরন্তর সঞ্চরমান।

বাহিরে তখন প্রবলতর বর্ষণ চলিতেছে—প্রচণ্ডতর ঝড় ; শিলাপাত অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে।

নদীর গর্ভে পাথরে প্রহত জলে আর ঝড়ে বিষম মাতামাতি কাণ্ড চলিতেছে। ঝড় স্রোতস্বিনীকে সবলে নিষ্পেষণ করিয়া যেন মারিয়া ফেলিতে চায়, নদী তাহাতে ভীত না হইয়া অধিকতর উল্লাসে ঝড়কে সবেগে আকর্ষণ করিয়া ধরিতেছে; ঝড়ের পরুষ বাহু জলতলের স্বচ্ছ শাড়ীখানাকে টানিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতেছে—নদী প্রাণপণে তাহা নিরস্ত করিতে উদ্যত; ঝড়ের সাপটে জলাবরণ সরিয়া গিয়া এক একবার তলাকার সুগোল নিটোল মসৃণ প্রস্তরস্তূপ বাহির হইয়া পড়ে—নদী আবার তাহা জলাবরণে ঢাকিয়া দেয়; কখনো বা একবার বাতাস পড়িয়া আসে—যেন সে কতই ক্লান্ত; নদীর উত্তেজনা তাহাতে কমে না —সে তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বায়ুমণ্ডলকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার জন্য উত্তাল হইয়া ওঠে; আবার দম্‌কার পরে দম্‌কা বাতাস আসিয়া জলতলকে ছিন্নভিন্ন বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত করিয়া করিয়া মরীয়া হইয়া ওঠে; না ঝড়ের ক্ষান্তি, না নদীর ক্লান্তি!

অবশেষে ঝড় থামিল, নদী থামিল; মহাঝড় মৃদু বাতাসে পরিণত হইয়া নদীর প্রান্তে শুইয়া হাঁপাইতে লাগিল; নদী তরঙ্গ-দুকূল যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া শয্যাপ্রান্তে লীন হইয়া নিস্তেজে পড়িয়া রহিল; ঝড় ক্ষান্ত, নদী ক্লান্ত; দুজনেরই দেহে অবসাদ, মুখে তৃপ্তি।

ঝড় জল থামিয়া গেলে দরজা খুলিয়া বিমল ও ফুল্লরা বাহির হইল।

২৩

বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফুল্লরার সঙ্গে বিমলের বিবাহ হইয়া গেল।

মাস দুই পরে সুখে শান্তিতে পতিতপাবনবাবুর দেহান্ত ঘটিল।

একদিন নদীর ধারে গরুর খুঁটা পুঁতিতে আসিয়া হরিহর মুদির সঙ্গে সুরেশ পোদ্দারের দেখা হইল!

সুরেশ বলিল—হরিহর তুমি তো ভাই বরাবর রামায়ণ পড়ে থাকো—জানো তো—একা রামে রক্ষা নাই—সুগ্রীব তার মিতে।

হরিহর বলিল—অনেক কিছুই জানি! বুড়ো তো ভালই গেল—কেবল তোমার আর আমার কপালে আগুন দিয়ে গেল।

এই দুই বন্ধুর ললাটে অগ্নি সংযোগের কারণ আর কিছুই নয় বিমলের কাছে এঁদের কিছু ঋণ ছিল—আবার পতিতপাবনবাবুর কাছেও ছিল! এখন দুই ঋণ এই বিবাহের সূত্রে একঋণে পরিণত হইল। সাংসারিক বিষয়ে বিমল যেমনই হোক—ফুল্লরার মধ্যে যে পাকা গৃহিণীর সম্ভাবনা ছিল, ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ তারা পাইয়াছে; ফুল্লরা দু'একবার টাকার তাগিদ—মিতনের মারফতে করিয়াছে।

হরিহর খুঁটার উপরে সশব্দে গোটাদুই আঘাত করিয়া বলিল—বুঝ্‌লে পোদ্দার আমি বলে রাখছি ভাল হ'বে না!

কার অমঙ্গল আশঙ্কা না বুঝিতে পারিয়া সুরেশ শুধাইল—কার গো!

হরিহর খুঁটার সঙ্গে দড়ির প্যাঁচ কষিতে কষিতে বলিল—আবার কার!

সুরেশ তবু বুঝিল না ; কিংবা বুঝিলেও প্রকাশ করিল না।

হরিহর বলিল—এই বিয়ের গো—এই বিয়ের, ফল মঙ্গল নয়।

সুরেশ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—কেন দুই ঋণ এক হয়েছে বলে ?

হরিহর বিরক্ত হইয়া বলিল—তোমার তো সব কথাতেই হাসি ! তোমার কি—তুমি তো অনেক টাকার গড়ন গড়ালে—অনেক টাকা পেয়েছ—আরও পাবে !

সুরেশ বলিল—তোমারই কোন্ ক্ষতি হ'য়েছে। চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, মশলা তো কম বেচনি—এক টাকার জিনিষে দুই টাকা ঘরে তুলেছ। অনেক পেয়েছ—যা বাকী আছে তা-ও পাবে।

হরিহর এ কথায় একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল—পাবে না ছাই। এখন বলছে কি জানো—ওই ডাঙাপাড়ার মেয়েটা—বলছে—যা বাকী আছে তা দেনার মধ্যে কাটা পড়বে! এতে যে আমিই কাটা পড়লাম।

এমন সময়ে দড়িতে গোরু টান মারিল—হরিহরের হাতে লাগিল ; গোরুর দোষ নয়, শক্ত করিয়া দড়ি না বাঁধিলে এমনই হয়। কিন্তু এই আঘাতে ডাঙাপাড়ার মেয়ের দোষ পড়িল গিয়া গোরুর ঘাড়ে ; সে আচ্ছা করিয়া কয়েক ঘা গরুটার পিঠে বসাইয়া দিল !

সুরেশ বাধা দিয়া বলিল—আহা আহা কর কি ! কৃষ্ণের জীব !

—কৃষ্ণের জীব ! বলিয়া হরিহর রাগে ফুলিতে লাগিল।

সে বলিল—তোমার কি ভাই ! এখন বুঝতে পারছি ওই ভয়েই এক পয়সার জিনিষও বাকিতে ছাড়নি। সাধে পোদ্দার হয় দুদিনে বড়লোক—আর মুদীর নেংটি কখনও ঘোচে না।

সুরেশ বলিল—আমাদের যাই হোক এবারে দেখো গাঁয়ের উন্নতি হ'বে। একটা লোকের মত লোক গাঁয়ে এসে বস্‌লো।

—ছাই হবে। এতদিনে সবাই রাম রাজত্বি ক'রে খাচ্ছিলে—এবারে দেখো একটি পয়সা ছাড়বে না!

সুরেশ বলিল—কেন বিমল তো সে রকম ছেলে নয়।

হরিহর বলিল—বিমল নয় গো বিমল নয়, তার বউটি! বিয়ে হ'লে কি পুরুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে—তারপর যদি বউয়ের গায়ের চামড়া হয় শাদা।

এই অভিযোগে সুরেশের রাগিবার কথা। তার স্ত্রৈণ বলিয়া অখ্যাতি ছিল—এবং তার স্ত্রীর গায়ের রং—হরিহরের ভাষায়—গায়ের চামড়া শাদা। কিন্তু সুরেশ আজ কিছুতেই রাগিবে না স্থির করিয়াছে; রাগী লোক হয় রাগিয়া ওঠে, নয় অপরকে রাগায়; অপরকে রাগাইতে পারিলে আর নিজের রাগ করিবার দরকার হয় না—অন্যের মধ্যে নিজের রাগকে প্রত্যক্ষ করিয়া খুসী হয়।

হরিহর গ্রাম্যরাজনীতি বোঝাইতে লাগিল—এবারে হ'ল কি বুঝলে তো। তালবনী আর ডাঙাপাড়ার সম্পত্তি এক হল! ওরা এখন হল প্রধান। এখন তোমার আমার মত লোককে গলা টিপে মারবে!

সুরেশ বলিল—এমন মারায় লাভটা কি?

—লাভ কি? এই দেখনা বিয়েতে যে দু'পয়সা মুনাফা করেছিলাম' তা দেনা শোধের নামে গেল বেরিয়ে—

সুরেশ বলিল—এটাতে অন্যায়টা কি হ'ল;

—তা তুমি বুঝবে কি ক'রে! আমি যে ম'লাম।

সুরেশ বলিল—চুপ। ইসারায় দেখাইল—অদূরে মিতন আসিতেছে।

বিমলের সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিতনেরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে—আগে তাকে ভালবাসিলেই চলিত—এখন ভয় করিতে হয়।

দু'জনে বর্ত্তমান অবস্থায় যতটা হাসি টানিয়া আনা সম্ভব ওষ্ঠপ্রান্তে তাহা আনিয়া বলিল—কি গো মিতনদা—আসছ কোথা থেকে।

মিতন বলিল—হাঁগো মুদিমশাই দাদা হ'লাম আবার কবে থেকে!

সুরেশ বলিল—বরাবরই ছিলে। হাজার হোক বয়স তো হয়েছে—তার তো একটা মর্য্যাদা আছে।

মিতন হাসিয়া উঠিল। খুসী হইল! বলিল—বয়স কি কম হ'ল গো! তিন কুড়ি তিন!

সুরেশ খুসী করিবার জন্য বলিল—মোটে তিন কুড়ি তিন! তার অনেক বেশি!

তবে তাই!

—দু'দশ বছর এদিক ওদিক করিলে মিতনের যে ক্ষতি নাই তাহা বেশ বোঝা গেল!

হরিহর বলিল—গিয়েছিলে কোথায়?

—ডাঙাপাড়ায় বটে!

অধিক ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন সে মনে করিল না—কারণ তালবনীর কে তার নূতন পদবৃদ্ধির কথা না জানে!

মিতন আগে আগে—তারা পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল।

সুরেশ ভাবিতে লাগিল বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুযোগে কিরূপে নিজের উন্নতি করা যায়; হরিহর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল; মিতন ভাবিতেছিল—আগে সে পিছনে চলিত—এখন সে আগে আগে চলে। দাদাবাবু কি সামান্য লোক!

মিতন চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বুঝলে পোদ্দার মশাই—এখন আমি খুঁসীতে মরতে পারবো!

দুইজনে তাহাতে আপত্তি জানাইল।

মিতন চলিয়া গেলে হরিহর বলিল—বুঝলে পোদ্দার এ বিয়েতে আমি বলছি ভাল হ'বে না! গরীব লোকের অন্নমারা! ভগবান্ এ সহ্য করবেন না।

সুরেশ এসব ব্যাপার ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতী নয়—যতটা পারে নিজেই করে। সে বলিল—আচ্ছা সে সব হবে এখন চল!

হরিহর বলিল—চল, কিন্তু আমি অনেক কিছুই জানি!

সুরেশ শুধাইল—কি?

হরিহর কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া কি যেন বলিতে লাগিল—এইরূপে দুইজনে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

বিবাহের মাত্র তিন মাস পরেই ফুল্লরা বিমলের মধ্যে একদিন কথা কাটাকাটি হইয়া গেল।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সামান্য বলিয়াই গুরুত্ব অসামান্য। এত অল্প কারণে, অকারণেও বলা যাইতে পারে, দুজনের এমন মনোমালিন্য ঘটিতে পারে কে জানিত! তারা তো কখনো কল্পনাও করে নাই।

সেদিন সকালে বিমলের কাজের তাড়া ছিল; সে বলিল—ফুল্লরা আমার চাবির গোছা কোথায়?

ফুল্লরা বলিল—আমি তার কি জানি?

বিমল বলিল—তবে কি আমার চাবি আমি ব'য়ে বেড়াবো?

ফুল্লরা সংক্ষেপে উত্তর দিল—ক্ষতি কি?

বিমল বলিল—তোমার কাছেই তো দিয়েছিলাম!

—আমার মনে নেই।

—তা থাকবে কেন? চাবি হারানোই তোমার অভ্যাস! একবার চাবি হারিয়ে আমাকে বাঘের মুখে ফেলেছিলে।

ফুল্লরা যে চাবি হারায় নাই, লুকাইয়া রাখিয়াছিল সে কথা বিমলকে বলে নাই।

ফুল্লরা বলিল—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবার সময় নেই—আমার কাজ আছে, চললাম।

ফুল্লরা চলিয়া গেল।

একটু ঝগড়া করিতে পারিলে হয় তো বিমলের রাগ পড়িত। তার পরে যখন সে দেখিল, চাবি তার টেবিলের দেরাজের মধ্যেই আছে

তখন সব রাগ আরো বেশি করিয়া গিয়া পড়িল ফুল্লরার উপরে। সে অপ্রস্তুত হইয়া মনে মনে ফুল্লরাকে প্রতিপক্ষ খাড়া করিয়া ঝগড়ার জের টানিয়া চলিল। এ রকম ক্ষেত্রে যে কথাগুলি ফুল্লরা বলিতে পারিত সেইগুলি তার মুখে বসাইল, আর নিজে উত্তর ভাবিয়া ক্রমাগত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

সারাদিন ভাল করিয়া ফুল্লরার সঙ্গে কথা বলিল না। ফুল্লরার প্রশ্নের উত্তরে অভিধানের হ্রস্বতম শব্দগুলি প্রয়োগ করিল এবং বিকালবেলা একাকী নদীর ধারে বেড়াইতে গেল—এ পর্য্যন্ত সে কখনো একা বেড়াইতে যাইত না—সর্ব্বদা ফুল্লরাকে সঙ্গে লইত।

নদীর ধারে একটা গাছের তলে বসিয়া সে অন্যমনে কত কি ভাবিতেছিল। কখন্ যে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে তার খেয়াল ছিল না—হঠাৎ যখন তার তন্দ্রা ভাঙিল দেখিল ফুল্লরা পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

ফুল্লরা শুধাইল—আজ যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসনি!

ফুল্লরার কথায় কোন উত্তাপ ছিল না। কিছুক্ষণ আগে যে একটা কলহ হইয়া গিয়াছে তার কোন প্রমাণ ফুল্লরার প্রশ্নে ছিল না। বিমল বিস্মিত হইল।

বস্তুত রাগের কারণ ঝগড়ার মধ্যে ছিল না, ঘটিয়াছে ঝগড়ার পরে, মনে মনে তার জের টানাতে; ফুল্লরা তো আর মনে মনে ঝগড়া করে নাই!

বিমল বলিল—আমি ভাব্‌লাম তোমার কাজ আছে।

ফুল্লরা পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল—এই বুঝি! তুমি কি জানো না বিকেলে বেড়াতে যাবার জন্যে সব কাজ আমি আগে সেরে রাখি।

ফুল্লরার কথায় তার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল—কিন্তু মুখে সে কিছু বলিতে পারিল না—কেবল তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। কোন পক্ষের আর কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না।

২

তারপর আরও তিন মাস চলিয়া গিয়াছে।

সেদিনকার ঘটনা ব্যাধি নয়, ব্যাধির লক্ষণ মাত্র—এই সত্যটি যেন এতদিনে ধীরে ধীরে বিমল বুঝিতে পারিতেছে। সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই, কারণ নিজের মন নিজের অত্যন্ত কাছে বলিয়াই মানুষ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু তার মনে যে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন চলিতেছে ইহা তার কাছে অগোচর ছিল না! আগে ফুল্লরাকে একা পাইতে তার ইচ্ছা করিত, এখন একা পাইলে বিব্রত বোধ করে। কি কথা বলিবে? আগে কথার অন্ত ছিল না। কাজের কথার দু'চার মুহূর্ত্ত পরেই শেষ হইয়া যায়—এখন বোকার মত বসিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। ফুল্লরার দিক্ হইতে কথা চলে, কিন্তু বিমল 'হাঁ' এবং 'না' র দ্বারা কতক্ষণ চালাইবে—অবশেষে সে উঠিয়া যায়।

আগে ফুল্লরাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে না গেলে চরাচর তার কাছে শূন্য বলিয়া বোধ হইত; এখন ফুল্লরা সঙ্গে থাকিলেই চরাচর কেমন নিঃসঙ্গ মনে হয়। বাড়ীতে যে সে অসুখী এমন নয়—কিন্তু সবচেয়ে সে সুখানুভব করে তখন যখন একাকী কোপাইর নির্জ্জন কোন বাঁকে সে আপন মনে বসিয়া থাকে—এমন করিয়া দিনেরাতে তার ঘণ্টার পরে ঘণ্টা কাটিয়াছে।

ফুল্লরা তাকে ভালবাসে! বিবাহের আগে যত বাসিত—তার চেয়েও বেশী; প্রতিদিন ফুল্লরার ভালবাসা গভীরতর হইতেছে; ভালবাসার সঙ্গে দায়িত্ব মিশাইয়া ফুল্লরার ভালবাসা নূতন মাধুর্য্যলাভ করিয়াছে।

কিন্তু বিমলের দিকের কথা কি! বিমল তাকে ভালবাসিত—এখনও বাসে; আগের চেয়ে বেশী নয়!

বিবাহের পরে মেয়েদের ভালবাসা বাড়ে, পুরুষের কমিতে থাকে। সব সময়ে এটা বোঝা যায় না—পুত্রকন্যা, সাংসারিক বিবেচনা প্রভৃতি দম্পতীর অবস্থাকে এমন জটিল করিয়া তোলে যে নিছক ভালবাসার রূপটি আর চোখে পড়ে না।

বিমলের মনে মাঝে মাঝে সন্দেহের বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়—তবে কি সে ভুল করিয়াছে? তবে কি সে ফুল্লরাকে ভালবাসিত না? কিন্তু অমনি তার মন বলিয়া ওঠে, না, না, ফুল্লরাকে ভালবাসি। সত্যই কি সে ভালবাসে? না, যে-ভুল সে করিয়া বসিয়াছে তার অহমিকা তাহা স্বীকার করিতে দেয় না। গলা-জ্বলিয়া-যাওয়া হলাহলকে অমৃত বলিয়া একি আনন্দের ভান? পুরুষের পক্ষে ভাল না বাসা তেমন কঠিন নয়, ভালবাসার দাবী ত্যাগ করাই কঠিন; মেয়েরা ভাল না বাসিয়া পারে না—দরকার হইলে তার দাবী ত্যাগ করিতে পারে; এই জন্য পুরুষে জানিয়া শুনিয়াও অসাধ্বী পত্নীকে সব সময়ে বর্জ্জন করিতে পারে না। ভালবাসা পুরুষের চরিত্রের একটা গুণমাত্র—অনেক গুণের অন্যতম; ভালবাসা নারীর প্রকৃতি।

বিমলের এই পরিবর্ত্তন ফুল্লরার চোখ এড়ায় নাই!

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ফুল্লরা শুধাইল—তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না কেন?

বিমল বলিল—বলি বই কি!

ফুল্লরা বলিল—ওই তো তোমার এক উত্তর।

বিমল বলিল—সব সময়েই তো বলছি।

ফুল্লরা বলিল—বল বটে, কাজের কথা। তুমি আমাকে ভালবাস না।

বিমল বলিল—এ তোমার ভুল। খুব ভালবাসি।

ফুল্লরা বুঝিল তার কথাতে আগের সুর তেমন করিয়া লাগিল না। এ উক্তির মধ্যে আবেগ নাই—বড় জোর সহৃদয়তার ভাব আছে।

ফুল্লরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমাকে বিয়ে করে' তুমি বোধ হয় ভুল করেছ।

বিমল শুধাইল—কেন?

—কেন কি? আমি অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে, তুমি শিক্ষিত, সারাজীবন সহরে মানুষ, আমি তোমার মনের মত নই।

বিমল বলিল—এ তোমার ভুল, ফুল্ল।

ফুল্লরা বলিল—একটু জোরের সঙ্গেই বলিল—না, না, ভুল নয়। ভুল করেছ—এখন তার জন্য তোমার অনুতাপ হচ্ছে। আমি কি করতে পারি বল?

বিমলের মন নাড়া খাইয়া উঠিল—সে ফুল্লরাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—ফুল্ল, কেন তুমি এমন ভাব? তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে?

ফুল্লরা বিমলের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল—তুমি আমাকে তোমার মত করে' গড়ে নাও। তুমি যেমন গড়বে আমি তেমনি হ'ব।

বিমল কিছু বলিল না—কেবল তাকে দৃঢ়তর বাহুপাশে বাঁধিয়া লইল।

অনেক রাত্রে বিমলের ঘুম ভাঙিলে দেখিল ফুল্লরা নিদ্রিত; তার মুখের উপরে চন্দ্রমল্লিকার একটি পাঁপড়ির মত একটুখানি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে; নিমীলিত চোখে নির্ভরতার ছাপ। বিমল দেখিল, তার হাতের মুঠাতে দুটি বেলফুল। বোধ করি বিমলকে দিবার জন্য আনিয়াছিল, অভিমানের জন্য দিতে পারে নাই। সে ধীরে ধীরে তার

আঙুলগুলি খুলিয়া ফুলদুটি লইয়া চুম্বন করিল—তারপরে নিদ্রিতার কপোলে আর একটি চুম্বন রাখিয়া দিল।

বিমল ভাবিতে লাগিল তার নিজের একি পরিবর্ত্তন! তার মুখে অজস্র কথা ফুলের অনায়াসপ্রগল্‌ভতায় হাজারে হাজারে ফুটিয়া ওঠে, তবে কেন সে ফুল্লরার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে না? এই তো সেদিনও বিবাহের আগে কত কথা সে তার সঙ্গে বলিয়াছে! আজ হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন কেন? সে স্থির করিল কাল হইতে ফুল্লরার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিবে।

পরদিন সকালের দিকে ফুল্লরা রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছিল; বিমল পা টিপিয়া গিয়া পিছন হইতে তার চোখ টিপিয়া ধরিল।

ফুল্লরার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল—বিমলের স্পর্শে তেমন নয়, যেমন তার এই অপ্রত্যাশিত সহজ ব্যবহারে।

ফুল্লরা বলিল—ছাড়ুন মশাই, লাগ্‌ছে।

বিমল চোখ ছাড়িল না। ফুল্লরা খানিকটা হলুদের গুঁড়া হাতে লইয়া বিমলের গালে মাখাইয়া দিল। বিমল চোখ ছাড়িয়া দিয়া নিজের গাল ফুল্লরার গালের সঙ্গে ঘসিয়া হলুদের গুঁড়া লাগাইয়া দিল।

—কেমন হ'ল তো।

ফুল্লরা বলিল—আমার গালে হলুদের গুঁড়ায় লোকে অবাক্ হ'বে না —রাঁধ্‌তে গেলে অমন হয়ই। তোমার গালেই ওটা অস্বাভাবিক!

বিমল শুধাইল—তবে আমাদের গালে স্বাভাবিক কি?

ফুল্লরা হাসিয়া বলিল—কালী। লেখাপড়া নিয়ে থাকো কি না।

দুইজনে হাসিয়া উঠিল।

ফুল্লরা রাঁধিতে লাগিল—বিমল পাশে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল—মাছ ভাজা চাহিয়া লইয়া খাইল। ফুল্লরার মুখে সে একবার মাছ ভাজা

দিতে গেল—ফুল্লরা মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ রান্না করতে করতে কি খায় ?

বিমল—তবে আমি রান্না দেখ্‌তে দেখ্‌তে খাই।

এমন দিন যে আসিবে ফুল্লরা সে আশা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিল।

বিকালবেলা তারা একসঙ্গে কোপাই নদীর ধারে বেড়াইতে গেল।

ফুল্লরা বলিল—কোপাই নদীকে আমি সহ্য করতে পারি না।

বিমল বলিল—কেন ?

ফুল্লরা হাসিয়া বলিল—ও যেন আমার সতীন। আমার মনে হয় কি জানো—এই নদীই তোমাকে ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—

বিমল বলিল—তুমি পাগল হ'লে দেখ্‌ছি।

একটা বড় পলাশ গাছের তলে দুইজনে বসিল ; বিমল নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহিল—ফুল্লরা বিমলের চাহনির দিকে চাহিয়া রহিল।

এমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে ফুল্লরা কথা বলিতে গেল—কিন্তু তেমন করিয়া আর কথা জমিল না ; বিমল চেষ্টা করিয়াও আর কথা খুঁজিয়া পাইল না। বিমল অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল—ক্রমে ক্রমে এই অস্বাভাবিকতাই তার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ছায়াহীন দম্পতী বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

৩

বিমল স্থির করিল মনের সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করিয়া লইতে হইবে—এভাবে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিলে কোন্ পরিণামের মধ্যে সে গিয়া পড়িবে তার নিশ্চয়তা নাই। সাংসারিক কাজে নিজেকে জড়াইয় ফেলিবার জন্য সে উদ্যত হইল। সুযোগও শীঘ্র আসিল।

অগ্রাণ মাসে ধানকাটা সুরু হইয়াছে। তালবনী হইতে তিন চা মাইল দূরে আদিত্যপুরে বিমলের ধানের জমি ছিল। সেখান হইতে ধান আনিয়া বাড়ীর উঠানে স্তূপীকৃত হইত; মিতন মাঝে মাঝে গিয়া ধানকাটার তদারক করিয়া আসিত। বিমল ঠিক করিল এবার সে নিজে গিয়া ধানকাটার তদারক করিবে; কাজের দিক হইতে তেমন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তার নিজের দিক হইতে প্রয়োজন।

মিতন বিমলের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল—মিতন কি মরে গেঁইছে দাদাবাবু।

বিমল বলিল, মরবি কেনরে? নিজের কাজ নিজে দেখ্‌বো না।

মিতন বলিল—দেখ্‌বে বই কি।

ফুল্লরা বাধা দিল না—ভাবিল হয়তো বিমলের ইহাতে ভাল হইবে।

বিমল সকালবেলায় কিছু আহার করিয়া রওনা হইয়া যাইত—সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া, মজুরদের সঙ্গে আলাপ করিয়া, কাটাধানের গাড়ী বাড়ীর দিকে রওনা করিয়া দিয়া সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া আসিত।

সারাদিনের দীর্ঘ অবসর ফুল্লরা নানা কাজে ভরিয়া তুলিত। বিমলের বাড়ী বহুকাল পড়িয়াছিল, লোকজন কেহ ছিল না, কাজেই অনেক ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছিল; ফুল্লরা মজুর লাগাইয়া মেরামত সুরু করিয়া

দিল; বাগানে নূতন করিয়া গাছ লাগাইল; পুরাতন গাছ কাটিয়া ফেলিল; একদিকে বিলিতি ফুলের বীজ বপন করিয়া দিল; রান্নাঘরের পাশে শাকসব্জির গাছ পুঁতিয়া দিল; বাগানে নূতন বেড়া দিল।

বিমল প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিত ফুল্লরা নূতন কিছু করিয়া বসিয়াছে—বিমলের ভালই লাগিত।

শীতের সন্ধ্যায় দুইজনে বসিয়া সেদিন কে কি করিয়াছে আলোচনা করিত। ফুল্লরা অনর্গল বকিয়া যাইত—বিমলের কথার অভাব হইত না।

ফুল্লরা বলিত—আমি যদি বেশি খরচ করে' ফেলি তবে তুমি সাবধান করে' দিও।

বিমল বলিত—ঠিক এর উল্টো ব্যবহার হওয়া দরকার। আমি বেশি খরচ করলে তুমি নিষেধ ক'রো।

ফুল্লরা হাসিয়া বলিত—তুমি তো টাকা পয়সায় হাতই দাওনা—খরচ আবার করবে কি করে'?

—তার মানেই আমি টাকা পয়সার দায়িত্ব নিতে রাজি নই!

ফুল্লরা বলিত—সে কি, পয়সা তো তোমার!

বিমল বলিত—সেই জন্যই তো ভয় পাছে কম পড়ে!

—কম পড়বে কেন? আমাদের কি আর এমন অভাব!

বিমল বলিত—অভাব যে নেই তা বুঝ্‌তে পারছি তোমাকে বিয়ে করবার পরে। আগে যখন একলা ছিলাম, আমার কিছুতেই কুলোত না—তোমার হাতে পড়ে আমার পয়সা বেড়ে গেছে।

ফুল্লরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কথাটা যদিও ঠাট্টা করিয়া বলা—কিন্তু তীব্রতম ঠাট্টা, তুচ্ছতম কথা হইতেও মানুষের মন প্রয়োজনীয় অংশ টানিয়া লইতে পারে।

ফুল্লরা একদিন সন্ধ্যায় বলিল—দেখ, পুরানো হিসাবের খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখলাম বহুকাল আগে হরিহর মুদিকে কিছু টাকা ধার দিয়ে ছিলেন!

বিমল বলিল—আমিও তাই শুনেছি।

ফুল্লরা বলিল—কিন্তু মুদি টাকাটা শোধ দেয়নি, দিলে নিশ্চয় তার উল্লেখ থাক্‌তো।

বিমল বলিল—তবে এক কাজ ক'রো কাল হরিহরকে একবার খবর দিয়ে পাঠাও।

একদিন সন্ধ্যা বেলা বিমল কয়েকটা পদ্মফুল হাতে করিয়া ফিরিল।

সে বলিল—ফুল্লরা দেখ অকালের পদ্ম।

ফুল্লরা বিস্মিত হইয়া বলিল—সে কি এখন শীতের দিনে পদ্ম পেলে কোথায়?

বিমল বলিল—আদিত্যপুরে গোটাকয়েক পুকুর আছে—একটাতে দেখি এই চারটে ফুল ফুটে আছে। একটা লোককে দু'আনা পয়সা স্বীকার করে' নামিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম। নাও।

এই বলিয়া সে পদ্ম কয়টি তার খোঁপায় গুজিয়া দিল।

বিমল সারাদিন ধানক্ষেতের পাশে একটি শিরিষ গাছের ছায়ায় বসিয়া থাকে। শীতের রোদ পিঠে পড়ে—সম্মুখের আকাশজোড়া খোলা মাঠে মনটা অশ্বমেধের ঘোড়ার মত ছুটিয়া বেড়ায়—কেহ বাধা দিতে পারে না। দিগন্ত হইতে দৃষ্টি কাছে ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পায় চার পাঁচ জন মজুর সারিবন্দি হইয়া বসিয়া কাস্তে দিয়া পাকা ফসল কাটিয়া যাইতেছে। তীক্ষ্ণ কাটারির ঘায়ে মুষ্টিবদ্ধ ফসলের গাছ তালে তালে ছিন্ন হইয়া মাটিতে রক্ষিত হইতেছে—মজুরের দল আগাইয়া যাইতেছে—পিছনে ঈষৎ বক্র রেখায় সারি সারি ফসলের গুচ্ছ শায়িত, কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত

ক্ষেতটা কাটা ফসলের বক্র সারিতে থাকে-থাকে ভরিয়া ওঠে। শীতের রোদ, শীতল হাওয়া আর পাকা ধানের সুবাস সব মিলিয়া কেমন যেন জাদুমন্ত্র পড়িয়া দেয়—বিমল মূঢ়ের মত বসিয়া থাকে।

এই কয়দিনে বিমল আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছে—বিবাহের পরে ফুল্লরার প্রতি তার যে একটা বীতস্পৃহ ভাব আসিয়াছিল—সেটা কাটিয়া গিয়াছে; সংসারের মধ্যে যখন সে অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল তখন তার স্বরূপ যেন প্রাত্যহিক ঘনিষ্ঠতার চাপে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন আবার একটু দূরে আসিয়া দাঁড়াইতেই ফুল্লরা অবিকৃতস্বরূপে অব্যাহত অবসরের পরিপূর্ণ পদ্মের উপরে আপন স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল। বাসনার সোনার কলসীর মুখ খুলিয়া দিতেই সেই ছায়াময়ী এই আকাশজোড়া মূর্ত্তি ধরিল। এত বড়কে কি এত ছোট সংসারে ধরে!

সে সারাদিন বসিয়া বসিয়া নিজের মন মত করিয়া ফুল্লরাকে গড়িত; পছন্দ না হইলে ভাঙ্গিয়া গড়িত; ঘরের ফুল্লরা স্বীয় ব্যক্তিরূপে দৃঢ়নিবদ্ধ—তাকে ছুঁইবার উপায় নাই; মনের ফুল্লরা ছায়াময়ী—প্রতিদিন তাকে নূতন করিয়া গড়া যায়।

ফুল্লরা সংসারের কাজে নূতন করিয়া রস পাইল। যে-সব কাজের সঙ্গে বিমলের অনুমাত্রও যোগ আছে—তার কাছে সে সব নূতন মাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া দেখা দিল; যে-সব কাজের সঙ্গে বিমলের কোন যোগ নাই, সে সব কাজে তার কোন উৎসাহ ছিল না।

বিমল লিচু ভালবাসিত, ফুল্লরা বাগানের লিচুর গাছ দুটিকে সবচেয়ে বেশি যত্ন করিত। বিমল সীম ভালবাসিত, সজ্জিবাগের সীমের মাচাটির প্রতি তার যত্নের সীমা ছিল না। বিমলের পড়িবার ঘরটি সে মন্দিরের মত পবিত্র পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত।

একদিন সন্ধ্যায় বিমল ফিরিয়া আসিলে ফুল্লরা বলিল—আজ দুপুরে হরিহর এসেছিল।

বিমল হরিহরকে তাগিদ দিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল; সে শুধাইল—কেন?

—কেন কি? সে যে টাকা নিয়েছিল।

বিমল বলিল—তা বটে! হরিহর কি বল্‌ল!

ফুল্লরা বলিল—অমন ভালমানুষ খুব কম দেখা যায়। এর আগে আমি তাকে দেখেছি বটে, কিন্তু পরিচয় ছিল না। আজ অনেক কথা হ'ল—বেচারা বড় দুঃখে পড়েছে।

বিমল বলিল—টাকার কথা কিছু বল্‌ল?

—বল্‌ল বই কি? মাঘ মাসে ওর ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে হ'বে। বরও একটি স্থির করেছে এখনও টাকার জোগাড় করে' উঠতে পারেনি।

বিমল সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়িবার সময় পায় না। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া পড়ে। সে খবরের কাগজে চোখ বুলাইতে বুলাইতে বলিল—কিন্তু আমাদের টাকা কবে দেবে?

ফুল্লরা বিরক্ত হইয়া বলিল—টাকা এখন কি করে' দেবে? আর এই অবস্থাতে আমরাই বা কি করে টাকা চাই?

তারপরে একটু থামিয়া আবার বলিল—তোমার প্রশংসা ওর মুখে ধরে না। সারাক্ষণ কেবল তোমার কথাই বল্‌ল! আমি দু'একবার টাকার কথা তুলেছিলাম, কিন্তু তোমার কথায় এমন মশ্‌গুল হ'য়েছিল যে সে কথা তার কানেই গেল না।

তারপর হাসিয়া বলিল—তোমাকে যে দেখেছে তার কি টাকার কথা মনে থাকে!

বিমল হাসিয়া ফেলিল—বলিল—হরিহর যে শুধু ভালমানুষ তা নয় খুব বুদ্ধিমানও বটে!

কথাটা প্রশংসা না নিন্দা বুঝিতে না পারিয়া ফুল্লরা বলিল—বুদ্ধিমান্! বুদ্ধিমান হ'লে ওকে সবাই অমন করে ঠকায়!

হরিহর ঠকিয়াছে শুনিয়া বিমল চমকিয়া উঠিল—শুধাইল—ওকে ঠকালো কে?

—কে, না ঠকিয়েছে? গ্রামশুদ্ধ সবাই ঠকাচ্ছে।

বিমল হাসিয়া বলিল—ফুল্লরা, ওর দোকান থেকে ধারে জিনিষ নেওয়াকে যদি ঠকানো ব'ল তবে অনেকেই ঠকাচ্ছে। কিন্তু মুদিও তো তেমনি আবার মহাজনের কাছে থেকে ধারে জিনিষ আনছে। তুমি হরিহরকে চেনো না, আমি চিনি।

—কি করে' চিন্‌বে?

—অনেক দিন ধরে' দেখ্‌ছি।

ফুল্লরা রাগিয়া উঠিয়া বলিল—অনেকদিন ধরে' দেখলেই কি চেনা যায়?

বিমল বলিল—অনেক দিন ধরে' দেখ্‌লে যদি চেনা না যায়—তবে প্রথম দিনের আলাপে চিনবার মোটেই সম্ভাবনা নেই।

ফুল্লরা দেখিল তর্কের মধ্যে গেলেই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

সে সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার স্বরে বলিল আমি বলছি ও ভালমানুষ।

বিমল বলিল—বেশ স্বীকার করে নিলাম।

তাপপরে একটু খোঁচা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল—কিন্তু টাকা আদায়ের কি হ'ল?

—এখন টাকা কি করে' দেবে? আর এখন তো আমাদের টাকার তেমন দরকার নেই।

বিমল বলিল—তুমিই টাকার কথা তুলেছিলে, আবার তুমিই যখন বলছ দরকার নেই! ভাল।

ফুল্লরা যে আর এ বিষয়ে তর্ক চালাইতে চায় না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল। বিমল বসিয়া বসিয়া খবরের কাগজখানাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বারংবার পড়িতে লাগিল—যেন একটা ছত্র বাদ গেলেও মহা অনর্থ হইবে।

৪

বিমল বলিল—ফুলু, কাঁচবাংলার মেলায় যাবে?

ফুল্লরা খুসী হইয়া উঠিল, বলিল, নিশ্চয় যাবো। কি উপলক্ষ্যে মেলা সে জানিত না, শুধাইল, কিসের মেলা?

বিমল বলিল, পৌষমাসে ওদের উৎসব হয়, মস্ত মেলা বসে।

বিকালবেলায় তারা কাঁচবাংলায় পৌঁছিয়া দেখিল, উত্তর দিকের বিস্তৃত মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়াছে। লালরঙের শড়কের দু'ধারে সারি সারি দোকান; মনিহারি দোকান, কাপড়ের দোকান, বাসনের দোকান, খেলনার দোকান, আর একদিকে খাবারের দোকান;—সন্দেশ রসগোল্লা, তেলেভাজা, ঘিয়ে ভাজা, এমন কি শিউড়ি হইতে দু'তিনখানা আচার-মোরব্বার দোকান পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

হঠাৎ ফুল্লরা চীৎকার করিয়া উঠিল, দেখ, দেখ কত বড় বাতাসা!

বিমল দেখিল, সত্যই একটা দোকানে গোরুর গাড়ীর চাকার মত প্রকাণ্ড একখানা বাতাসা দাঁড় করানো রহিয়াছে।

তারা অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল—এক জায়গায় উঁচু মাচাবাঁধা হইয়াছে—সেখানে রসুন-চৌকির বাজনা বাজিতেছে!

আরও একটু অগ্রসর হইয়া তারা দেখিল যে একস্থানে শামিয়ানা খাটাইয়া যাত্রাগান হইতেছে; নীলকণ্ঠ মুখুয্যের কংসবধের পালা। এক দিকে মেয়েরা বসিয়াছে, তিন দিকে পুরুষেরা—যারা বসিতে জায়গা পায় নাই—তারা পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। ফুল্লরা মেয়েদের মধ্যে গিয়া বসিল; বিমল পুরুষদের আসরে গিয়া বসিল।

ফুল্লরার পাশে একটি মেয়ে বসিয়াছিল, প্রায় তার সমবয়সী, কিছু

ছোট হইবে। মেয়েটি যেমন চঞ্চল তেমনি আলাপী; সে কিছুক্ষণে মধ্যেই ফুল্লরার সঙ্গে আলাপ জমাইয়া লইল। মেয়েটির কথা হইতে ফুল্লরা জানিতে পারিল যে তার নাম তপতী, এবারে সে ম্যাট্রিকুলেশ পরীক্ষা দিবে; তার বাড়ী আসামে; প্রায় ছয় সাত বছর সে এখানে আছে। বাধ্য হইয়া ফুল্লরাকে আত্মপরিচয় দিতে হইল।

তপতী বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—আপনার বাড়ী তালবনীতে; আমি ভেবেছিলাম আপনি কল্‌কাতা থেকে আসছেন।

ফুল্লরা বলিল—তালবনী শুনে চমকে উঠ্‌লেন কেন?

তপতী বলিল—আমার ধারণা তালবনীতে কেবল সাঁওতালেরাই থাকে।

তার কথা শুনিয়া ফুল্লরা হাসিয়া উঠিল।

তপতী শুধাইল—আপনি কার সঙ্গে এসেছেন?

ফুল্লরা বলিল—আমার স্বামীর সঙ্গে।

তপতী শুধাইল—কোথায় তিনি?

ফুল্লরা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

বিমলকে দেখিয়া তপতী আবার বলিল—তালবনীতে যে ভদ্রলোক থাকে তা জানতাম না।

ফুল্লরা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কখনো ওদিকে আপনি গিয়েছেন?

তপতী বলিল—তালবনীতে ঠিক যাইনি, তবে ওই পথে কোপাই নদীর ধারে বনভোজন করতে গিয়েছি।

—সেখানে কি ভদ্রলোক দেখেননি?

তপতী বলিল—না, কেবল সাঁওতাল আর ছোটলোক।—এর আগে কখনো আপনি এখানে এসেছেন?

ফুল্লরা বলিল—অনেকদিন আগে একদিন বেড়াতে এসেছিলাম।

—ওঃ তবে তো আপনি কিছুই দেখেননি। চলুন আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আমার সঙ্গে গেলে আপনার স্বামী কি আপত্তি করবেন ?

ফুল্লরা বলিল—আপত্তি করবেন কেন ?

তারা দুইজনে উঠিয়া পড়িল। ফুল্লরা বিমলকে বলিল—যে এর সঙ্গে আমি গেলাম—তুমি ভেবোনা।

তপতী বলিল—আপনি মন্দিরের কাছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন, সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরে আসবো।

তপতী ফুল্লরাকে লইয়া জনপদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কোন্‌টা লাইব্রেরী, কোন্‌টা রান্নাঘর চিনাইয়া দিল। ছাত্রদের বাসগৃহগুলি দেখাইল। একটা ঘর দেখাইয়া বলিল—এখানে নাটক হয়। আজ তাতে নাটক হবে, থাকবেন ?

ফুল্লরা বলিল—ওঁকে জিজ্ঞেস না করে' বলতে পারিনে।

তারপরে আরও অগ্রসর হইয়া মেয়েদের থাকিবার বাড়ী, হাঁসপাতাল দেখাইল। দূর হইতে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল, দক্ষিণের ওই বাড়ীগুলোতে শিক্ষকেরা থাকেন।

তপতী ফুল্লরাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল ; তাকে বসাইয়া থালাতে করিয়া মিষ্টি ও কমলালেবু আনিল। বলিল—খেয়ে নিন্ অনেক ঘুরেছেন।

ফুল্লরা বলিল—সে কি কথা। এই তো কেবল খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।

তপতী বলিল—তাহলেও খাওয়া দরকার—ফিরতে অনেক রাত হ'বে।

ফুল্লরা ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া তপতী বলিল—সে জন্য ভাববেন না, বিমলবাবুর জন্য অনেকগুলো কমলালেবু নিয়ে যাবো।

ফুল্লরা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—না, না, তা ভাবিনি।

তপতী বলিল—তবে খেয়ে নিন্।

তখন দুইজনে বসিয়া মিষ্টি ও কমলালেবু খাইল। খাওয়া শেষ হইলে কয়টা কমলালেবু লইয়া তপতী বলিল—চলুন এবার। বিমলবাবু না জানি কত কি ভাবছেন।

তারা মন্দিরের কাছে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কাঁচের উপাসনা মন্দিরের পাঁচটা ঝাড়ে প্রায় শ'দেড়েক মোমবাতি জ্বলিয়া উঠিয়া নানা বর্ণের কাঁচে প্রতিফলিত হইয়া নানাবর্ণের আলোক নিক্ষেপ করিতেছে। দরজার কাছে বিমল দাঁড়াইয়াছিল।

তপতী বলিল—বিমলবাবু, এই দেখুন ফুল্লরাদিকে ঠিক সময়ে ফিরিয়ে এনেছি। আর এই নিন আপনি—

এই বলিয়া সে আট দশটা কমলালেবু আঁচল হইতে বাহির করিয়া বিমলকে দিল। বিমল বলিল—কি সর্ব্বনাশ এত লেবু নিয়ে কি করবো?

—কি আর করবেন? খাবেন।

বিমল হাসিয়া বলিল—তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম বুঝি ব্যবসা করতে হ'বে।

ফুল্লরা বলিল—ওঁর ওই রকম! আমাকে জোর ক'রে অনেক খাইয়েছেন।

সন্ধ্যাবেলাতে মেলা আরও জমিয়া উঠিল। চারিদিকে এখানে-সেখানে শত শত বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিল; জনতা বাড়িল—জনতার কোলাহল বাড়িল।

তারপরে মন্দিরের মধ্যে সংস্কৃতমন্ত্র পাঠ করিয়া উপাসনা আরম্ভ হইল; মাঝে মাঝে বাংলা গান হইতে লাগিল। আলোতে, ফুলেতে, মালাতে ঈষৎশুষ্ক দেবদারুপাতার মৃদু গন্ধে, বিচিত্র কোলাহলে, নানা রকম লোকের আনাগোনায় এবং ক্রমবর্দ্ধমান শীতের প্রভাবে—সবশুদ্ধ মিলিয়া প্রকাণ্ড জনপদ এক অলৌকিক রূপ ধারণ করিল।

মেলা সবচেয়ে জমিয়া উঠিল যখন আতসবাজি পোড়াইবার সময় আসিল। রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া তপতী চলিয়া গিয়াছিল। ফুল্লরা ও বিমল পুকুরপাড়ের একটি তালগাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

প্রথমে নানাবর্ণের রকেট ছোঁড়া হইতে লাগিল। হু হু শব্দে সর্পিল অগ্নিরেখা আকাশের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া চিত্রবর্ণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ভাঙিয়া মাটিতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে।

তারপরে তুবড়িতে আগুন দেওয়া হইল। ক্ষণস্থায়ী আগুনের ফোয়ারার অভিনয় করিয়া তুবড়িগুলা নিঃশেষ হইয়া গেল।

তখন হাউই-য়ে আগুন দেওয়া হইল। দীপবাহী কাগজের গোলক বায়ুতরঙ্গহীন আকাশে উঠিতেই লাগিল—আরও, আরও, আরও উঁচুতে; শেষে নক্ষত্রের সঙ্গে আর ভেদ বুঝিবার উপায় রহিল না। ওই একটা কাৎ হইয়া পড়িয়া আগুন ধরিয়া গেল।

একদিকে একটা অগ্নিগোলক সোজা অনেক উঁচুতে উঠিয়া গিয়া সশব্দে ফাটিয়া গেল—আর সেই বিস্ফোরণের স্থান হইতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাণী আকাশে বিস্তারিত হইয়া গেল।

সবশেষের বাজিটাই সবচেয়ে জমকালো। মাঠের মধ্যে একস্থানে কাগজের একটা কেল্লার মত তৈরী করা হইয়াছিল—আর তার অদূরে একটা কাগজের বড় জাহাজ। যুগপৎ এই জাহাজ ও কেল্লায় আগুন

ধরাইয়া দেওয়া হইল। তখন জাহাজ ও কেল্লার মধ্যে অগ্নিগোল বিনিময় চলিতে লাগিল। জনতা চীৎকার করিয়া দাহ্যমান নির্জ্জীব এ যোদ্ধাদ্বয়কে উৎসাহ দিতে লাগিল।

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল—আর বার জাহাজ জিতেছিল এবারে কেল্লার জিতবার পালা।

আর একজন কে যেন তার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না এবারে জাহাজ জিতবে।

তৃতীয় একজন বলিয়া উঠিল—তর্ক না করে' চেয়ে দেখনা কে জিতছে।

জাহাজ ও কেল্লা পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল, বিমল ফুল্লরা বুঝিতে পারিল না—কার জয় হইল! কিন্তু জনতার মধ্যে একদল জাহাজের, অন্যদল কেল্লার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল, তাহাদের কাছে সবই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ!

ফুল্লরা ভাবিল—বোধকরি জনতার চোখই স্বতন্ত্র রকমের!

* * * *

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া বিমল ও ফুল্লরা বাড়ী রওনা হইল। কিছুদূর যাইতেই জনতার পরিবেশ ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িল। মাঠ শূন্য এবং অন্ধকার; কেবল রৌদ্রে শুষ্ক তৃণের উপরে রাত্রের শিশির পড়িয়া একটি মৃদুসিক্ত উদ্ভিজ্জ সুবাস উঠিতেছে।

সেই যে একদিন বিমল ফুল্লরাকে লইয়া কাঁচবাংলায় আসিয়াছিল আজ সেই দিনের কথা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। ফুল্লরার ব্যক্তিত্ব হইতে সেদিন যেন অতি সূক্ষ্ম একটি মোহের আভাস নির্গত হইয়া চারিদিক রঙীন করিয়া তুলিয়াছিল—আজ তার একান্ত অভাব সে অনুভব করিল। সেই সবই আছে—তবু কি যেন নাই!

সেদিন ছিল প্রেমের অরুণোদয়ের বর্ণলীলা। যার উপরে সে দ্যুতি পড়িয়াছে তাকেই অলৌকিক করিয়া তুলিয়াছে! সামান্য বাষ্পরেখাও নন্দনের ছবি প্রতিফলিত করিয়াছে। আর আজ শুধু প্রেমের অতি পরিচয়ের মধ্যাহ্ন দীপ্তি—রং ফলাইবার মত এতটুকু বাষ্পরেখা কোথাও নাই; সমস্তই অত্যন্ত স্পষ্ট, সমস্তই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

অন্ধকারের মধ্যে ফুল্লরা বিমলের হাত ধরিল, বিমল তার হাত চাপিয়া ধরিল! প্রথম-প্রেমের সে স্পর্শ পাইল না; শুধু মুহূর্তের জন্যও সেই স্পর্শ পাইবার আগ্রহে ফুল্লরার কোমল মুঠি আরও চাপিয়া ধরিল। নাই, নাই, প্রাথমিক সে স্পর্শ নাই—যাতে শিরায় শিরায় দাবানল সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

ফুল্লরা সে করনিষ্পেষের অর্থ আর এক রকম বুঝিল—কামনায় বাসনায় উল্লাসে মোহে তার সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল এমন নিবিড় নিষ্পেষ বিমল অনেক দিন করে নাই; সেই প্রথম আমলে করিত।

সে ভাবিল—বিমল তাকে আগের মতই ভালবাসে! নিশ্চয় ভালবাসে, কেন না বাসিবে, না বাসিবার কারণ কি আছে; সে বিমলকে ভুল বুঝিয়া তার প্রতি অবিচার করিয়াছে।

বিমলের মনে হইতেছিল ওই যে মেয়েটি তপতী কমলালেবু দিবার সময় যার আঙুলের ডগাটা একবার তার হাতে ঠেকিয়াছিল—ওঃ কি বিদ্যুৎগর্ভ সে আঙুলের ডগা। তার এক আঙুলের আধ মুহূর্তের স্পর্শের আগুন ফুল্লরার সমস্ত হাতে নাই, সমস্ত দেহে নাই—কিন্তু একদিন ছিল, এই সেদিন মাত্র!

বিমল ভাবিতে লাগিল—কেন এমন হইল! কেন এমন হইল! সে প্রাণ ভরিয়া ফুল্লরাকে ভালবাসিতে চায়—কিন্তু কিসের যেন বাধা

অনুভব করে। কিসের সে বাধা! সে জানিতে পারিলে একটা ব্যবস্থা করিতে পারিত। কেমন করিয়া জানা যায়! কেহ কি জানিতে পারে না!

দুই জনের মন দুই সুরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেক রাত্রে তারা বাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

তারপরে পূরা দুই বছর চলিয়া গিয়াছে। আবার শীতকাল আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে ফুল্লরা-বিমলের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বরঞ্চ উত্তোরত্তর যেন অধিকতর মানসিক বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে।

বিমল মনের বীক্ষণাগারে প্রবেশ করিয়া দুটি সত্য বুঝিতে পারিয়াছে; প্রথম অধিকাংশ মানুষ জীবনে ভালবাসা চায় না, শান্তি চায়; প্রেম অশান্তির কারণ; দ্বিতীয়, যে-শান্তি সে প্রেমের কাছে পায় নাই, সেই শান্তি কখনো কখনো সে প্রকৃতির হাত হইতে পাইয়াছে; শেষেরটা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; সকল মানুষের পক্ষে সত্য কি না বলিতে পারে না।

প্রেমে যে শান্তি নাই, এ কথা বুঝিতে মানুষের প্রাণান্ত হয়। শান্তি কাম্য বলিয়াই মানুষ প্রেম চায়, প্রেমের জন্য বিবাহ করে, বিবাহ করিয়া ফেলিয়া শেষে বুঝিতে পারে, প্রেমও পাওয়া গেল না, শান্তিও গেল। আর যদি কোন হতভাগ্য সত্যই প্রেম পায়, তবে তো তার সর্ব্বনাশ—জীবনে শান্তি তার কখনো মিলিল না। আর সব চেয়ে কৌতুকের এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মর্ম্মান্তিক কথাটা মানুষে বুঝিতে পারে বিবাহের পরে যখন আর ফিরিবার পথ থাকে না; তাই অধিকাংশ বিবাহ এমন অশান্তির, অধিকাংশ বিবাহ এমন গতানুগতিক।

কিন্তু তাই বলিয়া জীবনে শান্তি যে অলভ্য এমন নয়। এমন কি তার মত ভাগ্যহতও কখনো কখনো শান্তির স্বাদ পাইয়াছে; সেই সব ক্ষণিক মুহূর্ত্তেই প্রমাণ করিয়াছে শান্তি দুষ্প্রাপ্য নয়; একেবারে অপ্রাপ্য হইলে এমন দুঃখের কারণ হইত না।

সে ধীরে ধীরে অনুভব করিতেছিল প্রকৃতি ও ফুল্লরার মধ্যে তাকে লইয়া একটা টানাটানি চলিতেছে ; একজন টানিতেছে প্রেমের দিকে একজন শান্তির দিকে ; সংসারের মধ্যে একজনের কল্যাণহস্ত সর্ব্বদা প্রসারিত, আর একজনের স্নিগ্ধস্পর্শ সর্ব্বদা সংসারের সীমান্তের দিকে আহ্বান করিতেছে। একজনের সজীব মন সুখেদুঃখে সক্রিয়, আর একজনের সংবেদনহীন মন সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয় ; একজনের মধ্যে সংঘাত আছে—আর একজন নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত।

অথচ এই বিমলই তো বিবাহের আগে, সে তো বেশি দিনের কথা নয়, ফুল্লরার মধ্যে জীবনের চরিতার্থতার স্বাদ পাইয়াছিল। আজ এমন হইল কেন? যে-মোহ বহু দিনরাতের কল্পনায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাস্তবের সামান্য দুটা আঘাতেই তাহা ছুটিয়া গেল কেন? জীবন স্রোতে ত্বরান্বিত কল্পনা ও বাস্তবের কলস ভাসিয়া চলিয়াছে ; ক্ষণে ক্ষণে পরস্পরের আঘাতে আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইতেছে ; মানুষের সংসার, মানুষের শিল্প সেই ধ্বনিতে পূর্ণ।

বিমলের মনে হইল সে প্রেমের পাহাড়ীপথে রঙীন কুয়াশার মধ্যে যাত্রা করিয়াছিল ; কুয়াশার মল্‌মলের টানাপোড়েনে বোনা ইন্দ্রধনুর অলৌকিক রেশমকে বাস্তব বলিয়া ভাবিয়াছিল ; অদৃশ্য নির্ঝরের ঝঙ্কারকে বনদেবীদের বীণাসঙ্গীত মনে করিয়াছিল, জীবন এমন মধুর, প্রেম এতই মোহময়! হঠাৎ কুয়াশা সরিয়া গেলে, সে দেখিতে পাইল যে সম্মুখেই অতলস্পর্শ খাদ, আর চারিদিকের নির্ঝর সম্মিলিতস্রোতে সেই অতলের মধ্যে অদৃশ্য হইবার আগে শেষবারের জন্য একবার হা হা ধ্বনি করিয়া উঠিতেছে। আর এক পা অগ্রসর হইলেই অগাধ মৃত্যু! পিছাইয়া গেলে কেমন হয়?

বিমল ভাবিল পিছাইতে যাইব কেন? আর ইচ্ছা থাকিলেও কি

তাহা সম্ভব? কুয়াশার আবেশে মুগ্ধের মত না জানি এমন কত অন্ধকার খাদ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি! সজ্ঞানে, মোহহীন চক্ষে আবার কি সেসব পুনরতিক্রম করা যাইবে? তবে।

বিমলের চিন্তার সূত্র এই পর্য্যন্ত আসিয়া ছিন্ন হইয়া যাইত। কোন উত্তর সে খুঁজিয়া পাইত না। চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্ক লইয়া গিয়া সে কোপাই নদীর তীরে বসিত। উত্তর পাইত না কিন্তু শান্তি পাইত! তার চেয়ে বেশি আর কি মানুষে জীবনে পাইতে পারে?

* * * *

ফুল্লরা বিমলের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু কি তার কারণ ভাবিয়া পাইত না।

বিমল কি তাকে ভালবাসে না? তারপরে মনে হইত—তবে কা'কে ভালবাসে? এ গ্রামে তো বিমলের ভালবাসার যোগ্য কোন মেয়েকে সে দেখিতে পাইত না। বস্তুতঃ দু' চারজন পুরুষ ছাড়া গ্রামের কারো সঙ্গে বিমলের আলাপ ছিল না বলিলেই হয়।

তখন তার মনে হইত, এমন হইতে পারে যে কলিকাতায় থাকিবার সময়ে, বিবাহের আগে, কোন মেয়েকে ভালবাসিত—এখন তাকে মনে পড়িয়া গিয়াছে। যুক্তি হিসাবে এটা অচল না হইলেও ফুল্লরার সংস্কার কেমন যেন বলিত, না, না ইহা সত্য নয়। সত্যই যদি কোন মেয়েকে সে ভালবাসিত, তবে তাকে বিবাহ না করিয়া ফুল্লরাকে বিবাহ করিতে গেল কেন? গ্রামে আসিয়া কলিকাতায় না ফিরিবার কারণ কি? ফুল্লরার সঙ্গে আলাপ তো অনেক পরে হইয়াছে! তাছাড়া—ফুল্লরার চোখ, কান, গাল লাল হইয়া উঠিত, বিমল ফুল্লরাকে সত্যই ভালবাসিত; বিবাহের আগে এবং পরেও কিছুদিন। মেয়েরা এ বিষয়ে প্রায়ই ভুল করে না, তবে বিমলের এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

তার মনে হইত, আচ্ছা বিমল যদি তাকে ভাল না বাসে তবে কা'কে ভালবাসে? ইহার কোন উত্তর সে খুঁজিয়া পাইত না। কাউকেই যে ভালবাসা না যাইতে পারে—ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিত না।

বিমল যদি বলিত যে কোপাই নদীকে ভালবাসে; তবে ফুল্লরা নিশ্চয় হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিম্বা ঠাট্টা করিয়া বলিত, তোমার কোপবতী আমার সতীন। খুব সম্ভব সে কথাটা বিশ্বাস করিত না, নদীকে নাকি আবার ভালবাসা যায়!

বিমল যদি বলিত যে কোপাই নদীই ধীরে ধীরে তাকে ফুল্লরার কাছে হইতে টানিয়া দূরে লইয়া যাইতেছে, ফুল্লরা নিশ্চয় কথাটাকে কবিত্ব বা বিদ্রূপ বলিয়া গণ্য করিত।

কিন্তু উত্তর দিতে গেলে বিমলের এই উত্তর ছাড়া আর কোন উত্তর তো ছিল না। বিমল যদি বলিত সে অমুক মেয়েকে ভালবাসে, তবে মর্ম্মান্তিক পীড়া পাইলেও ফুল্লরা অবিশ্বাস করিত না। কিন্তু এ এমন একটা অবাস্তব সত্য যে ইহা পীড়া দিবে না—আবার বিশ্বাস-যোগ্যও হইবে না। বিমলের ইহাই ছিল সব চেয়ে বড় বিপদ। সে ফুল্লরার কাছে নিজের মনোভাবকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। আবার ফুল্লরা যে তাকে বুঝিতেছে না—এই দুঃখ যেটুকু প্রেম তার মনে অবশিষ্ট ছিল, তার মূলে গিয়া আঘাত করিত।

তাই বলিয়া সংসারে শান্তির অভাব ছিল না। সাংসারিক শান্তির মূলে সচ্ছলতা—অসচ্ছল তাদের অবস্থা কোনদিনই ছিল না। সাংসারিক বিচারে তারা সুখী জীব ছিল; বাহির হইতে দেখিয়া এই মানসিক বিপর্য্যয় কারো ধরিবার উপায় নাই; এক এক সময় তাদের নিজেরই সন্দেহ উপস্থিত হইত—তারা কি সত্যই অসুখী? সাংসারিক লোকে

যাহাকে সুখের চিহ্ন বলে, তাদের সংসারে তার সবগুলিই আছে। তবে তাদের সুখের অভাব কিসের? মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিয়া ফুল্লরা বিমলকে খুঁজিতে যখন ঘরে ঢুকিত, দেখিত বিমল নাই; কোপাই নদীর ধারে চলিয়া গিয়াছে। মুখে বিদ্রূপের হাসি শানিত হইয়া উঠিত, বলিত, কোপাই আমার সতীন হ'ল দেখছি। কিন্তু কেন জানি চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। মন বলিত, আমারি দোষ, আমারি দোষ—ঘরে শান্তি দিতে পারিলে কি সে আর বাহিরে যায়?

৬

কোপাই নদীর তীরে একটা জায়গা বিশেষ করিয়া বিমলের প্রিয় ছিল—অবসর পাইলেই সে সেখানে গিয়া বসিত।

সেখানে নদী হঠাৎ ধনুকের মত বাঁকিয়া যাওয়াতে খানিকটা জমি গড়াইয়া আসিয়া নদীর ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে—তার তিন দিকে জল; জাম, শাল, মহুয়া খেজুর গাছে মিলিয়া জায়গাটিকে বনভূমির ঐশ্বর্য্য দিয়াছে—ইতস্ততঃ বুনো কুলের লতানে গুল্ম।

বিমল সেখানে গিয়া একটা মহুয়াগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বসিল! শীতের দুপুরে তাতারসির মত তপ্তরোদ আকাশের অফুরন্ত ভিয়েন হইতে ঝরিয়াই পড়িতেছে; খোলা মাঠের মধ্যে বাতাস ঈষৎ উত্তপ্ত গাছের ছায়াতে বেশ শীতল। বিমল সম্মুখে তাকাইয়া দেখিল নদীর ওপারে মাঠের মধ্যে কতকগুলি গরু চরিতেছে; তারপর আরও খানিকটা মাঠ, মাঠের শেষে খোয়াই-এর উঁচু ডাঙাজমি; সেই জমির উপরে সাঁওতাল পল্লীর কয়েকখানি কুটীর।

দৃষ্টিকে দূর হইতে কাছে টানিয়া আনিয়া দেখিল পাশে জামগাছটার তলায় একটা কাঠবিড়ালি লেজের উপর ভর দিয়া বসিয়া কি যেন খাইতেছে; বিমলের দিকে চোখ পড়িতেই একছুটে গিয়া গাছের উপরে চড়িল; আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে নামিয়া আসিয়া কোন খাদ্যকণা সংগ্রহ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। পিছনে বনের মধ্যে একটা কাঠ্‌ঠোকরা অনবরত ঠক্‌ঠক্ করিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে থামে, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তার ঠক্‌ঠকানি চলিতে থাকে। হঠাৎ শুষ্কপাতার রাশির উপর দিয়া একটি গিরগিটি চলিয়া গেল; পাতার রাশি মরমর খড়্‌খড়্

করিয়া উঠিল ; সে শব্দ এত মৃদু অথচ এমন স্পষ্ট মনে হইল যেন একদল অশ্বারোহী মাঠের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল। সে উপরে চাহিয়া দেখিল, আকাশ কি গভীর নীল! আকাশ এত নীল! আর আকাশ কত উপরে। ওই যে অত উঁচুতে দুটি চিলের কালো বিন্দু—আকাশ তারও আরও কত উপরে। রৌদ্রেমাজা নিটোল দিগ্বলয় ইন্দ্রাণীর মণিবন্ধচ্যুত সুবর্ণ অঙ্গদ। রোদে-পোড়া শুক্‌নো ঘাসের গন্ধের সঙ্গে কোনো সুগন্ধের তুলনা হয় না বটে, তবু তা কেমন স্নিগ্ধ, কেমন মন-উচাটনকরা।

কিছুক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিবার পরে বিমলের মনে হইল সংসারের সব দাহ যেন তার মন হইতে দূর হইয়া গেল ; তার মনে হইল পৃথিবীতে শান্তি নাই—এ কথা সত্য নয় ; আমরা যথার্থ স্থানে সন্ধান করি না বলিয়াই শান্তি পাই না ! এইখানে বসিয়া, এই গাছের সঙ্গে স্থাণু হইয়া গিয়া, কাঠবিড়ালীর সঙ্গে খেলা করিয়া, নদীর স্রোতে মিশিয়া গিয়া, আর সোনার রোদের রসায়নে অখণ্ড প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়া কি শান্তি পাওয়া যায় না ! শান্তি পাইতে হইলে প্রকৃতির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে ; মানুষের সংসারের প্রকৃতি খণ্ডিতা—তাই তাকে নিরর্থক বলিয়া মনে হয়, অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়, প্রয়োজনের সেবাদাসী বলিয়া মনে হয় ; শান্তির অমৃতপাত্র কাড়িয়া লইয়া ফসল-ক্ষেতে জলসিঞ্চনের কাজে লাগাইলে—এমনটিই হইবার কথা।

কে যেন তাকে বলিল—বোধহয় তার মনের মধ্য হইতে কেউ, যে প্রেম মানুষের কাম্য নয়, শান্তিই কাম্য। মানুষের কাছে প্রেম পাওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায় প্রকৃতির কাছে।

প্রেমের লক্ষণ চঞ্চলতা তা'তে সজীব মনের সঙ্গে সজীব মনের সংঘর্ষ ; পরস্পর প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া—ফলে অশান্তি। আর প্রকৃতির ভালবাসাতে প্রতিরোধ নাই, প্রতিক্রিয়া নাই—সংঘর্ষ নাই, ফলে শান্তি।

মানুষ ও প্রকৃতির প্রেমে একপক্ষ নিষ্ক্রিয়; মানুষ ভালবাসিয়া যায়; প্রকৃতি গ্রহণ করে; তার প্রতিদান শান্তি। প্রকৃতির ভালবাসা শিশুর ভালবাসার মত; ভালবাসা গ্রহণ করিয়াই তার পরিতৃপ্তি; প্রত্যাঘাত করে না বলিয়াই শিশুকে ভালবাসা সহজ; আবার কিশোরীকে সখীরূপে ভালবাসাও সহজ—সে প্রেমের মধ্যেও ঘাতপ্রতিঘাত নাই, এক পক্ষ সক্রিয় অপর পক্ষ অল্পাধিক নিষ্ক্রিয়; ভালবাসার অমৃত ঢালিয়া দাও, সে সহজ হাসিতে তাহা গ্রহণ করিবে, ফিরিয়া পাইবার দুঃসহ আনন্দ নাই, কারণ ফিরিয়া পাইবার কথা মনেই ওঠে না।

বিমলের মনের মধ্য হইতে কে যেন মৃদুঃস্বরে এই সব কথা বলিয়া যাইতে লাগিল—কথাগুলি তার কাছে নূতন নয়, কেবল স্বর মৃদু বলিয়া সংসারের কোলাহলে কানে আসিত না।

সে ভাবিতে লাগিল, প্রকৃতি, শিশু ও সখী সগোত্র, কিম্বা ব্যাপক অর্থে শিশু ও সখী প্রকৃতিরই সঙ্গ; তারা প্রকৃতির মতই সহজ, সরল, নিষ্ক্রিয়, প্রতিদানে অসমর্থ; প্রতিদান তারা করে না বলিয়াই হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিবার পরিবর্তে শান্ত করিয়া দেয়। শান্তির চেয়ে কাম্যতর জীবনে আর কি আছে?

বিমল ভাবিতে লাগিল—মানুষ এই সহজ কথাটা বোঝে না কেন? নিষ্ক্রিয় প্রেমে তৃপ্ত না থাকিয়া সে জীবনে সংঘর্ষ ডাকিয়া আনে কেন? মানুষে বিবাহ করিতে যায় কেন? বিবাহ করিয়া কেহ কখনো সুখী হইতে পারিয়াছে কি?

সুখের জন্য তো নয়, ভালবাসার জন্য লোক বিবাহ করে।

কথাটা মনে পড়িতেই তার হাসি পাইল! কত বড় ভুল! বছর দুই তিন আগে সে নিজেও তো এই ভুল করিয়াছিল! ভালবাসিল,

ভালবাসাকে পাকা করিবার জন্য বিবাহ করিল, শেষে দেখিল ভালবাসাও নাই ; শান্তিও গেল !

একবার তার মনে হইল সকলেই ভুল করিতেছে—আর সে-ই নির্ভুল এমন কে বলিল ?

অমনি তার মনের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, সকল মানুষের কথা ছাড়িয়া দাও ; তারা ভুলও নয়, নির্ভুলও নয়, তাদের মৃতমনে কোনরূপ বোধই নাই ; তারা চলন্ত শিলাখণ্ডের মত কেবল নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। যার মন সজীব, বিমলের মতই তার অভিজ্ঞতা, বিবাহ করিয়া সে প্রেমকে বিসর্জ্জন দেয়—শান্তিও পায় না।

বিবাহের আগে যে ফুল্লরাকে ভালবাসিত, বিবাহের পরে সে ভালবাসা গেল কোথায় ? কার দোষ সে প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই কারণ দোষ কারও নয় ; সেই ফুল্লরা আছে, সেই বিমল আছে, কেবল তাদের মধ্যেকার সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

তার মনে পড়িল বৈষ্ণবকবিদের এক গান আছে যাতে এক রতি ঘৃত দিয়া যুগবাতি জ্বালাইবার চেষ্টাকে পরিহাস করা হইয়াছে। সে এখন বুঝিতে পারিল প্রেম সেই এক রতি ঘি, আর দীর্ঘজীবন যুগবাতি। রাত্রি শেষ হইবার অনেক আগে ঘি ফুরাইয়া যায় ; প্রদীপ তেমনি থাকে, সলিতা তেমনি থাকে, কেবল ঘি আর থাকে না !

মানুষের অসাধ্য সাধনের প্রয়াসে তার হাসি পাইল। প্রেমের আলোতে জীবনকে ভাস্বর করিবার চেষ্টা ! আর সেই জন্যই নাকি বিবাহ ! বিবাহ না করিলে প্রেম কিছুকাল থাকিলেও থাকিতে পারে—কিন্তু শিকল দিয়া শিখাকে বাঁধা যায় ?

তার মনে নিশ্চিত ধারণা হইল, বিবাহ করিয়া কেহ কখনো সুখী হয় নাই। না, তার চেয়েও বেশি, শিকল দিয়া শিখাকে বাঁধার ব্যর্থতায়

সকলেই ভগ্নহৃদয় হইয়াছে। তবে সকলেই কি তার মত দুঃখী! তখনই মনে পড়িয়া গেল, অধিকাংশের হৃদয় এতই জড়, যে তাদের সাংসারিক চৈতন্যমাত্র আছে, তার বেশি কিছু নয়; তারা সুখীও নয়, দুঃখীও নয়, তারা সাংসারিক জীবমাত্র।

আর যে দু'চার জনের সজীব মন তারা বিমলের মতই ক্লিষ্টহৃদয় টানিয়া টানিয়া দীর্ঘপথ চলিয়াছে। সে যে ভুল করে নাই, করিতে পারে না, বুদ্ধি তার তীক্ষ্ণ এই অহমিকার খাতিরে মুখে হাসি বিকশিত করিয়া বাঁচিয়া আছে, হৃদয়ের কথা হৃদয়ই জানে—দুঃখের সমবেদনার সমসূত্রে দাঁড়াইয়া আজ বিমলও তাহা জানিতে পারিতেছে।

তখন তার মনে পড়িল ভালবাসা যদি অলভ্য হয়, তবে জীবনের আশ্রয়স্বরূপ কোন একটা ভাবতো চাই। মন বলিল তাহা প্রেম নয়, শান্তি; মানুষের সান্ত্বনার স্থল মানুষ নয়, প্রকৃতি।

কিন্তু ফুল্লরা কি দোষ করিয়াছে? তার প্রতি অবিচার সে করিবে কেন? তার প্রতি সমবেদনাহীন হইবে সে কেমন করিয়া?

তখনি মনে হইল বিমল কি অদৃষ্টের কর্ত্তা যে সুখদুঃখ বিধানের ভার তার উপরে? একই অদৃষ্টের নাগপাশে সে ও ফুল্লরা সমান নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নিষ্পেষিত, কে কার প্রতি দয়া করিবে? কে কার প্রতি বিচার করিবে? সে যদি শান্তি না পায় তা'তেই কি ফুল্লরার শান্তিলাভের কোন সুরাহা হইবে?

এই রকম নানা বিরুদ্ধ চিন্তার টানাপোড়েন তার মনের মধ্যে জাল বুনিয়া তুলিতে লাগিল। কোন মীমাংসার দিকে অবশ্য অগ্রসর হইতে পারিল না, কিন্তু যে সব বিষয় এতদিন নীহারিকার অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া মনের মধ্যে ছিল, তাহাতে দু'একটা নক্ষত্র যেন ফুটিয়া উঠিল। বিমল এটুকু বুঝিল যে ইহা ধ্রুবনক্ষত্র নয়, কিন্তু তখনি সন্দেহ লাগিল

পতনোন্মুখ উল্কাজ্যোতিকে তো সে নক্ষত্রদীপ্তি বলিয়া ভুল করিল না? কে জানে!

বহুক্ষণ চিন্তার পরে নূতন করিয়া আবার চিন্তার সূত্র টানিবার উদ্যম তার ছিল না; সে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

সে দেখিল বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে, বৃহৎ অশথগাছটার বৃহত্তর ছায়া ঘটোৎকচের মত বনভূমিকে জুড়িয়া পড়িয়া আছে; ইতিমধ্যেই খেজুরের রস পড়িতে আরম্ভ করিয়া বাতাসকে মদির করিয়া তুলিয়াছে; নদীর জলে নামিয়া দেখিল গা শিহরানো স্বচ্ছজলে উল্টাচোখী মাছের ঝাঁক ইতস্ততঃ সন্তরণ করিতেছে।

নদী পার হইয়া সে একবার দাঁড়াইল। অনেক দিন হইতে তার মনে ইচ্ছা ছিল কোপাই নদীর উৎস সে একবার দেখিয়া আসিবে। মনে হইল মন্দ কি একবার এই উপলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়িলেই তো হয়। এই চিন্তা তার সারাদিনের অবসাদকে এক নিমেষে দুর করিয়া দিল। সে উৎসাহে দ্রুত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

দুইদিন পরে বিমল কোপাই নদীর উৎসের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। একটি গাধার পিঠে ছোট্ট একটি তাঁবু, সামান্য কিছু বিছানাপত্র ও দু'একটি তৈজসের বোঝা চাপাইয়া দিল; গাধাটাকে চালাইবার জন্য একজন লোক লইল। মিতন সঙ্গে যাইবার জন্য জিদ করিয়াছিল, বিমল বলিল—সেকি রে, তুই গেলে বাড়ীতে থাকবে কে?

ফুল্লরা কিছুদিন হইতে বিমলের মনোভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল; হঠাৎ তাই এই খেয়ালে সে ভাবিল হয় তো ইহাতে সংসারের দিকে মন ফিরিতে পারে, কাজেই সে কোন বাধাসৃষ্টি করিল না।

সে একবার কেবল শুধাইল—ফিরতে বেশি দেরী হ'বে না তো?

বিমল বলিল খুব বেশি হয় তো দিন পনেরো। আর ভাল না লাগ্‌লে আগেও ফিরতে পারি।

ফুল্লরা বলিল—তাই ফিরো। একা তো চল্‌লে অসুখবিসুখ করে না ব'সে!

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল—অসুখ! যাযাবরদের কখনো অসুখ করে শুনেছ? না সে ভয় নেই।

ফুল্লরা বলিল—অসুখ না করে ভালই। কিন্তু খাওয়ার কষ্ট হবে খুব!

বিমল হাসিয়া বলিল—কিছু না। আর যদিই বা হয় তা বুঝতে পারবো ফিরে এসে।

বিমলকে হাসিতে দেখিয়া ফুল্লরা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন?

বিমল বলিল—হঠাৎ হয়নি। বাড়ীর কাছে নদীটা আসছে কোত্থেকে জানবার কৌতূহল তো স্বাভাবিক। অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল হ'য়ে ওঠেনি।

—সে আর এমন নূতন কি! ম্যাপে নিশ্চয় দাগ-বুলানো আছে।

বিমল বলিল—ম্যাপ-ওয়ালারা ঠিক এঁকেছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যই তো আমার যাত্রা। অনেক সময় ওরা একটা গোঁজামিল দিয়ে ছেড়ে দেয়।

ফুল্লরা আর কি বলিবে, ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল।

দুপুরের একটু পরে বিমল হাতে একখানা লাঠি লইয়া রওনা হইয়া গেল! গাধাটাকে আগেই রওনা করিয়া দিয়াছিল।

বিমলের পায়ের তলে আজ অফুরন্ত লালপথ, পিঠের উপরে শীতের আরামের রোদ; দিগন্তে বিবর্ণ ক্ষীণ একটা বনের রেখা, কোথাও বা দিগন্তর সম্পূর্ণ নগ্ন; আর পাশে পাশে কালো জলের উঁচু পাড়ের কাপাই নদী। এই রকম একটা যাযাবর জীবনের জন্য অনেক দিন হইতে সে কামনা করিতেছিল। সে মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল —আঃ এই তো মুক্তি, এই তো আনন্দ, এই তো শান্তি।

সন্ধ্যাবেলা তালবনী হইতে কয়েক মাইল দূরে বল্লভপুর নামে একটা গ্রামে নদীর ধারে বিমল তাঁবু ফেলিল। তাঁবুর মধ্যে কিছু খড় বিছাইয়া বিছানা করিয়া লইল; তারপরে রান্নার আয়োজনে মন দিল। অন্ধকারে শীতের মধ্যে কি আর রান্না করিবে! চাকরটা যা হয় কিছু রাঁধিল—তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া সে তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল!

অনেক রাতে হঠাৎ গাধার ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল; বিমলের মনে পড়িল, তাই তো গাধাটার নিশ্চয় শীত করিতেছে। সে উঠিয়া একখানা কম্বল গাধার গায়ে জড়াইয়া দিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে আবার গাধার ডাকে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল—গাধার শীত কিছুতেই কমিতেছে না, সে আর একখানা কম্বল পশুটার গায়ে চাপাইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

এমনিভাবে প্রহরে প্রহরে গাধার ডাক করুণতর হইতে লাগিল আর বিমলের কম্বলগুলি ক্রমে ক্রমে নিজের শরীর হইতে গাধার দেহে চড়িতে থাকিল।

ভোর বেলা সে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দেখিল গাধাটা নাই, ছেঁড়া দড়ি পড়িয়া আছে—কম্বলগুলা ইতস্ততঃ ছড়ানো; রাতে কখন সে দড়ি ছিঁড়িয়া বাড়ীর দিকে পালাইয়াছে। গাধার এই অকৃতজ্ঞতায় বিমল মনে মনে বলিল—নেহাৎ গাধা—নতুবা বেড়াইবার এমন সুযোগ ছাড়িয়া ধোপার কাপড় বহিবার জন্য পালাইবে কেন?

এখন তার এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইল—মাল বহিবার কি হইবে? গরুর গাড়ী করিলে সব সমাধান হয় বটে—কিন্তু তাহাতে নদীর ধার দিয়া যাওয়া হয় না—রাস্তা অনুসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। সে স্থির করিল, নদীর ধার দিয়াই তাকে যাইতে হইবে, কাজেই মালপত্র যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিল। একটা থলিতে সামান্য যা কিছু ধরে তাহাই মাত্র লইবে—বাকিসব, তাঁবু এবং তৈজস চাকরের সঙ্গে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিল। বেলা দশটার মধ্যে রান্না সারিয়া খাইয়া লইয়া পিঠের উপরে থলিটা বাঁধিয়া বিমল রওনা হইয়া গেল—চাকর একখানা গরুর গাড়ী করিয়া জিনিষপত্র লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

এবারে বিমল সম্পূর্ণ একা। নদীর ধারে মাঠ, মাঠের মাঝে ধানের ক্ষেত; কাটাধানের গুড়িতে মাঠ অসমতল। আবার কোথাও বা উঁচু-নীচু, কোথাও বা শালমহুয়ার বন। পিঠে থলিবাঁধা, হাতে লাঠি একটা ভদ্রলোককে এমন ভবঘুরের মত চলিতে দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া

যায় ; কেহ পাগল ভাবে, কেহ কোম্পানীর লোক ভাবে—কেহবা আর কিছু ভাবে।

এইভাবে চলিতে চলিতে সন্ধ্যাবেলা পীরেরডাঙা নামে ছোট এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের বাহিরে এক মুসলমান চাষীর সঙ্গে তার আলাপ হইয়াছিল ; সেই লোকটি দয়াপরবশ হইয়া বিমলকে রাত্রির জন্য একটি ঘর ছাড়িয়া দিল ; বিমল সামান্য কিছু রাঁধিয়া খাইল ; —সারাদিনের পথ চলায় সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন উঠিয়া যতশীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ করিয়া আবার সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

বিমলের যাযাবর জীবনযাত্রা এই ভাবে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া কারো বৈঠকখানায় বা বাহিরবাড়ীতে একটু আশ্রয় চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দেয়—তার পক্ষে যা সম্ভব এমন কিছু রাঁধিয়া খায়—পরদিন বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আবার চলিতে থাকে।

শরীরের কষ্ট যে তার না হইত এমন নয়, বিশেষ এরকম অনভ্যাস ও পরিশ্রমে সে অভ্যস্ত নয়, কিন্তু প্রকৃতির সেবারত স্নিগ্ধ হাতের আভাস তার মনের মধ্যে সর্ব্বদা যেন শান্তির পরিমল বীজন করিত। যে-মেঠো পথ বাহিয়া সে চলিত তখন তার দুইদিকে কচি রবিশস্যের ক্ষেত ; হলদে ফুলের আভাসলাগা শরষে, লাল নীল আর বেগুনী ফুলের ফুলকাটা মটর ; শিশিরে-শাদা ছোলা ; ম্লানসবুজ রঙের মশুর ; মাঝে আবক্ষ-উঁচু আখ ; কোথাও বা শিষ-ওঠা পেঁয়াজ ! নদীর ওপারে ডাঙাজমি, দুপুরবেলা সেখানে গোরু চরিয়া বেড়ায়—এখানে ওখানে পলাশ আর শিমুলের গাছ —গোপনে গোপনে তাদের শাখা প্রশাখায় ফুলফোটার আয়োজন চলিতেছে। মাথার উপরে আকাশ-উপছানো রোদের ধারা ; সেই

রোদের আড়ালে কোথা হইতে একটা চিল করুণকর্কশ রবে চীৎকার করে, সেই শব্দে সমস্ত প্রান্তর যেন কথা বলিয়া ওঠে। বিকাল বেলা সে দেখিতে পায়, যে-সব ধানের ক্ষেতে এখনো কিছু ধানকাটা বাকি আছে—সেখানে হইতে শেষ গাড়ী ধান ধূলা উড়াইয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছে—আর অদূরে ওই যে বৃক্ষের সমারোহ—যার ওপরে ভাঁজে ভাঁজে ধোয়ার স্তর—ওখানে এক খানা গ্রাম আছে—সেই গ্রামে আজ তাকে আশ্রয় খুঁজিতে হইবে।

এই ভাবে কয়েকদিন চলিবার পরে নদী সঙ্কীর্ণতর ও অগভীর হইতে লাগিল; নদীর তীরের বন কমিয়া মাঠের অংশ অধিকতর হইতে লাগিল; চষা-ক্ষেতের বদলে পোড়োজমি বাড়িতে লাগিল—আর গ্রাম অত্যন্ত বিরল হইয়া আসিল।

সাধারণতঃ সে বেলা দশটার সময়ে রওনা হয়, কিন্তু সেদিন খুব ভোরে রওনা হইয়া পড়িল, সে শুনিয়াছিল কোপাই নদীর উৎস অল্পদূরে মাত্র। তার ইচ্ছা ছিল সেদিনই সেখানে গিয়া পৌঁছিবে।

যখন সে রওনা হইল—তখনো মাঠের মধ্যে কুয়াশা ছিল। কুয়াশার মধ্যে অন্ধভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ যখন কুয়াশা কাটিয়া গেল—তখন সম্মুখে দেখিল তরঙ্গায়িত এক উপত্যকা। একটি তরঙ্গের শীর্ষে সে দাঁড়াইয়া—তারপরে জমি গড়াইয়া নীচু হইয়া গিয়াছে, তলদেশ দেখা যাইতেছে না, কেবল গাছপালার মাথাগুলি দেখা যায়—ওই গাছপালার তলে কোথাও কোপাইনদী প্রবাহিতা; তারপরে আবার জমি উঁচু হইতে আরম্ভ করিয়া দিগন্তের কাছে গিয়া উচ্চতম হইয়াছে; দিগন্তের উত্তরপশ্চিম অংশে সাঁওতাল পরগণার গিরিমালার দৃশ্য! ওপারের তরঙ্গায়িত মাঠের কোনখানে বা গাছপালা, কোনখানে বা সম্পূর্ণ রিক্ত! বাংলা দেশের সমতল জমির মানুষ বিমল! তার চোখে এই উপত্যকার দৃশ্য

ভারি অদ্ভুত লাগিল। তার কেবলি মনে হইতে লাগিল কাছের নদীটা দেখা যাইতেছে না—কিন্তু তার চেয়ে দূরের মাঠ কেমন স্পষ্ট, কেমন আস বলিয়া বোধ হইতেছে।

সে তাড়াতাড়ি হাটিতে সুরু করিল—কিন্তু ওপারের আসন্ন মাঠ তেমনি দুরবর্ত্তী রহিয়া গেল—গিরিমালা এক পাও অগ্রসর হইবার উদ্যম দেখাইল না।

এমন সময়ে সে মাঠের মধ্যে একটা লোককে দেখিতে পাইল, লোকটা চলমান কঙ্কালবিশেষ।

বিমল তাকে শুধাইল—নদীটা কোত্থেকে বেরুচ্ছে বল্‌তে পারো?

লোকটা প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল—এমন অদ্ভুত প্রশ্ন সে জীবনে কখনো শোনে নাই!

বিমল আবার শুধাইল।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিলে লোকটা বলিল—নদী! ওই হোথা থেকে বটে! এই বলিয়া মাঠের মধ্যে অনেক দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল!

বিমল বলিল—হোথা কি আছে?

লোকটা বলিল—কি আবার থাকবেগ-গো! একটা শালবন—আর ডাঙ্গা জমি!

বিমলের বিশ্বাস হইল না। শালবন আর ডাঙ্গা হইতে নদী বাহির হইবে কি?

সে শুধাইল—জায়গাটার নাম কি?

লোকটা বলিল—হোথাকে একটা গ্রাম আছে—খেজুরি ব'লে!

বিমল শুধাইল—কতদূর?

—কতদূর? লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল—পোয়াটাক হ'বে বটে।

পোয়াটাক পথ শুনিয়া বিমল মোটেই আশ্বস্ত হইল না, এই কয়দিনে পোয়াটাক পথের বিষম অভিজ্ঞতা তার হইয়াছে। পোয়াটাক পথ, সিকি ক্রোশ সে বারংবার হাঁটিয়া দেখিয়াছে, শেষ হইতেই চাহে না। কাজেই বুঝিল সন্ধ্যার আগে ওখানে পৌছিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কাছাকাছি কোন গ্রামও নাই—রাত্রি কাটাইবে কোথায়?

সে অগ্রসর হইতে লাগিল—লোকটাও তার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া সে দেখিতে পাইল—একটা শালবন, আর সেই শালবনের মধ্যে একটা দোতালা কুঠিবাড়ি আছে। সে মনে করিল, আজ রাতটা এই কুঠি-বাড়িতে কাটাইয়া দিবে।

বিমল একটা শালগাছের তলে বসিয়া পড়িয়া নিকটের গ্রাম হইতে কিছু চিড়া মুড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য লোকটার হাতে পয়সা দিল!

লোকটা চলিয়া গেলে সে বাড়ীটার ভিতরে প্রবেশ করিল। নীচের তালা ভাঙিয়া পড়িয়াছে—যেটুকু বা ভাল আছে, সেখানে নানা জাতীয় আবর্জ্জনায় পূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই-যে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি ভাঙিয়া পড়ে নাই। সে দোতালায় উঠিল। দোতালাতে একটা বড় হল ঘর;—ছাদের খানিকটা ভাঙিয়া পড়িয়া অনাবৃত আকাশ দেখা যাইতেছে—বাকি অংশে ছাদের আবরণ আছে—সেখানে রাত কাটানো যাইতে পারে বটে! সে রাত্রে শুইবার জন্য খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইল।

যখন সে নীচে নামিয়া আসিল তখন শীতের হ্রস্বদিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, সূর্য্য ডুবিবার মুখে, চারিদিকে কুয়াশার আভাস জমিয়া উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা চিড়া মুড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিল—বিমল সামান্য কিছু লইয়া বাকি সব লোকটাকে দিল।

লোকটা শুধাইল—খাওয়া তো করলে—রাত কাটবে কোথাগো ?

বিমল বলিল—এই বাড়ীটার দোতালায় আজ রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবো !

তার প্রস্তাব শুনিয়া লোকটা চমকিয়া উঠিল, বলিল—সে কিগো ! হেথা বড় ভয় !

বিমল বলিল—ভয় ! কিসের ভয় ! চোর ডাকাত নাকি ?

লোকটা বলিল—চোর ডাকাত কেনে ?

—তবে কি ? ভূতপ্রেত ?

লোকটা যেন নিজের মনে মনে উত্তর করিল—কি জানি গো ! লোকে তো কত কি বলে !

বিমল তাকে আশ্বাস দিল। বলিল—ভয় নেই। চোর ডাকাতে আমার কি করবে ? টাকা কড়ি নেই ! আর ভূতপ্রেত ! মন্দ কি ! কখনো দেখিনি—দেখা যাবে।

লোকটা কি আর বলিবে—নিজের মনে কি যেন বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতে লাগিল।

বিমল বলিল—কাল সকালে তুমি এখানে এসো—তোমাকে নিয়ে ঐ খেজুরীতে যাবো—পয়সা পাবে।

লোকটা স্বীকার পাইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে ছায়ার মত মিলাইয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

বিমল রাত্রি কাটাইবার জন্য বাড়ীটার দোতালায় গিয়া উঠিল।

দোতালার ছাদের আবরণের তলে একখানা কম্বল বিছাইয়া থলিটা মাথায় দিয়া সে শুইয়া পড়িল। সারাদিনের ক্লান্তি ও অনাহারে ঘুম আসিতে তার এক মুহূর্ত্তও লাগিল না।

মাঝরাত্রে তীব্র শীতে বিমলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙিয়া বুঝিতে পারিল না—সে কোথায় আছে! মনে হইল মাথার উপরে বিরাট একটা কালো গম্বুজ—আর তার গায়ে উজ্জ্বল সব ফুলকাটা! এ কোথায় সে আসিয়া পড়িয়াছে—চারিদিক এমন নিস্তব্ধ। তার মনে হইল মৃত্যুর পরে হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে মানুষের বোধ করি এইরূপ মনের অবস্থা হয়।

ক্রমে ক্রমে বাস্তববোধ তার জাগ্রত হইতে লাগিল—সন্ধ্যাবেলা সে একটা ভাঙা বাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! তবে ও গম্বুজটা কি? ঠিক্, এতক্ষণে সে বুঝিতে পারিয়াছে। ওটা আর কিছু নয়। ছাদের ভাঙা অংশ দিয়া খানিকটা আকাশ দেখা যাইতেছিল,—সেই আকাশ, আর ওই উজ্জ্বল ফুলকাটা চিহ্নগুলি, সেই আকাশের তারা। কাছে গ্রাম নাই—চারিদিকে শালবন আর মাঠ, নিস্তব্ধ তো হইবেই!

ঘুম আর আসিল না—শুইয়া শুইয়া সে আকাশের তারাগুলি দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সেদিকে তাকাইয়া থাকিবার পরে হঠাৎ তার মনে হইল তারাগুলি যেন অত্যন্ত নিকটে, ঠিক ছাদের উপরেই; আকাশটাকে এতদিন ধরিয়া যতদূরে সে মনে করিয়া আসিয়াছে, মোটেই ততদূরে নয়!

ক্রমে মনে হইল তারাগুলাকে যত ছোট মনে হয় তত ছোট তারা নয়; আকার তেমনি ছোটই আছে—অথচ প্রকাণ্ড বিরাট মনে হইতেছে—এবং তাদের ভীমঘূর্ণন অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

তার মনে হইল এত যুগ ধরিয়া যারা ভৈরবীচক্রে সমাহিতের মত

বসিয়াছিল হঠাৎ তারা এইবারে উঠিয়া ভীমতাণ্ডব আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ও দেখিতে দেখিতে, ভাবা ও দেখা এক হইয়া গিয়াছিল, বিমলের বিষম ভয় করিল; কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

সে নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—ভয় কিসের? ভয় কিসের?

তার মনের মধ্য হইতে, কিম্বা ওই তাণ্ডবের আসরের একান্ত হইতে কে যেন উত্তর দিল—না, না, এ রকম করিয়া হইবে না! তুমি প্রকৃতির লীলা দেখিতে চাও? তবে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ কর। প্রকৃতির রহস্য যদি ভেদ করিতে চাও, তবে মানুষের সম্পর্ক ছেদ কর! সংসারও রাখিয়াছ আবার প্রকৃতিকেও চাও, এমন দুই নৌকায় পা দিয়া যাত্রা করিবে এ তীর্থ তেমন সৌখীন নয়। মানুষকে ছাড়ো—প্রকৃতিকে পাইবে। এক সঙ্গে দুই সত্তাকে পাওয়া যায় না, কেহ কখনো পায় নাই।

কোথা হইতে কে যেন অশ্রুকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—প্রকৃতিকে দেখিয়া এমন ভয় পাইবে কখনো ভাবিতে পারো নাই! এতদিন প্রকৃতিকে দেখিয়াছিলে তোমার ফুলের বাগানের মধ্যে; তোমার বাগানের গোলাপফুলের আড়াল হইতে তার প্রসন্নমুখটি জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে সৌন্দর্য্য তোমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত কিন্তু যে-সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভীতি সঞ্চার না করে তাহা সৌন্দর্য্যই নয়! যে সৌন্দর্য্য এক সঙ্গে চিত্তে নবরসের প্রস্রবণ খুলিয়া দেয়—তাহাই তো সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির এই ধুলোটে যদি যোগ দিতে সাহস থাকে তবে নিঃসপত্ন হইয়া অগ্রসর হইয়া এস; ভৈরবীচক্রের সুরার কিছু অবশিষ্ট সর্ব্বদাই থাকিয়া যায়, তাহা পান কর—মানুষকে ছাড়ো, প্রকৃতিকে পাইবে!

বিমলের কপাল বহিয়া দর দর করিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। তার মনে হইল তাণ্ডবরত ওই তারার দল ক্রমশঃ প্রকটতর, বিকটতর,

ভীষণতর হইতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ বিশ্বকর্ম্মার বিরাট কুম্ভকারের চাকার ন্যায় ঘুরিতেছে—এবং ঘুরিতে ঘুরিতে বিশাল একখানা সুদর্শনচক্রের ন্যায় তার দিকে অগ্রসর হইতেছে! সে আর পারিল না—আতঙ্কের আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া দ্রুতবেগে দোতলার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া শালবনের মধ্যে প্রস্থান করিল।

একটা শালগাছের গোড়ায় সে বসিয়া পড়িয়াছিল; চোখ খুলিতে সাহস হইতেছিল না, পাছে সেই ভৈরবদৃশ্য আবার চোখে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে ভয় কিছু কমিলে, ঘাম শুকাইলে সে চোখ মেলিল—দেখিল চিরদিনকার তারার ফোটামারা আকাশ নিস্তব্ধ, সেখানে আতঙ্কের কিছুই নাই—কখনো ছিল বলিয়াই মনে হইল না!

সে ভাবিল আর ওখানে নয়। কোপাই-এর উৎস দেখা তার অদৃষ্টে নাই—নতুবা এত কাছে আসিয়া সে এমন বিষম তাড়া খাইতে যাইবে কেন?

সে ভাবিল—স্বপ্নই হোক, আর সত্যই হোক, ঠিক কথাই সে শুনিয়াছে! প্রকৃতির সাধনা এমন সৌখীন সাধনা নয়। মানুষও থাকিবে প্রকৃতিকেও পাইব এমন হয় না—সব ছাড়িলে তবেই সব-পাওয়া যায়; পিছনে টান তার এখনো আছে—তাই সম্মুখে এমন বাধা! উৎসের কাছে আসিয়াও তার দর্শন মিলিল না!

সে স্থির করিল আর অগ্রসর হইবে না—এমনি বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া যাইবে।

তখনি সে ফিরিয়া রওনা হইল। মাথার উপরে চাহিয়া দেখিল শাল-বনের পাতার আড়ালে আড়ালে তারাগুলি কখন দেখা যাইতেছে, কখনো যাইতেছে না; কখনো মিলাইতেছে কখনো জাগিতেছে—যেন সমস্ত আকাশখানাই নড়িতেছে।

যে-পথে সে আসিয়াছিল, সেই পথে আবার সে ফিরিয়া চলিল—এমন কি থলি ও কম্বল লইবার কথাও মনে জাগিল না।

সকালবেলা সেই লোকটা বিমলের খোঁজে আসিল; সে দেখিল থলিকম্বল পড়িয়া আছে, লোকটা কোথাও নাই; বোধকরি তার জীবনহানি ঘটিয়াছে। বাড়ীটাতে যে ভয়ের কারণ আছে—তার নূতন একটা প্রমাণ সে সংগ্রহ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গেল—থলিকম্বল স্পর্শও করিল না।

৯

পরদিন দুপুরবেলা বিমল বাড়ী পৌঁছিল। এই পথ যাইতে তার পনেরো দিন লাগিয়াছিল, কিন্তু এবারে ফিরিবার পথে রেলে আসিয়াছে।

ফুল্লরা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

শুধাইল—একি! খবর নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ!

বিমল বলিল—যাবার সময়েও তো হঠাৎই বেরিয়েছিলাম!

ফুল্লরা হাসিয়া শুধাইল—উৎসের সন্ধান পেলে?

বিমল বলিল—সে কথা পরে বল্‌বো এখন!

ফুল্লরা তার স্নানাহারের আয়োজন করিতে উঠিয়া গেল।

*   *   *

এই কয়দিন ফুল্লরার মধ্যে একটা গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, কিম্বা পরিবর্ত্তন সুরু হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের আগে ফুল্লরা প্রেমের যে-আভাস পাইয়াছিল, বিবাহের পরেও তার জীবন সেই পথে চলিবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু তার পরে সব যেন কেমন ওলট-পালট হইয়া গেল। যে-নদী স্বাভাবিক পথে চলিলে সংসারকে শ্যামল ও পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিতে পারিত, সে যেন কেমন করিয়া পাষাণের রন্ধ্রে গিয়া ঢুকিল। সেখান হইতে বাহির হইবার জন্য সে কি কাকুতি! কিন্তু পথ সঙ্কীর্ণ! তাই সে প্রেম ফেনাইয়া, ফুঁপাইয়া জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

অধিকাংশ বিবাহিত নারীর পক্ষেই এমন ঘটিতে পারে, কারণ

প্রাক্-বিবাহ ও বিবাহোত্তর প্রেমে এমন অসামঞ্জস্য যে মোহভঙ্গ না ঘটিয়া উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃতি দয়াশীলা মোহভঙ্গের পূর্ব্বেই সংসারের নানা জাতীয় দাবী আসিয়া মন অধিকার করিয়া বসে; সন্তানসন্ততির নূতনতর আকর্ষণ মনকে অন্যপথে লইয়া যায়, সংক্ষেপে প্রণয়িনী অল্প দিনের মধ্যেই জননী ও গৃহিণী হইয়া পড়ে—ফলে জীবন হইতে প্রেমের গুরুত্ব চলিয়া যায়, মোহ ভাঙিল কি ভাঙিল না সে দিকেও বড় নজর থাকে না। অধিকাংশের জীবনেই স্বল্পধারাপ্রেম সরস্বতী নদীর মত মানসচিত্রে ক্ষীণ একটা চিহ্নমাত্র রাখিয়া বালুর মধ্যে অন্তর্দ্ধান করে। দম্পতী যখন পরস্পর প্রেমপ্রতিশ্রুতি করে, তখন তারা জানিতেও পারে না যে নিজেদের অজ্ঞাতসারে তারা মিথ্যা কথা বলিতেছে।

বোধকরি ইহাই ভাল—এবং সেইজন্যই প্রকৃতি বিশুদ্ধ প্রেমের দাবীকে আর দশটা দাবী দিয়া ঢাকিয়া দিয়া থাকে—নতুবা মোহভঙ্গের পালা চলিতে থাকিলে কোথায় থামিত! সংসার সুদ্ধ ক্ষেপিয়া পাগল হইয়া যাইত—একদিনে সৃষ্টিনাশ হইত।

কিন্তু যার ভাগ্যে এই সর্ব্বনাশকর মোহভঙ্গ ঘটে তার সর্ব্ব সুখে আগুন। ফুল্লরা সেই জীবনদাহী অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়াছে!

বিমলের অমনোযোগ প্রথমে তার ভালই লাগিত; ভাবিত ইহাই বুঝি প্রেমের রীতি। তারপরে সে অভিমান করিতে লাগিল, কিন্তু অভিমানের টানে তেমন করিয়া কই বিমলের মন সাড়া দিল! শেষে তার মনে ক্রোধ, সন্দেহ, বিরক্তি আসিল; সব শেষে বিষম নৈরাশ্য!

এই নৈরাশ্যের প্রান্তে নারীর সম্মুখে দুইটি পথ সাধারণতঃ দেখা দিয়া থাকে—সে পরপুরুষাসক্ত হইতে পারে; তাকে ভালবাসে বলিয়া নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরকে সে ভালবাসে না; স্বামীকে ভালবাসে

বলিয়াই সে অপরের প্রতি আসক্ত হয়; প্রেম প্রতিদানপ্রত্যাশী, ভালবাসা ফিরিয়া না পাইলে মনে বিকার জন্মে; অপরকে ভালবাসা প্রেমের বিকারমাত্র।

আর যে-নারী বিপস্থিনী না হয়, খুব অল্প নারীই কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হইয়া থাকে, প্রকৃতি এখানেও দয়াশীলা, সে জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ের পুটপাকে দগ্ধ করিতে থাকে; সেই তাপে নিজেও দগ্ধীভূত হয়।

সহস্র স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা গঠিত জীবনব্যাপারের উপর মানুষের সচেতন অধিকার অতিশয় ক্ষীণ; সচেতন প্রয়াসে আমরা যাহা করিতেছি, জীবনের অচেতন অংশে তার অনুরূপ একটা প্রতিক্রিয়া নিরবধি চলিতেছে। যতক্ষণ এই সচেতন ও অচেতন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে ততক্ষণ মানুষ প্রকৃতিস্থ, এই সমন্বয়ে বিরোধ ঘটিলেই উন্মাদ রোগের সীমানার মধ্যে মানুষ আসিয়া পড়ে। প্রেমের ব্যাপারে এই সমন্বয় যেমন শীঘ্র ভাঙিয়া পড়ে এমন আর কিছুতে নয়।

প্রথম পন্থাটি ফুল্লরা গ্রহণ করে নাই—অধিকাংশ নারীই করে না!

ফুল্লরার অস্তিত্বে এতদিন ধরিয়া সচেতন ও অচেতন প্রয়াসের দড়ি টানাটানি চলিতেছিল; সমন্বয় ভগ্নপ্রায় হইয়াও ভাঙে নাই। কিন্তু গত পনেরো দিনের মধ্যে তার অস্তিত্ব এই প্রক্রিয়ার চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; প্রকৃতিস্থতার সীমানা অতিক্রম করিয়া উন্মাদ রোগের প্রান্তে আজ সে উপনীত।

বিমলের মনে ধীরে ধীরে দারুণ নৈরাশ্য দেখা দিতে লাগিল। সে প্রকৃতিকে পাইল না, মানুষকেও হারাইল। সে রাত্রির অভিজ্ঞতা তার কাছে এই দ্বন্দ্বের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কোপাই তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিমলকে পরীক্ষা করিল—সে পরীক্ষায় বিমল উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। সে বুঝিতে পারিল পিছনের টান এমন ভাবে আছে যে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। সে আর্ত্ত পশুর মত ছুটিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল!

কিন্তু সেখানেই বা শান্তি কোথায়? তার মনে হইল তার মত এমন হতভাগ্য সংসারে আর নাই। এই বিফলতার সমস্ত ক্রোধ ফুল্লরার উপরে গিয়া পড়িল—এবং অবশেষে ফুল্লরা হইতে প্রেমের উপরে পড়িল!

তার মনে হইল সংসারে প্রেমের মত এমন ফাঁকি কমই আছে।

কাব্যে কাহিনীতে প্রেম কেমন অলৌকিক মোহসৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছে! যেন তার চেয়ে উচ্চতর ও পবিত্রতর আর কিছু মানুষে কল্পনাই করিতে পারে না। ভগবান মানুষের উচ্চতম কল্পনা, সেই ভগবানকে বুঝাইতে হইলে মানুষে প্রেমের সঙ্গে তুলনা করে।

অথচ বাস্তবে প্রেমের প্রকৃতি কত ভিন্ন! তৃতীয় পক্ষের সম্মুখে প্রেমের আলোচনা করা ভদ্ররীতি বহির্ভূত; আর সে আলোচনাতেই বা কত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শ্লীলতা অশ্লীলতার সীমা বাঁচাইয়া চলিতে হয়। বস্তুতঃ তাহা কদর্য্য বলিয়াই কি তার উপরে আদর্শবাদের রং চড়ানো হইয়া থাকে! মূলতঃ তাহা অশ্লীল বলিয়াই কি কাব্যে কাহিনীতে তাহাকে এমন সুন্দর করিয়া তোলা হইয়াছে।

পশুপাখী নিজেরা কাব্যকলা রচনা করিতে পারে না বলিয়া প্রকৃতি নিজ হইতে প্রেমের পথ রঙীন করিয়া দিয়াছে। ময়ূরকে পেখম দিয়াছে, কোকিলকে সঙ্গীত দিয়াছে। আর মানুষে কি না উন্নততর জীব, তাই তারা পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ, মিলন, মান-অভিমানের সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রেমের বীভৎসতার উপরে কাব্যকলার কিঙ্খাব-আস্তরণ ঢাকিয়া দিয়াছে।

বিমলের মনে হইল শুধু কবি কলাবিদ্‌দের দোষ দিলে অন্যায় হইবে! মানুষের সমগ্র সৃষ্টির মূলপ্রয়াস প্রেমের স্বরূপ আবরণ! সে কতবার কলিকাতার বড় বড় দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে সাজসজ্জা আসবাবপত্রের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আজ সেই সব স্মৃতি নূতন অর্থ লইয়া দেখা দিতে লাগিল!

কত রকমের পোষাক! কত ধরণের শাড়ী, কত অলঙ্কার, কত প্রসাধনবস্তু, কত পাদুকা! আজ তার মনে হইল সে সবের পনেরো আনাই নারীর জন্য সৃষ্ট! ওই যে পায়ের নখরঞ্জনরস হইতে সিঁথির অলঙ্কার—সকলেরই উদ্দেশ্য এক, নারীকে মনোহর করিয়া তুলিতে হইবে!

বিমল ভাবিতে লাগিল নারীকে মনোহর করিবার প্রয়াস কেন? সে কি স্বভাবতঃ মনোহর নয়? স্বভাবতঃ মনোহর সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রেম এতই বীভৎস যে কেবল স্বাভাবিক মনোহারিত্বের উপরে নির্ভর করিলে চলে না; নারীদেহকে হাতেগড়া সৌন্দর্য্যের আবরণে মণ্ডিত করিয়া দিলে তবে স্বস্তি।

কিন্তু কিসের জন্য এত সৌন্দর্য্যপ্রয়াস? নইলে যে সৃষ্টিরক্ষা হয় না, জীবধারা লুপ্ত হয়। প্রেমকে মনোরম করিয়া না তুলিলে পুরুষ ভুলিবে কিসে? প্রকৃতি চায় জীবধারা সন্তত হোক, প্রকৃতি যতটা পারে সাহায্য

করিতেছে, প্রকৃতি যেখানে অপারগ মানুষে সেখানে তুলি, লেখনী, সূচী, তক্ষণ লইয়া বসিয়াছে ; সেদিক দিয়া তো শিল্পীরা প্রকৃতির সহকারী।

কিন্তু তখনি বিমলের মনে হইল জীবধারাকে রক্ষা করিতেই হইবে এমন কি কথা আছে ?

পদার্থবিজ্ঞান বলে পৃথিবী একদিন শীতল হইয়া যাইবে—জীবজগৎ লোপ পাইবে। রসায়ন বলে যে-রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ত চলিতেছে, তার পরিণাম পৃথিবীর মৃত্যু—জীবজগৎ কোথায় থাকিবে!

ভূ-তত্ত্ব বলে একদা এই পৃথিবী জীবধারণের উপযোগী ছিল না—আবার একদা ইহা জীবধারণের অনুপযোগী হইবে। নৃ-তত্ত্ব বলে মানুষ জীবশৃঙ্খলের গোটা কয়েক গাঁট, আগেও ছিল না, পরেও থাকিবে না। জীবতত্ত্ব বলে অসীম ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর এই বালুকণাটির উপরে কি করিয়া যে জীবসৃষ্টি হইল ভাবিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু ভাবিবারই বা এমন প্রয়োজন কি! এ জীবলীলা দীর্ঘকালের নয়!

সমস্ত বিজ্ঞানই যদি জীবস্থায়ীত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যবহন করে, না, স্পষ্টই তারা বলে যে জীবধারা লুপ্ত হইবে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম—তবে মানুষে জীবধারাকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যস্ত কেন? বিজ্ঞান যে-পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে নীতি ও দর্শন তাহাকে সমর্থন করিবে না কেন? আর নীতি ও দর্শন হাজার চেষ্টা করিলেও কি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকেই উল্টাইয়া দিতে পারিবে? তা যদি না পারে, বিনাশই যদি ধ্রুব হয়, তবে এই ব্যর্থপ্রয়াস কেন? তবে এত অকারণ শিল্পসৃষ্টি কেন? কাব্যকাহিনী কেন? মৃতের মুখে প্রসাধনপ্রলেপ কেন? নারীকে মনোরম করা কেন? প্রেমকে আদর্শ বলা কেন? ভগবানকে—কি জানি, এমন নারকীয় তাণ্ডবের মধ্যে ভগবান্ যে আছেন তারই বা নিশ্চয়তা কি? এইখানে আসিয়া বিমলের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইত! এতক্ষণ

ধরিয়া যে চিন্তাসোপান সে অনুসরণ করিয়া আসিল, তার পরবর্ত্তী ধাপ আর সে দেখিতে পাইত না। যে শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করিয়া অনায়াস গতিতে সে চলিয়া আসিতেছিল তার পর্য্যায়চ্ছেদ হওয়াতে সে সচকিত হইয়া উঠিত, বাস্তবের মধ্যে জাগিয়া উঠিত।

তার মনে হইত—এতো গেল চিন্তাজগতের ব্যাপার! ইহার সমাধান হইলেই বা কি না হইলেই বা কি? আসল ঘটনা তেমনি জটিল রহিয়া গিয়াছে। সে জটিলতার ছেদ করিবার শক্তি কি আছে? কারো কি আছে? হঠাৎ যদি হইয়া যায় তো গেল। বিমলের কি তেমন সৌভাগ্য হইবে?

১১

এখন হইতে বিমল-ফুল্লরার জীবনের গতি তির্য্যকভাবে চলিতে লাগিল—আর যতই দিন যাইতেছিল ততই তারা পরস্পর হইতে অধিকতর দূরে গিয়া পড়িতেছিল। এর আগেও যে তাদের জীবনে মিল ছিল এমন নয়; তখন তাদের গতি ছিল সমান্তরাল, মিলন সম্ভব না হইলেও মৌলিক দূরত্ব রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল।

তবু বাহিরের দিক হইতে তাদের সাংসারিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবার উপায় ছিল না। মানুষ যতই ইচ্ছা করুক না কেন, প্রাত্যহিক অভ্যাসচক্রের আবর্ত্তনে মানুষ এতই অভ্যস্ত যে হঠাৎ তাহা ছিন্ন করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সাংসারিক জীবরূপে তারা সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মানুষ তো কেবল সাংসারিক জীব নয়! যেখানে তারা সংসারোত্তর সেখানে প্রতিদিন তাদের প্রভেদ বাড়িতেছিল।

উভয়পক্ষ হইতেই এখন কথা বলার প্রয়োজন যনিষ্ঠতমে নামিয়া আসিয়াছে। সংসারে প্রয়োজনের কথা আর কয়টা! প্রয়োজন ছাড়াও কথা বলিতে পারে বোধকরি ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

তাদের মিলনের প্রথম অন্তরায় উভয়পক্ষের মোহভঙ্গ! তারা পরস্পরে চোখের দিকে তাকাইয়া নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে যেন বলিতে থাকে, তোমার মনে এই ছিল! প্রেমের স্বরূপ যে এইরূপ তাহা আগে বল নাই কেন? জানিতে না? তবে জানিবার ভাণ করিয়াছিলে কেন? জানিতে? তবে আর তোমাকে বিশ্বাস করি কি ভাবে? একবার ঠকিয়াছি, আর ঠকিতে চাই না!

চোখের ভাষা যাহাই হোক, মুখে ফুল্লরা বলে—আজ কালো গোরুর দুধ বাছুরে খেয়ে ফেলেছে।

সংসারের কর্ত্তা বিমল বলে—বাছুর বেঁধে রাখেনি কেন?

সংসারের গৃহিণী ফুল্লরা বলে—মিতনের আজ ঘুম থেকে উঠ্‌তে দেরী হ'য়ে গিয়েছিল।

বিমল বলে—মিতন ক্রমেই কাজের অযোগ্য হ'য়ে পড়ছে।

ফুল্লরা বলে—বয়স তো হচ্ছে!

সংলাপ এখানে থামিয়া যায়—ফুল্লরা চলিয়া যায়, দুইজনে মনে মনে বলিতে থাকে—বৃথা! বৃথা!

আবার কোনদিন বা ফুল্লরা আসিয়া বলে—আজ একবার বোলপুর বাজারে গেলে হ'ত।

সংসারের কর্ত্তা বিমল শুধায়—কেন?

সংসারের গৃহিণী ফুল্লরা বলে—অনেক জিনিষ কিনতে হ'বে।

বিমল বলে—মিতন গেলেই চলবে।

ফুল্লরা বলে—ওর বয়স হ'য়ে পড়ছে—এখন আর ও আগের মত খাট্‌তে পারে না!

মিতনের বয়সের প্রশ্ন যেন কখনো বিমলের মনে উদয় হয় নাই-এমন ভাবে সে বলে—বয়স! এমন আর কি বয়স হ'ল। ওকে পাঠাও।

ফুল্লরা চলিয়া যায়, দুইজনে মনে মনে বারংবার বলিতে থাকে—বৃথা বৃথা! বৃথা!

ক্রমে এমন হইল যে পরস্পরকে দেখিলেই তাদের মনে যুগপৎ ঘৃণা বিরক্তির ভাব উদিত হইত। অন্যের সঙ্গে তারা বেশ কথা বলিতেছে মন প্রফুল্ল আছে, এমন সময়ে পরস্পরে দেখা হইল—মেজাজ খারাপ হই

উঠিল—যে-বেচারার সঙ্গে এতক্ষণ হাসিয়া কথা হইতেছিল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বিদায় করিয়া দিল।

বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া মিতন একমাত্র তৃতীয়পক্ষ, কাজেই তাকেই সব চেয়ে বেশি এইভাবে তিরস্কৃত হইতে হইত।

সেদিন ফুল্লরা মিতনের কাছে বসিয়া জমির ধানের হিসাব লইতেছিল।

মিতন বলিতেছিল—দিদি ঠাকরুণ, এবারে জল হ'ল না, ধান তো কিছু কম হবেক বটে।

ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না, কারণ জল যে এ বছর কম হইয়াছে তা ফুল্লরাও জানে।

এমন সময়ে সেখানে বিমল আসিয়া পড়িল। সে মিতনের শেষের উক্তিটা শুনিয়াছিল। অকারণে সে রাগিয়া গিয়া বলিল—বর্ষা কি কেবল আমাদের জমিতেই এবারে কম হ'ল?

মিতন চমিকয়া শুধাইল—কেন দাদাবাবু?

বিমল বলিল—তাছাড়া কি! পোদ্দারদের জমিতে পুরো ধান হ'ল, হরিহরের জমিতে পুরো ধান হ'ল, আর আমাদের জমিতেই কম!

মিতন বিস্ময়ের ধমক সামলাইয়া লইয়া বলিল—পোদ্দার মিছে করে' বলেছে—এবারেও সিকি ধানও পায়নি, আমাকে জব্দ করবার জন্মই ও বললেক। আমি ওকে দেখেলিব!

পোদ্দারকে দেখিবার জন্য মিতন উঠিয়া পড়ে আর কি! ফুল্লরা অনেক বলিয়া তাকে বসাইল।

পোদ্দার ও হরিহরের জমিতে যে পুরো ধান হইয়াছে, ইহা বিমলের অনুমান মাত্র। অনুমানের উপর প্রমাণ চাহিয়া বসিলে সাধারণতঃ চটিবারই কথা! বিমল অত্যন্ত চটিয়া মিতনকে গালাগালি করিয়া

বাহির হইয়া গেল। মিতন কিছুক্ষণ দম ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল—দিদি ঠাকরুণ, আমাকে এবার ছুটি দাও!

ফুল্লরা শুধাইয়া—ক-দিনের?

মিতন বলিল—আর আমি কাজ করবেক্‌নি!

ফুল্লরা বিস্মিত হইয়া শুধাইল—যাবি কোথায়?

মিতন বলিল—বাড়ী!

এবারে ফুল্লরা হাসিয়া ফেলিল—বলিল—বাড়ী? তোর আবার বাড়ীঘর কোথায়?

ঝোঁকের মাথায় মিতন বাড়ী যাইবার কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন মনে পড়িয়া গেল তার বাড়ী-ঘর আত্মীয়স্বজন কেউ নাই; ইহাই তার বাড়ী এরাই তার আত্মীয় স্বজন। সে আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

*　　*　　*

রাত্রিতে বিমল ফুল্লরা একই শয্যায় শোয় বটে, মাঝখানে থাকে একটা পাশবালিশ; সে পাশবালিশ এখন হিমালয়ের দুর্ভেদ্যতা লাভ করিয়াছে। ফুল্লরা বিমল নিজের নিজের স্থানে আসিয়া শোয়, কোন কথাবার্ত্তা হয় না; দুইজন দুইদিকে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়ে; আবার ভোরবেলা দুইজনে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যায়।

কদাচিৎ রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেলে বিমল দেখে ফুল্লরা ঘুমাইয়া আছে, জানালা দিয়া জ্যোৎস্নাখণ্ড আসিয়া তার দেহের উপরে পিছলিয়া পড়িয়াছে। স্বাস্থ্যসম্পন্ন পরিপূর্ণযৌবনের কানায় কানায়-ভরা শ্লথবস্ত্র সৌন্দর্য্যের উপরে লঘু জ্যোৎস্নার অমৃতচন্দ্রলেপ! বিমল চাহিয়া দেখিত বটে কিন্তু ফুল্লরা পাষাণমূর্ত্তি হইলেও বোধকরি ইহার বেশি বিমলের মনকে

আকর্ষণ করিতে পারিত! সে অবলীলা ক্রমে চোখ ঘুরাইয়া লইয়া বাহিরের জ্যোৎস্নার দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিত!

কোনদিন বা রাত্রে ফুল্লরা ঘুম ভাঙিয়া দেখিত পাশে বিমল ঘুমাইয়া আছে। একবছর আগে এভাবে ঘুম ভাঙিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনের ঘুম ভাঙিবার উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইত! কিন্তু আজ সে সব স্মৃতি বোধহয় তার মনেও পড়ে না! সেই বলিষ্ঠ সুখসুপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া কখনো যে তার মনে আন্দোলন জাগে না তা নয়, কিন্তু কোথা হইতে অদম্য নিষেধ আসিয়া তার শরীরমনকে জড়বৎ করিয়া ফেলে—চিত্তের বেদনা অঙ্কুরেই বিলীন হইয়া যায়—সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

কখনো বা মাঝরাতে বিমল অনুভব করে—নিদ্রিত ফুল্লরার এক খানা হাত তার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—পাছে সে জাগিয়া ওঠে, এই ভয়ে সে হাত না সরাইয়া নিজেই ধীরে সরিয়া যায়! কখনো সরিবার স্থান না থাকিলে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে হাতখানি অন্যত্র স্থাপিত করিয়া দেয়। একদিন এই হাতের পাঁচ আঙুল তার মনে দাবানলের শিখা জ্বালিয়া দিত—আর আজ! পাথরের হাত হইলেও বোধ হয় মানুষের মনকে বেশি স্পর্শ করিত। পাথরের মূর্ত্তি কি সুন্দর হয় না? ফুল্লরার দেহেও সৌন্দর্য্য আছে কেবল যে কেন্দ্রে মন অধিষ্ঠিত থাকিলে সৌন্দর্য্যগ্রহণ সম্ভব হয়, বিমলের মন সেই কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছে।

১২

বিমল নিয়মিত ভাবে কোপাই-এর তীরে গিয়া বসিত, কিন্তু আগের শান্তি সে আর পাইত না। প্রকৃতি যেন তার প্রসন্নমুখ অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে!

সে ভাবিত তার এই জীবনব্যাপী অশান্তির মূলে কি? মনে মনে চিন্তা তর্কের পরিণাম গিয়া দাঁড়াইত বিবাহে। বিবাহের জন্যই কি তার এই অশান্তি! এই ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্ট ভাব! কিন্তু বিবাহের আগে যখন সে ফুল্লরাকে ভালবাসিল, তখন তো প্রকৃতি এমন কৃপণ হইয়া দেখা দেয় নাই—তার প্রসন্নমুখ এমন অবগুণ্ঠনে আবৃত করে নাই।

তার মনে হইল প্রাক্-বিবাহের রোমাণ্টিক প্রেমের মধ্যে এমন উগ্রতা আছে, যা মানুষের চিত্তকে অভিভূত করিয়া মানুষের কাছে টানিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু সেই রোমাণ্টিক প্রেম যখন বিবাহের বাসরগৃহ হইতে বাহির হইয়া সংসারের প্রাত্যহিক আবর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া পড়ে—তখন তার রং ফিকা হইয়া আসে, উগ্রতা কমিয়া যায়. তখন সে না পারে মানুষকে মানুষের কাছে টানিয়া রাখিতে, না পারে হৃদয়ের উপরে শান্তির প্রলেপ দিতে!

প্রকৃতির প্রতি অন্ধ একটা আকর্ষণ—বাল্যকাল হইতেই তার ছিল, কিন্তু সে বরাবর প্রকৃতি হইতে দূরে ছিল। এবারে গ্রামে আসিয়া যুগপৎ প্রকৃতির ও নারীর আকর্ষণে পড়িয়াছিল। ফুল্লরার প্রাক্‌বিবাহ উগ্র প্রেম তাকে প্রকৃতি হইতে খানিক পরিমাণে বিবিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল—কিন্তু সে মূঢ়, সেই প্রেমকে বিবাহের গণ্ডীতে ফেলিয়া সাংসারিক করিয়া তুলিল—ফলে সে প্রেমের মোহ কমিয়া গেল—প্রকৃতির আকর্ষণ উগ্রতর

হইয়া উঠিল; কিন্তু শেষপর্য্যন্ত এমনি তার অদৃষ্ট খারাপ যে প্রকৃতিও ধরা দিল না, মানুষও ছাড়িয়া গেল!

বিমলের মনে হইল প্রেমকে বিবাহের ভিত্তি করাতেই সংসারের যত ট্রাজেডির সৃষ্টি! কেহ কি অপর একজনকে এমনভাবে ভালবাসিতে পারে যে সে-ভালবাসা সারাজীবন স্থায়ী হইবে? এ যেন একটি প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত জীবনকে আলোকিত করিবার প্রয়াস! প্রদীপে তৈল কতটুকু? সলিতার দীর্ঘতাই বা কতখানি? আর সংসারে ঝড় ঝাপটার তো অভাব নাই! না, প্রেম বিবাহের ভিত্তি নয়। প্রেম মানসিক, বিবাহ দৈহিক। দেহে মনে যেদিন সম্পূর্ণ মিল হইবে সেদিন প্রেমও বিবাহের ভিত্তি হইবে। তার মনে হইল—মানুষে দেহমনের যুগল অশ্ব যোগ করিয়া সংসারের রথ চালাইবার হাস্যকর চেষ্টা করে কেন? মানুষের এত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারে কি ইহার উত্তর নাই?

তখনি আবার তার মনে পড়িয়া গেল—যে প্রেমের প্রকৃতি জানে সে এমন ব্যর্থ প্রচেষ্টা তো কখনো করে না! দান্তে তো বিয়াত্রিচেকে বিবাহ করিতে চায় নাই। বিয়াত্রিচের সঙ্গে জীবনে তার কয়বারই বা সাক্ষাৎ হইয়াছিল? কয়টাই বা কথা হইয়াছিল? তবু দান্তের মত প্রেমিক আর কে আছে? আর কাহাকে প্রেম এমন সপ্তস্বর্গের সংবাদ দিয়াছে? আর কাহার কাছে প্রেম এমন জীবনরহস্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছে? দেহের গৃহিণী তার ঘরে ছিল, মনের গৃহিণী তার মনে ছিল—দুইয়ের সমন্বয় করিতে দান্তে কখনো চায় নাই—দান্তে প্রেমের প্রকৃতি জানিত!

আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিরাও এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাই তাঁদের আদর্শ প্রেমিকযুগল—রাধাকৃষ্ণ। সে প্রেমের গৃহ নাই—তাই তাঁর লীলা বৃন্দাবনের বনে; সে প্রেমের সংসার নাই—তাই রাধাকৃষ্ণের

সম্বন্ধ অসামাজিক; সে প্রেমের ভবিষ্যৎ নাই—তাই তারা সন্তান-সন্ততিহীন; সে প্রেম সর্ব্বতোভাবে মানসিক—দেহ সম্পর্ক আদৌ তাহাতে নাই। দান্তে বিয়াত্রিচেরও ছিল না। দান্তে যেমন জানিত, বৈষ্ণব কবিরাও তেমনি জানিতেন!

বিমলের মনে হইল—আহা সে যদি ফুল্লরাকে বিবাহ না করিত! তবে সে ফুল্লরাকে হারাইত না, প্রকৃতিকেও পাইত! কিন্তু এখন কি উপায়! মৃত সতীদেহের মত ফুল্লরার জীবনহীন প্রেমের স্মৃতিকে স্কন্ধে বহন করিয়া কি তার সারাজীবন ভ্রমণ করিতে হইবে? তার অজ্ঞাতসারে কোনো সান্ত্বনার বিষ্ণুচক্র কি সে-ভার ক্রমে লঘুতর করিয়া তুলিবে? ভবিষ্যতের যতদূর তার চোখে পড়িল—দেখিতে পাইল, কোন সান্ত্বনা নাই, কোন আনন্দ নাই, কোন বিশ্রাম নাই—কেবল জড় অভ্যাসের ব্যর্থ আবর্ত্তন।

হঠাৎ তার মনে একটা ভাব চমকিয়া গেল। ফুল্লরার যদি কোন কারণে মৃত্যু হয় তবে সে এই ব্যর্থতার চক্র হইতে বাঁচিয়া যায়। ফুল্লরার মৃত্যুর কথা মনে উদয় হওয়াতে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল! কই, এই দুশ্চিন্তায় তো তার দুঃখ হইল না; ফুল্লরাকে সে হয়তো আর আগের মত ভালবাসে না, কিন্তু তাই বলিয়া সে কখনো তার মৃত্যু কামনাও করে না। কিন্তু এখন তার মৃত্যুর কথা মনে পড়াতে, আশ্চর্য্য, তার দুঃখ হইল না, বরঞ্চ কেমন যেন মুক্তির একটা স্বাদ সে পাইল! ইহাকে আনন্দ বলা চলে না! বহুকাল পরে কারাগার হইতে বন্দী যখন বাহির হইয়া আসে তখন কি তার মনে আনন্দ হয়? বোধ করি নয়; কারণ হয়তো তার বাড়ী-ঘর নাই, আশ্রয় নাই, আহার নাই; সে তখন আনন্দ অনুভব করে না; অদ্ভুত একটা মুক্তির ভাব তার মনে আসে—বিমলও সেইরূপ অনুভব করিল।

বিমল যদি জানিত তবে বুঝিতে পারিত, জীবনে যা অনিশ্চয় তাহাই পীড়াদায়ক; রোগে অনিশ্চয়তা আছে, রোগ পীড়াদায়ক; ধনহীনতায় অনিশ্চয়তা আছে—ধনহীনতা পীড়াদায়ক; দুশ্চিন্তা অনিশ্চয়—দুশ্চিন্তায় পীড়াকর; মৃত্যুর মধ্যে অনিশ্চয়তা নাই—মৃত্যু সবচেয়ে নিশ্চয়; তার াধ্যে একটা সমাপ্তির ভাব আছে; তাহা দুঃখকর, কিন্তু অনিশ্চিয়তার ীড়া তাহাতে নাই। মানুষ অনিশ্চয়কে ভয় করে, দুঃখকে নয়। দুঃখ নাত্মক ভাব, তাহা স্বাত্বিক; দুশ্চিন্তা ঋণাত্মক, তাহা তামসিক; মানুষে ামঃকে যেমন ভয় করে—এমন আর কিছুকে নয়।

সেইজন্য প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে পরিমাণ দুঃখ পাওয়া উচিত মানুষে াধিকাংশ সময়ে তা পায় না। প্রিয়জন নিখোঁজ হইলে যে দুঃখ মরিলে ার অনেক কম দুঃখ। জীবিত বন্ধুর চেয়ে মৃত-বন্ধু অনেক ভাল— ারণ তার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ একেবারে পাকা হইয়া রহিল, তাহাতে দবদলের কোন স্থান নাই; যেমন তার সঙ্গে আর কখনো দেখা হইবে া, তেমনি পরস্পরের ভালবাসাও আর কমিবে না; যেমন সে আর কথা লিবে না, তেমনি সে আর কখনো রাগিয়াও কথা বলিবে না; যেমন ার সম্বন্ধের উপর নূতন রং আর চড়িবে না, তেমনি পুরাতন রং-ও ার কখনো ফিকা হইবে না! জীবনের একি কম সান্ত্বনা! মৃত্যুর কি সামান্য রহস্য!

১৩

ফুল্লরার মৃত্যু কল্পনায় বিমলের মন নূতন একটা চিন্তাসূত্র যেন পাইল। সমুদ্রে যেমন জোয়ারভাটা আছে; এই বিশাল প্রান্তরেও তেমনি অলক্ষ্য একটি ভাবের হ্রাসবৃদ্ধি আছে; সকলের চোখে তা পড়ে না, প্রথমে তো কেহই দেখিতে পায় না, হয় তো আদৌ চোখে দেখিবার মত নয়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে অনুভবগম্য।

প্রত্যুষের জাগরণের জীবনের জোয়ারের চঞ্চলতা কমিয়া আসিতে আসিতে দ্বিতীয় প্রহরের এক সময়ে ভাটার নিস্তব্ধতায় পরিণত হয়; ক্ষণকালের জন্য দিগন্তব্যাপী একটা ক্লান্তি প্রান্তরটিকে অদৃশ্য আবরণে আবৃত করিয়া দেয়।

মাঠের মধ্যে যে-সব গোরু-বাছুর চরে তারা ঘাস হইতে মুখ তুলিয়া নিঃস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, নতুবা গাছের ছায়া খুঁজিয়া গিয়া বসে—রোমন্থন করিতেও ভুলিয়া যায়। রাখাল বালকেরা গা এলাইয়া দেয়; পাখীর কণ্ঠ থামিয়া যায়; পথিক বড় চোখে পড়ে না; আকাশের ঊর্দ্ধতম স্থানে এইমাত্র যে চিলটি উড়িতেছিল সে কখন্ হঠাৎ নামিয়া আসিয়া তালগাছের উচ্চতম শাখাটির উপরে পটের ছবির মত বসিয়া থাকে; নদীর কলধ্বনি স্বগতভাষণ করিতে থাকে; গাছপালায়, গোরু বাছুরে, নদীতে পাখীতে এমন একটা নিঃসাড় নির্জ্জীব ভাব আসে মনে হয় যেন স্বয়ং প্রান্তরলক্ষ্মী ওই বিশাল বটের ছায়ায় আঁচল মেলিয়া দিয়া ক্লান্তি ভরে শুইয়া পড়িয়াছে!

কিন্তু ইহা কেবল ক্ষণিকমাত্র—ভাটার ক্ষণিকতা; আবার আলস্য ভাঙিয়া প্রান্তরলক্ষ্মী জাগিয়া ওঠে; দ্বিপ্রহরের জীবনের জোয়ার আরম্ভ

হয় ; পথিক চলে, পাখী গায়, গোরুবাছুর চরে, গাছপালা নড়ে, নদীর কলধ্বনি আবার কর্ণগোচর হয়।

দ্বিতীয় প্রহরের শেষে আবার ভাটা আরম্ভ হয়। রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষেও এই রকম একটা ভাটার লগ্ন ; দ্বিতীয় প্রহরে আবার জোয়ার আরম্ভ হয়। এই ভাবে জোয়ারভাটায় প্রান্তরের প্রকৃতি তরঙ্গিত ইতে হইতে চলে। অধিকাংশ লোকেই ইহা লক্ষ্য করে না—বিমল এই দৃশ্য নিঃশব্দ জোয়ারভাটার সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত।

সেদিন দিনের বেলায় প্রথম প্রহরের শেষে, এই রকম একটা টার লগ্নে বিমল একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। সে আছে ফুল্লরা ই, ইহাই চিন্তার সূত্র। ফুল্লরা না থাকিলেও যে তার থাকা সম্ভব, রার অস্তিত্বের দ্বারাই যে তার জীবন সীমায়িত নয়, হঠাৎ এহ সত্যটি বিষ্কার করিয়া ফেলিবার পর হইতে সে কেমন যেন এক শান্তি অনুভব রিতেছে।

যদি তাকে চাপিয়া ধরা যায় যে সত্যই সে ফুল্লরার মৃত্যু চায় কিনা শ্চয়ই সে বলিবে, সে চায় না। বিধাতা যদি এমনভাবে তাকে বর তে ইচ্ছা করেন যে সে ইচ্ছা করিলেই ফুল্লরা মরিবে—কেহ তাহা নিতে পাইবে না, ফুল্লরা নয়, অন্য কেহও নয় ; ফুল্লরার কোন কষ্ট বে না, এমন কি বিমলের ইচ্ছাতেই যে তার মৃত্যু হইল তাহাও বিমল লিয়া যাইবে। পাপপুণ্য যদি থাকে, এই ইচ্ছার পাপ পর্যন্ত বিমলকে র্শ করিবে না—তবু নিশ্চয় বিমল ফুল্লরার মৃত্যু ইচ্ছা করিত না।

কিন্তু বাস্তবে ইহা বিমলের পক্ষে এমন দুঃসাধ্য বলিয়াই কল্পনায় ইহা ত্যন্ত সহজ বলিয়া বোধ হইত! সে বারংবার মনে মনে অনুভব রিতে চেষ্টা করিত—ফুল্লরা নাই! ফুল্লরা নাই! তবু সে আছে! স কি স্বাধীনতা! কারাপ্রাচীরের আড়ালে বসিয়া বন্দী বোধ হয় এই

ভাবেই প্রাচীরটার কথা চিন্তা করিয়া থাকে! ওই প্রাচীরের বাইরে আর কোন আশ্রয় আছে কিনা—সে কথা তার মনেও পড়ে না!

বিমল ভাবিত ফুল্লরা নাই। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আর কোন আশ্রয় আছে কিনা, আর কোন সান্ত্বনা আছে কিনা সে চিন্তা করিত না! ফুল্লরা নাই—ইহাই তো চরম সান্ত্বনা!

অনেক সময় সে আত্মজিজ্ঞাসা করিয়াছে, ফুল্লরা নাই—ইহা হয় তো একটা মনোহর মিথ্যার পূর্ব্বাভাস মাত্র, ইহা হয়তো অন্য একটা মনোভাবের ছদ্মবেশ মাত্র! হয় তো আর কাউকে সে ভালবাসে তাই ফুল্লরার না থাকাটাই তার পক্ষে বাঞ্ছনীয়! তখনি সে মনের মধ্যে তাকাইয়া দেখিয়াছে, যতদূর দেখা যায়, সেই বাল্যের দিগন্ত অবধি, না, এমন আর কেউ নাই যাকে সে ভালবাসে! ফুল্লরাকেই সে জীবনে প্রথম ভাল বাসিয়াছে, আর তাকেই বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে।

বোধকরি এর আগে আর কোন মেয়েকে ভালবাসিবার সুযোগ পাইলে ফুল্লরার সঙ্গে তার বিবাহিত সম্পর্ক এমন ট্রাজেডিতে পরিণত হইত না। প্রেমের মোহ এবং মোহের ট্রাজেডি—সেই অভূতপূর্ব্বা প্রথমার উপর দিয়াই কাটিয়া যাইত।

ফুল্লরা নাই, সে আর বিবাহ করিবে না! বিবাহের নিদারুণ অভিজ্ঞতা জীবনের একবারই যথেষ্ট। এখানে মাঠের মধ্যে, অব্যাহত প্রহরের স্রোতে ছেলেদের খেলার নৌকার মত অনায়াসে, অপ্রয়োজনে তার জীবন ভাসিয়া চলিবে। কেহ বাধা দিবার থাকিবে না। কেহ নিষেধ করিবার থাকিবে না— এমন কি গন্তব্য লক্ষ্যও থাকিবে না।

তারপরে মনে হইত—বিবাহ যেন নাই করিবে, কিন্তু আর কাউকে ভালবাসিবে কি?

ভালবাসা? বিমল চমকিয়া উঠিত! স্ত্রীপুরুষের ভালবাসার

অবশ্যগামী লক্ষ্য বিবাহ। মুখে যতই না বল, যতই তাকে মানসিক বল, অশরীরী প্রেম বল'—যে-ভাবেই চলনা কেন ইহার অবশ্য পরিণাম বিবাহের বাসরশয্যা! বিবাহ কেন? কারণ স্ত্রীপুরুষের মিশ্রপ্রেমের তলে দেহ-আকর্ষণ থাকিবেই আর দেহ আকর্ষণকে নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে গ্রহণ করিবার সামাজিকপন্থা বিবাহ!—কাজেই প্রেমের যুক্তিমার্গ বিবাহের সভায় গিয়াছে।

কিন্তু বিবাহহীন প্রেম কি সম্ভব নয়? এত দুঃখের মধ্যেও বিমলের হাসি পাইল! ওসব নেহাৎ কথার কথা! বিবাহের আগে, প্রেমের প্রারম্ভে বাস্তবজ্ঞানহীন নরনারী ওসব কথা বলিয়া থাকে বটে; হয়, না জানিয়া বলে, নয়, অর্দ্ধচেতনভাবে ইহা মিথ্যা জানিয়াও বলে! দান্তেবিয়াত্রিচের পক্ষে হয় তো বিবাহহীন প্রেম সম্ভব—কিন্তু জীবনে দান্তেবিয়াত্রিচে কয়জন! একজোড়া মাত্র! এমন কি এই এককেও অনেকে সন্দেহ করে—সেইজন্য সত্যই বিয়াত্রিচে বলিয়া কেহ ছিল কিনা সে প্রশ্ন আছে—বিয়াত্রিচে নাকি একটা প্রতীকমাত্র!

না, সে আর ভালবাসিবে না। আর ভালবাসিতে হইলে কোপাই-ই যথেষ্ট! সে ভালবাসায় শান্তি আছে! বিমল আর ভালবাসা চায় না, সে শান্তি চায়!

বিমল বলিল—ফুল্লরা পাশের ঘরে আমার বিছানা করে দিও।

ফুল্লরা শুধাইল—কেন ?

অভ্যাসমত সে প্রশ্ন করিল বটে, কিন্তু তারপরেই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিল—আচ্ছা।

বিমল তবু বলিল—এ ঘরটায় বড় গরম।

ফুল্লরার পক্ষে কোন হেতুবাদের প্রয়োজন ছিল না, সে অভ্যাসমত বলিল—তা ঠিক!

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় অন্য ঘরে বিমলের শয্যা প্রস্তুত করিতে গিয়া শূন্য খাটের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে কাঁদিল। মানুষের পক্ষে প্রেম ত্যাগ করা কঠিন নয়, প্রেমের দাবী ত্যাগ করাই কঠিন।

তাদের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া অবিশ্বাসের, সন্দেহের বিরক্তির একটা কুয়াশা জমিয়া উঠিতেছিল। বিমলের মনের কথা পাঠকের অবিদিত নাই—এমন কি ফুল্লরাও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে বিমলকে আর আগেরমত ভালবাসে না। এই চিন্তায় সে যেন কেমন একটা গৌরবমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিত। সত্য কথা বলিতে কি সে যাহা অনুভব করিত তা আনন্দ নয়, অহঙ্কার; বিমল তাকে ভালবাসে না তার প্রত্যুত্তরে সেও যে বিমলকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে—ইহাই অহঙ্কারের কারণ। ফুল্লরা স্বভাবতঃ অহঙ্কারী প্রকৃতির নয়, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই অহঙ্কার তার ভাল করিয়াছিল; বিপদের মধ্যে অহঙ্কার মানুষের অস্তিত্বকে খাড়া করিয়া রাখিয়া দেয়, অহঙ্কার মানুষের মনের মেরুদণ্ড।

কিন্তু সত্যকার ভালবাসার অভাব যে কি ফুল্লরা আজ তা বুঝিতে পারিল—যখন বিমলের শয্যা গৃহান্তরের কথায় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সন্দেহের কুয়াশা উড়িয়া সরিয়া গেল।

ফুল্লরা বিমলের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তার উপরে শুইয়া পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। বহুকাল সে এমনভাবে কাঁদে নাই—আজ পরিপূর্ণভাবে কাঁদিতে পারিয়া তার মন যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

সে ভাবিতে লাগিল এ অবস্থায় তার কর্ত্তব্য কি? তার বাপ মা থাকিলে সেখানে একবার যাইত; ভাই বোন থাকিলে সেখানেও যাওয়া চলিত। হয় তো কিছু দিনের জন্য দূরে গেলে বিমলের মনে পরিবর্ত্তন হইত; হয় তো দূরে গেলেও সুস্থভাবে নিজের অবস্থাও তার পক্ষে বোঝা সহজ হইত, কিন্তু তার মনে পড়িল এমন কেহই তার নাই যার কাছে এই বিপদের দিনে কিছু দিনের জন্য যাওয়া চলে, নিজের পরম অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া শঙ্কিতে নৈরাশ্যে তার মন ভরিয়া গেল।

* * *

অনেক রাত্রে হঠাৎ বিমলের ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিল পাশে ফুল্লরা নাই। আজ কয়েক দিন হইল সে যে অন্য ঘরে শুইতেছে তার মনে পড়িল—মনে সে এক অভূতপূর্ব্ব সংবেদন অনুভব করিল, নিজের স্ত্রী পরের মত অন্য ঘরে শুইয়া আছে এই চিন্তাতে তার হৃদয় পুলকিত বিস্ময়ে ভরিয়া গেল—ফুল্লরা নূতনতর মোহের মহিমায় দেখা দিল।

সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল; ঘরের বাহিরে আসিল; কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ তখন অস্ত যাইবার উদ্যোগ করিতেছে; বিমল ও ফুল্লরার ঘরের মধ্যে একটি দেয়ালের বাধামাত্র—দুটি ঘরের সম্মুখে বারান্দার সংযোগ। সে ফুল্লরার ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়ালে—ঘরের দ্বার বন্ধ। এই বাধাতে তার আগ্রহ আরও বাড়িয়া উঠিল। তার মনে হইল বিবাহে

নারী সুলভ হইয়া পড়ে বলিয়াই তার মূল্য কমিয়া যায়; সুলভ্যা ফুল্লরা আজ ওই বদ্ধদ্বারের বাধায় দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে—আর দুর্লভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তার চারিদিকে একটি মায়ালোক গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিমল জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, কৃষ্ণাদশমীর পাণ্ডুর জ্যোৎস্না শয্যার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, ফুল্লরা শয্যার এক প্রান্তে ওই পাণ্ডুর কৃষ্ণাদশমীর চাঁদের মতই পড়িয়া আছে; ক্ষুদ্র কোমল পা দুখানিতে গীতাবসিত বীণাতারের নিস্তব্ধতা; শাড়ীর পাড়টি তনুলতাটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া কোথায় যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, মাথার ঘোমটা কখন পড়িয়া গিয়াছে; অধরোষ্ঠ একটি গোলাপের কুঁড়ি—ফুটিয়া উঠিবার জন্য যেন প্রভাতের অপেক্ষায় আছে—মাঝখানে একটি কুন্দ দন্তের অর্দ্ধভাস; প্রশান্ত ললাটের উপর চূর্ণালক নামিয়া পড়িয়াছে; মুদ্রিত চক্ষুর নিমীলিত পক্ষ্মের সরু কালো দুটি টান; আর অর্দ্ধ-সম্বৃত শাড়ীর তলে জ্যোৎস্নাচিক্কণ বামপয়োধরের স্বর্ণ-বুদ্‌বুদ্‌! না ঘুমাইলে কি দেখিতে সুন্দর হয়!

বিমল মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—আজ ওই বদ্ধ দ্বারের বাধা পড়িয়াছে বলিয়াই ফুল্লরা এমন অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে! দূরত্ব না হইলে কি সৌন্দর্য্য খোলে! স্বর্গ সুদূরতম বলিয়াই সুন্দরতম! স্বর্গকে ঘরের পাশে আনিয়া দাও আর সুন্দর মনে হইবে না। কিংবা ঘরের পাশেই স্বর্গ আছে, কাছে বলিয়াই চিনিতে পারিতেছি না!

বিমলের বিস্ময় বোধ হইল—ওই একটি বদ্ধ দ্বার, একখানি দেয়াল তাতেই কি এত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারে? বিমল জানিলে বুঝিতে পারিত দূরত্ব মানসিক গুণ! ক্ষুদ্রহাতের একটি মুষ্টি চোখের সম্মুখে ধরিলে অনন্ত আকাশ ঢাকিয়া যায়; আবার এই দেহটার মৃৎভাণ্ডে যে চৈতন্যবিন্দু আছে, তাহা সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিতে পারে,

নকে বলে তাহাই এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছে; আর এই একটি য়ালের ছেদ, একটি দরজার বাধা নন্দনের রোমান্সে মানুষের জীবন রয়া দিতে পারে!

বিমলের মনে এই মোহ-জগৎ সৃষ্টি হইয়া উঠিবার বিশেষ কারণ ল। আজ সন্ধ্যাবেলা সে কোপাই নদীর ধারে বনে বেড়াইতে য়াছিল। তখনো সূর্য্য অস্ত যায় নাই কিন্তু দিগন্তের ধারে নামিয়া ড়য়াছে; সূর্য্যের তপ্তরক্ত রশ্মিরসে বনস্পতির গুঁড়িগুলি রসিয়া ঠয়াছিল; ক্রমে সেই বর্ণমেখলা গাছের গুঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গিল—আরও উপরে, আরও উপরে; শাখাপ্রশাখা বাহিয়া উঠিতে ঠতে সেই রশ্মিপ্রবাল উচ্চতম পল্লবগুচ্ছকে নব কিশলয়ের আভা ন করিল; তারপরে কখন্ এক সময়ে পল্লবদলের উপরে কালির পোঁচ াইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইল; এইমাত্র যে তৃণদল প্রবালেমাজা কতের মত জ্বলিতেছিল তাহাতে সীসার রঙ ধরিল! শাখাপ্রশাখার লের অন্তরালে রক্তিম-নীল আকাশ ক্রমে একখানা আকাশজোড়া জললতার কালিমা ধারণ করিল; ফুলের গন্ধে, পাতার গন্ধে, উদ্ভিদের ন্ধ, মাটির গন্ধে, অতি সূক্ষ্ম গন্ধের কুয়াশা জমিয়া উঠিল; বাতাস শব্দে মরিয়া মিলাইয়া গেল; পাখীরা ঘুমাইয়া পড়িতেছে; সব একসঙ্গে , একে একে; আগে কাকের দল, তারপরে ফিঙে, তারপরে চড়ুই; ভূমি অন্ধকার হইতে হইতে কখন্ গাছের গুঁড়িতে ও অন্ধকারে াকার হইয়া গেল; একটা রাতজাগা কোকিলের অসংলগ্ন কুহুধ্বনি; ন-বউয়ের ঠক্‌ঠকানি; কালো আকাশে ভীরু তারার দল গুটি গুটি টিপিয়া বাহির হইতেছে—হঠাৎ কোন্ অন্ধকারের মধ্য হইতে ক্রোশের কর্কশধ্বনির ক্রমোচ্চ সোপান-গাঁথা; দূর দূরান্তরে দিক-ান্তরে শিবারবের জাল নিক্ষেপ; রাত্রি প্রথম প্রহর।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া বিমল ফিরিতে যাইবে এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল অদূরে পলাশ-মহুয়া গাছের একটা কুঞ্জের মধ্যে একজন কে যেন বসিয়া আছে, মূর্ত্তিটি রমণীর, তার মুখ দেখা যাইতেছে না, আর মুখ দেখা যাইতেছে না বলিয়াই তাকে মধুরতর রহস্যময়তর মনে হইতেছে; দেখিলে হয় তো তাকে সুন্দর মনে হইত, কিন্তু না দেখিয়া তাকে সুন্দরতর মনে হইতেছে; ওই শাড়ীর ভঙ্গী, গ্রীবার ভঙ্গী, অন্ধকারের পটে ওই শুভ্র শাড়ীর অর্দ্ধাভাস সবসুদ্ধ মিলিয়া একখানি বিরলরেখা ছবির মত অরূপ-ঐশ্বর্য্যে যেন টলমল করিতেছে; স্পর্শ করিতে সঙ্কোচ হয়; নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে, এত সুকুমার—কিন্তু বোধ করি সেই জন্যই এ রকম মোহময়।

এতরাত্রে এমন নির্জ্জন স্থানে আর কে আসিবে! বিমলের বোঝা উচিত ছিল ও নারী নিশ্চয় ফুল্লরা। কিন্তু সে বুঝিয়াও বুঝিল না, বুঝিলেই যে মোহভঙ্গ হয়! সে দূর হইতে নিজে লুকাইয়া থাকিয়া এই মোহময়ী রহস্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল—তারপরে সেই নারীমূর্ত্তি উঠিবার আগেই সেই মোহরসে-ভরা পাত্রটি বহিয়া সন্তর্পণে ঘরে ফিরিয়া আসিল—পাছে এক ফোঁটাও পাত্র হইতে পড়িয়া যায়—এই তার ভয় ছিল।

সন্ধ্যার এই মোহের স্রোতে রাত্রির অভিজ্ঞতার মোহ মিশিয়া বিমলের মনে ঢেউয়ের ওঠা পড়া সুরু হইল; সে উদ্বেল চিত্তে বন্ধ দ্বারের দিকে তাকাইয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল।

তার পরদিন রাত্রেও বিমল শয্যাত্যাগ করিয়া ফুল্লরার ঘরের জানালার
াছে দাঁড়াইল—ফুল্লরার নমনীয় দেহ একটি বঙ্কিম রেখার ভঙ্গিতে
য্যার উপরে শায়িত; যেন মায়াপুরীর তোরণের গাত্রে কারুখচিত
ল্ললতার একটি মঞ্জরী; অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় সে মূর্ত্তি আরও মনোরম
ইয়া উঠিয়াছে; বিমল মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

তার ইচ্ছা হইতেছিল ফুল্লরাকে জাগায়, এবং ঘরে প্রবেশ করে;
ন্তু সাহসে কুলাইল না; ফুল্লরা নিশ্চয় রাগিয়া আছে।

তারপর হইতে প্রতিরাত্রে সে উঠিয়া চোরের মত একবার ফুল্লরাকে
খিয়া যায়; মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকে আর অবশেষে হতাশের মত
র্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসে; ফুল্লরাকে জাগাইতে সাহস হয় না!
জের স্ত্রী কতখানি পর হইয়া গিয়াছে; আর পর হইয়া গিয়াছে
লিয়াই এমন মনোরম হইয়াছে, এমন আকর্ষণশীলা হইয়াছে।

রাত্রের এই মোহ দিনের বেলাতে ফুল্লরার প্রতি তার ব্যবহারে
ভেদ ঘটাইল। এখন সে নানা ছুতায়, নানা অছিলায় ফুল্লরার কাছে
ইতে চেষ্টা করে; ফুল্লরা ধরা দেয় না; বিমল এই সদ্যোজাত মোহ-
শুকে বুকের মধ্যে লালন করিতে করিতে মাঠের মধ্যে, নদীর তীরে
য়া বেড়ায়।

তখন শীতের শেষ। গাছে গাছে ঝরা পাতার পীতশিখায় শীতের
াগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শালের পাতা পীতাভ, উচ্চ শাখার পাতা
কাংশ খসিয়া পড়িয়াছে; মহুয়ার পাতা জীর্ণ পীত, দু'একটি করিয়া
তেছে; বাদামের পাতা ভূতে-পাওয়া লাল, রক্তচন্দন লিপ্ত; দেবদারুর

পাতা শুষ্ক পীত; গাছের তলে শুষ্ক পাতায় ছাইয়া গিয়াছে; চকিত গিরগিটি যতক্ষণ চলে খড়্ খড়্ করিয়া শব্দ হয়, সেই নিশানায় শালিক কাক শিকারের সন্ধানে সচেতন হইয়া ওঠে; আগের দিন রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, শুক্‌নো পাতাগুলি এখনো ভেজা; শুক্‌নো পাতায় জল পড়িয়া এক রকম সোঁদাগন্ধ; হলুদের ক্ষেতে শুক্‌নো পাতা খসিয়া গিয়া গাছগুলি শীর্ণ দেখা যাইতেছে; রাশি রাশি কাটা আখ স্তূপীকৃত; গ্রামের প্রান্তে রস মাড়াই হইতেছে; প্রসাদলোভী শিশুর দল জমিয়া গিয়াছে; ইক্ষুরসের স্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধে বাতাস মন্থর; গৃহস্থের আঙিনায় হাওয়ায় তুষ উড়াইয়া দিয়া চাল বানানো হইতেছে; সাঁওতাল পল্লীর সীমানায় গাঁদাফুলের শেষ আসরের অন্তিম রক্তিম উজ্জ্বলতা; আর শকুন্তলা ও সখীরা অবসর সময়ে বসিয়া সোনার রঙের যে সূক্ষ্ম ক্ষৌম সূত্র কাটিত, তাহা দিয়া বোনা সূক্ষ্ম সোনালী জালের মত তপ্তোজ্জ্বল রৌদ্রে মাঠে মাঠে বিস্তৃত! বিমল এই শীতান্তের প্রকৃতির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে অনুভব করিত শীতের জড়তাকে সবলে ঠেলিয়া প্রকৃতি জাগিবার চেষ্টা করিতেছে; সে অনুভব করিত তার অন্তরের মধ্যেও অনুরূপ একটা প্রয়াস নিরন্তর যেন চলিতেছে।

* * *

ফুল্লরা বিমলের ভাবান্তর বুঝিয়া খুসি হইয়াছিল, কিন্তু সে স্থির করিয়াছিল এত সহজে ধরা দিলে চলিবে না। বিমল যে আসিয়া রাত্রে তার জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু দু' এক রাত্রি পরেই বুঝিতে পারিয়াছিল; প্রথম দিন রাত্রে তো হঠাৎ একজন মানুষকে অত রাত্রে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রায় সে চমকিয়া উঠিয়াছিল আর কি! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে সামলাইয়া লওয়াতে আর চীৎকার করে নাই। সে যেন

নিদ্রিতের মতই পড়িয়া রহিল। পরদিন রাত্রেও আবার সেই মূর্তিকে লক্ষ্য করিল—বুঝিল সে বিমল ছাড়া আর কেউ নয়! বুঝিল—কি জন্য বিমল প্রতি রাত্রে আসিয়া ওইখানে দাঁড়াইয়া থাকে; বুঝিয়া—তার আনন্দ হইল! গর্ব্ব হইল, তৃপ্তি হইল, আবার কিছু দুঃখও হইল! বিমলের না জানি কত অতৃপ্তি, আর সে নিজেও তো মানুষ! কিন্তু সে স্থির করিল—অত সহজে ধরা দিলে চলিবে না, আর স্থির করিল, সে যে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও জানে তা প্রকাশ করিবে না।

ফাল্গুন মাস আর শুক্লপক্ষ এক সঙ্গে আসিয়া পড়িল—প্রতি রাত্রেই তাদের প্রহর দীর্ঘতর হইতে লাগিল; আকাশে যতক্ষণ চাঁদ থাকে, ততক্ষণ জ্যোৎস্নায় দৃষ্টি চলে বিমল জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত; আর জাগ্রত ফুল্লরা কমনীয় তনুলতা লীলায়িত করিয়া চোখের জল প্রাণপণে চাপিয়া নিদ্রিতবৎ পড়িয়া থাকিত।

অবশেষে আর না থাকিতে পারিয়া বিমল ফুল্লরাকে ডাকিয়া জাগাইল। (ফুল্লরা জাগিয়াই ছিল)। বিস্মিত (অবশ্যই বিস্মিত নয়) ফুল্লরা শুধাইল—কে?

—বিমল বলিল—আমি বিমল।

ফুল্লরা শুধাইল—এত রাত্রে কি?

বিমল কি বলিবে? বলিতে গেলে গৌরবে আঘাত লাগে, আর অত কথা কি দু' একটি কথায় বলা যায়, হঠাৎ তার মুখে আসিল—শীত করছে।

উত্তর শুনিয়া দুই জনেরই হাসি পাইল!

ফুল্লরা বলিল—তোমার ঘরে আলনার উপরে শাল আছে!

বিমল বলিল—না, ঠিক শীত নয়; গরম পড়েছে বারান্দায় একটু পায়চারি করছিলাম।

ফুল্লরা বলিল—এবার তবে শোও গে!

বিমল বলিল—তুমি তো বেশ ঘুমোচ্ছিলে।

—আমার তো গরম লাগেনি!

—লাগেনি? আমার কিন্তু মাথা ধরে' উঠেছে!

—তাই নাকি? ওরিএণ্টাল বাম আছে তোমার ঘরে!

বিমল বলিল—ওতে কিছু হ'বে না! কপালের এই জায়গা কেমন দব্ দব্ করছে! দেখ না!

ফুল্লরা জানালার ধারে সরিয়া আসিল।

বিমল খপ্ করিয়া তার হাত ধরিয়া কপালের উপর ঠেকাইয়া বলিল—এই দেখ।

ফুল্লরা বলিল—কই মাথা ধরা! কপাল তো দিব্যি ঠাণ্ডা দেখছি।

বিমল বলিল—শীত করছে সে তো আগেই বলেছিলাম।

জানালার দু'দিকে দু'জন দাঁড়াইয়া—মাঝে কয়েকটা শিকের মাত্র ব্যবধান। হঠাৎ বিমল ফুল্লরার মুখ কাছে টানিয়া আনিয়া চুম্বন করিল—ঈষৎ স্পর্শমাত্র ঘটিল।

ভাগ্যিস্ তখন চাঁদ অস্ত গিয়াছিল—নতুবা কি করিয়া ফুল্লরা চোখের জলের স্রোত লুকাইত?

বিমল বলিল—ফুল্লরা দরজা খোলো।

ফুল্লরা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল—এবং দৌড়িয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।

বিমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। সে ভাবিল কাল ফুল্লরাকে বলিবে যে তুমি আর অন্য ঘরে শুইতে পারিবে না।

কার্য্যতঃ তাহা আর হইয়া উঠিল না।

পরদিন রাত্রে আবার বিমল জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল; রাকে জাগাইল (জাগানো বৃথা—তার কি ঘুম আসিতে পারে?)।

বিমল বলিল—ফুল্লরা দরজা খোলো!

ফুল্লরা বলিল—না।

বিমল শুধাইল—কেন?

ফুল্লরা বলিল—কেন কি? তুমিই তো আমাকে এখানে শোবার ।স্থা করে' দিয়েছ!

বিমল বলিল—সেই আমিই আবার বলছি—দরজা খোলো!

ফুল্লরা বলিল—তা হয় না।

বিমল বলিল—কেন?

ফুল্লরা বলিল—কেন তবে শুনবে?

ভীত বিমল বলিল—বল!

ফুল্লরা বলিতে লাগিল—আমি সব বুঝি। আমি অনেক দিন থেকে ।ছি তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকো—খুলবার হ'লে তখনি তাম।

সঙ্কুচিত বিমল বলিল—আপত্তি কি?

—আপত্তি আর কিছুই নয়! এই রুদ্ধ দ্বারের মন্ত্রই আমার নারীত্বকে মান থেকে বাঁচিয়েছে। এই রুদ্ধদ্বারের দূরত্বই তোমাকে প্রতি রাত্রে কর্ষণ করে' এনেছে; দূরত্বকে যদি আমি দূর করে' দিই তবে তুমি ার ধিক্কার দিয়ে ফিরে যাবে—আর হয় তো আসবে না!

বিমল বলিল—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফুল্লরা বলিল—তবে বুঝিয়ে বলি শোনো। সব পুরুষই হয় তো ার মতো—অন্ততঃ তোমার প্রকৃতি এই যে সুখ তোমার কাছে দূর ই সুখকর, তাকে মুঠোয় পেলে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলে' মনে

হয়। আর তাই মনে হ'য়েছিল বলেই আমাকে অবহেলা করে দূরে ঠেলে দিয়েছিল! সুখ তোমার হস্তগত নয় বলেই আজ সুখের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছ! এখন যদি দরজা খুলে দিই তবে তোমার আমার দু' জনেরই পরম দুর্ভাগ্যের কারণ ঘট্‌বে; তুমি করবে অবহেলা, আমি হ'ব অবমানিত!

তারপরে একটু থামিয়া ফুল্লরা বলিল—এই ভাল কি বল! এতে তোমারও সুখ—আমারও আনন্দ!

ফুল্লরার শেষের কথাগুলিতে এমন কোমলতার আভাস ছিল যে বিমল সাহস পাইল; প্রথম দিকের কথায় সে কেমন যেন ভয় পাইয়াছিল, ফুল্লরা যে অমন করিয়া কথা বলিতে পারে সে জানিত না; তার মনে হইতেছিল কোন্ পাষাণমূর্ত্তি যেন কথা বলিতেছে।

বিমল বলিল—ফুল্লরা মাপ ক'রো।

ফুল্লরা বলিল—তোমাকে দণ্ড দেবার ইচ্ছা নেই বলেই দরজা খুলছি না। মাপ না করলে অনেক আগেই দরজা খুলতাম—দেখতে পেতে সে কি বিষম অনুতাপের দণ্ড!

বিমল জানালা দিয়া হাত গলাইয়া ফুল্লরার হাতখানি ধরিবার চেষ্টায় ছিল—সে চট্ করিয়া সরিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল—যাও, এখন শোও গে!

এই বলিয়া সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। বিমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

* * *

এই ভাবে তাদের জীবনযাত্রা চলিতে লাগিল—দিনে একভাবে, রাত্রে একভাবে। দিনে তাদের ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় রাত্রের দ্বন্দ্বের কোন আভাস প্রকাশিত হইত না; রাত্রের অনুরোধ বিমল দিনের

বলায় কখনো ফুল্লরাকে করে নাই—ফুল্লরাও কোন উচ্চবাচ্য করিত
না। দিনের বেলায় তারা স্বামী-স্ত্রী; রাতের বেলায় তারা প্রণয়ী-
প্রণয়িনী।

*   *   *

চৈত্র পূর্ণিমা আসিয়া পড়িয়াছে, সারারাত্রি জাগিবে বলিয়া চাঁদ আজ
অঙ্গীকারে আবদ্ধ। শালফুলের গন্ধ, আমের মুকুলের গন্ধ, মহুয়ার
ফুলের গন্ধ, শিরীষফুলের গন্ধ সপ্তরথীর মত নিঃসঙ্গ চন্দ্রকে ঘিরিয়া
ধরিয়াছে, তার তীক্ষ্ণ রজতোজ্জ্বল শরনিক্ষেপ আজ নিতান্তই বৃথা!

বিমল প্রতিরাত্রের মত ফুল্লরার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বিমল ডাকিল—ফুল্লরা।

ফুল্লরা জানালার কাছে আসিয়া শুধাইল—কি?

বিমল বলিল বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে, চল একটু ঘুরে আসি।

ফুল্লরা বলিল—তোমার যত অদ্ভুত কথা। এত রাতে কে বেড়াতে
যায়?

বিমল বলিল—চল না যাই—

ফুল্লরা বলিল—না।

বিমল বলিল—না হয় নাই যাবে, একবার দরজা খোল না।

ফুল্লরা চুপ করিয়া থাকিল।

বিমল বলিল— খোলো লক্ষ্মী তোমার পায়ে পড়ি।

ফুল্লরা ভাল করিয়া তার দিকে তাকাইয়া দেখিল—পুরুষের চোখ
জ্বলিতেছে। নারীর হৃদয় গলিয়া গেল।

ফুল্লরা বলিল—না, দরজা খুলবো না।

মুখে সে না বলিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে স্বহস্তে দরজা খুলিয়া
দিল।

বসন্তের মিশ্রগন্ধবহ এক দম্‌কা হাওয়া, এক ঝলক জ্যোৎস্নার সঙ্গে বিমল দ্রুত ঘরে প্রবেশ করিল।

ফুল্লরা যেন ভুল করিয়াই দরজা খুলিয়া দিয়াছিল—সে আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দিন দুই পরে বিমল ফুল্লরাকে বলি'ল—ফুল্লরা কাল কল্‌কাতা থেকে
ক বন্ধুর চিঠি পেলাম। তা'তে সে জানিয়েছে যে আমি যদি ইচ্ছা
রি তবে কলেজে প্রোফেসারি পেতে পারি।

ফুল্লরা উৎসাহিত হইয়া শুধাইল—কোন্ কলেজে?

বিমল বলিল—আমি যে-কলেজ থেকে পাস করেছি। আমার বন্ধু
:খছে—তাদের একজন লোক দরকার হ'য়েছে, আমার খোঁজ তারা
রছে।

ফুল্লরা বলিল—তা হলে আজি তোমার বন্ধুকে লিখে দাও যে তুমি
াজ নিতে রাজি আছ।

তারপর সে শুধাইল—কবে তক্ কাজে যোগ দিতে হ'বে?

বিমল বলিল—যত শীগ্‌গীর সম্ভব। বন্ধু লিখেছে আমি যদি রাজি
ে তবে যেন একখানা দরখাস্ত কলেজের অধ্যক্ষর নামে পাঠিয়ে দিই
াবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে' চলে' আসি, কারণ আমি সম্মত
লে আমাকে নেওয়া তারা ঠিক করে' ফেলেছে।

ফুল্লরা বলিল—তবে এখনি তুমি দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দাও, আমরা
র দিনের মধ্যেই রওনা হ'তে পারবো।

বিমল তখনি বসিয়া দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল, এবং নিজের হাতে
ে দিবার জন্য ডাকঘরের দিকে রওনা হইল।

এই ঘটনায় ফুল্লরা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করিল। তার মনে হইল,
াম ছাড়িতে পারিলে, এখানকার পরিবেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায়
বৈক-পরিবেশে যাইতে পারিলে তাদের জীবনে শান্তি ফিরিয়া

আসিবে। এখানে দীর্ঘকাল একা একা থাকার ফলে বিমল মানুষ-লাজুক হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি বিমলের এতদিনের অদ্ভুত ব্যবহারকে অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া মনে হইল। তার মনে হইল—আর কিছু নয়, সে নিজেই সামান্য ঘটনাকে অকারণে বড় করিয়া দেখিয়াছে, তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে ; সমস্ত ঘটনার জন্য সে নিজেকে দায়ী স্থির করিয়া নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, বিমলের এমন কি দোষ! তার নিজেরই উচিত ছিল বিমলকে লইয়া কলিকাতায় যাইবার চেষ্টা করা—তাহা হইলে ঘটনা এতদূর গড়াইত না।

বিমল ফিরিয়া আসিলে ফুল্লরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কলিকাতা যাইবার আয়োজনে লাগিয়া গেল ; এমন কি তার উৎসাহ বিমলের মনে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া গিয়া সে-ও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কলিকাতায় ভাবী জীবনযাপনের চিত্র আঁকিতে লাগিয়া গেল।

ফুল্লরা বলিল—মিতুন আমরা তো কল্‌কাতা চল্‌লাম।

মিতন সকালবেলায় বাগানের মধ্যে খুঁটা পুতিয়া গোরু বাঁধিয়া দিতেছিল ; সে মুখ না তুলিয়াই বলিল—আবার ফিরবে কবে গো ?

ফুল্লরা বলিল—ফিরবো কি রে ? আর ফিরবো না।

মিতন একবার মুখ তুলিল—বলিল,—সে কি গো ?

ফুল্লরা বলিল—তোর দাদাবাবু যে কল্‌কাতায় চাকরি পেয়েছে ?

মিতন চমকিয়া উঠিল, সুযোগ বুঝিয়া গোরু ছুটিয়া পালাইল, অন্য সময় হইলে মিতন গোরুর পশ্চাদ্ধাবন করিত ; কিন্তু এখন সেরূপ কিছু না করিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিল ; কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—তবে এখানে কে থাক্‌বেক ?

ফুল্লরা বলিল—তুই।

তারপরে তাকে সান্ত্বনা দিবার স্বরে বলিল—মাঝে মাঝে অবশ্য
[আ]মরা আসবো, যখন ছুটি হবে।

মিতনকে ঠিক করিয়া সে বুঝাইয়া দিল, কলেজের চাকরি কি না
[অ]নেক ছুটি, বুঝলি কিনা।

মিতন কিছু বুঝিল কি না বোঝা গেল না ; সে উঠিয়া পড়িল কিন্তু
[আ]রু ধরিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না!

দেখিতে দেখিতে তালবনীতে রটিয়া গেল বিমল চাকরি পাইয়া
[ক]লিকাতা যাইতেছে। হর্ষ-বিষাদ নানারূপ ভাবের ঢেউ গ্রামের
[লো]কেদের মনে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, সুরেশ পোদ্দার ও হরিহর মুদি হর্ষিতদের অন্যতম।
[তা]রা বুঝিল বিমলের বাগানখানা আবার গোত্ররূপে ফিরিয়া পাওয়া
[যা]বে, কেবল ভয় মিতনের উপস্থিতিকে! জগতে অবিচ্ছিন্ন সুখ
[কো]থায়?

হরিহর ও সুরেশ বিমলের কাছে আসিয়া আনন্দজ্ঞাপন করিয়া
[বলি]ল—বাবাজী এতদিনে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হ'ল।

সুরেশ হরিহরকে থামাইয়া দিয়া বলিল—মুদি তুমি কি যে বল?
[তার] মানে তুমি বলতে চাও এর আগে পর্য্যন্ত আমাদের অগৌরব
[ছিল]?

হরিহর নিজের কথার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিতেই সুরেশ তাকে
[থাম]াইয়া দিয়া বলিল—রাখো, রাখো! আমি ভাবছি কি জানো
[বাবা]জী বিদেশে গিয়ে তোমাদের বড় কষ্ট হ'বে! এক কাজ করলে
[হয়] না?

বিমল জিজ্ঞাসুনেত্রে শুধাইল—কি?

সুরেশ বলিল—মিতনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না?

একথা বিমলের মনে কখনো হয় নাই—সে কি উত্তর দিবে ভাবিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সুরেশ বলিয়া উঠিল—সেজন্য ভেবোনা বাবাজী! তোমার বাড়ীঘর বাগান! এই তো! সে-সব আমরাই দেখাশুনা করবো। আর মিতন থাকতেও তো এসব আমরা দেখাশুনা করতাম! কি বল?

এই বলিয়া সে হরিহরের দিকে তাকাইল।

হরিহর দেখিল যাহা কিছু ভাল কথা সবই সুরেশ বলিয়া ফেলিল, কাজেই সে-ও যে বিমলের একজন শুভাধ্যায়ী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বলিল—ঠিক, বাবাজী, সে জন্য তুমি ভেবোনা।

বিমল বলিল—আচ্ছা এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখবো।

তারা চলিয়া গেলে বিমল ফুল্লরাকে কথাটা জানাইল।

ফুল্লরা বলিল—সে কি হয়!

মিতনের তালবনীতে থাকাই স্থির হইল।

দিন দুই পরে তাদের কলিকাতা যাত্রার তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইল।

* * *

রাত্রে ফুল্লরার ঘুম ভাঙিয়া গেল, সে দেখিল পাশেই বিমল ঘুমাইয়া আছে। সে মনের মধ্যে স্বস্তি অনুভব করিল!

ইহার আগে অনেক দিন রাত্রে সে ঘুম ভাঙিয়া দেখিতে পাইয়াছে বিমল বিছানায় নাই; বারন্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রথমে প্রথমে সে তাকে শুইবার জন্য অনুরোধ করিত; কিন্তু বিমল তা'তে খুসি হইবার বদলে বিরক্ত হইয়া উঠিত। পরে আর সে তাকে শুইবার অনুরোধ করিত না। সে নিজে বিছানায় শুইয়া শুইয়া দেখিত বিমল অন্ধকারে ভূতের মত পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িত। আবার হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙিত, দেখিত বিমল

ক তেমনিভাবেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইতিমধ্যে রাত্রির অনেকগুলি
াহর চলিয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন আগে বিমলের সঙ্গে তার মিলন হইয়াছে, তারপর হইতে
াকে আর রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখে নাই। ফুল্লরা মনে মনে
র্ষমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিত,—ফুল্লরার কৌশলে বিমলকে জয়
ম্ভব হইয়াছে। কোপাই কি বিমলকে তার কাছ হইতে ছিনাইয়া
ইতে পারে? বিমল আবার কোপাইকে বলে কোপবতী! তার হাসি
ইল। প্রসন্নচিত্তে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

*　　　*　　　*

বিমলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরের বাহিরে বারন্দায় আসিয়া
াইল। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া তার মনে পড়িয়া গেল
ল তালবনী ছাড়িয়া যাইতে হইবে—আর কবে ফেরা হইবে কে
ন! তিনদিনের জন্য এখানে আসিয়াছিল—কয়েক বছর কাটিয়া
।

তখন তার মনে এই কয় বছরের ইতিহাস একে একে জাগিয়া
তে লাগিল। এই কয়েক বছরে দুটি সত্তার সঙ্গে তার পরিচয়
য়াছে, ফুল্লরা ও কোপাই; মানুষ ও প্রকৃতি। সে বুঝিতে পারিল
দুটি সত্তা তার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জীবনের রূপ পরিবর্তন
য়া দিয়াছে।

তার জীবনটা মাঝখানে অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, একদিক হইতে
য়াছে ফুল্লরা, অন্যদিক হইতে টানিয়াছে কোপাই—একদিকে
ষ, একদিকে প্রকৃতি! পরস্পর তারা প্রতিদ্বন্দ্বী, পরস্পর সপত্নী।
মনে পড়িল কোপাই-ই তাকে বেশি করিয়া টানিয়াছিল, তার
চেতন সত্তাকে! কোপাই তাকে বারবার বাধা দিয়াছে; কিন্তু সে

শুনিয়াও শোনে নাই, দেখিয়াও দেখে নাই, বুঝিয়াও বোঝে নাই ;—তাই তার জীবনে আজ শান্তিহীন।

সে যেদিন ফুল্লরার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উপহার লইয়া নদীপার হইতে গিয়া বানের মুখে মরিতে বসিয়াছিল, সেই ঘটনাকে নূতন অর্থে পূর্ণ মনে হইল। তার মনে হইল কোপাই মৃত্যুর কশাঘাত করিয়া তাকে ইঙ্গিত করিয়াছিল যে ও পথ তার নয়, সে ফুল্লরার নয়, মানুষের নয় ; সে কোপাই-র নির্ব্বাচিত, কোপাই-র স্বয়ম্বৃত! কিন্তু তখন তো বিমল বুঝিতে পারে নাই!

তারপরে আর একদিন, চৈত্রসংক্রান্তির সন্ধ্যায় আকস্মিক ঝড়জলের মুখে বিমল ও ফুল্লরাকে, কোপাই নদীর তীরে নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ, অসহায় ভাবে একটি ঘরের মধ্যে পুরিয়া তাদের মিলনের বাসরের সূচনা রচনা করিয়া দিয়াছিল। সে ঘটনাকে কি তখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল? আজ মনে হইতে লাগিল ইহা তার ঘটকালি নয়—ইহা তার শ্লেষাত্মক প্রতিহিংসা! মিলন ঘটাইয়া বিচ্ছেদকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার প্রতিশোধ! বস্তুতঃ কোপাই-ই তাদের মিলন ঘটাইয়া দিয়াছে—এবং তারপর হইতে ধীরে ধীরে, অমোঘবলে বিমলকে ফুল্লরার নিকট হইতে ছিনাইয়া ক্রমে দূরে লইয়া গিয়াছে।

তার মনে হইল কোপাই তার রহস্য সর্ব্বদা বিমলের জন্য উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছে ; বিমল দেখিবে, বুঝিবে, উপভোগ করিবে, কিন্তু বিমলের কি সে দিকে মন ছিল! অবশ্য সে কোপাই-এর উৎস আবিষ্কারের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মন ছিল তার ঘরের কোণে বাঁধা—তাই উৎসের সন্নিকটে গিয়া সে বিতাড়িত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল!

আর আজ কোপাই-কে পরিত্যাগ করিয়া ফুল্লরাকে লইয়া সে

।কাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত। কোপাই-কি এত সহজে তাকে ক্ষমা
বে! তার কেবলি মনে হইতে লাগিল, না, না, যে-নাগপাশে সে
় কয়েক বছর হইল জড়াইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই তাহা হইতে
় নাই, মুক্তি নাই।

সে অন্ধকারে অনিশ্চয়তার মত বারান্দায় পায়চারি করিয়া
াইতে লাগিল।

হঠাৎ রাত্রির নিঃশব্দতা ভেদ করিয়া কিসের শব্দ তার কানে
দল? বিমল চমকিয়া উঠিল! ওকি কোপাই-এর কলধ্বনি?
্রে হইতে কি নদীর কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়? সে কখনো
াছে বলিয়া তো মনে হইল না! এমনিভাবে অনেক রাত্রি তো
বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া
।!

তার মনে হইল এতক্ষণ যে-সব কথা সে চিন্তা করিয়াছে, তা তার
়মাত্র নয়, সম্পূর্ণ সত্য! দূরশ্রুত কলসঙ্কেতের দ্বারা কোপাই
় শেষবারের জন্য সতর্ক করিয়া দিতেছে।

মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখিল, ইতস্ততঃ আলোক শিখা জ্বলিতেছে,
তেছে, নড়িতেছে, নিভিতেছে, আবার জ্বলিতেছে, যেন কারা
ার আশু প্রয়োজনে দীপ লইয়া যাতায়াত করিতেছে! মাঠের মাঝে
ার যেন চাপা আওয়াজ; গাছের পাতায় পাতায় ফিস ফাস শব্দ!
ষর শব্দ না হাওয়ার? আর সমস্ত অন্ধকারটা ভরিয়া যেন কি
। অলক্ষ্য বিরাট ব্যক্তিত্ব তর্জ্জনী তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এই
ধ্বনিতে, হাওয়ার শব্দে, আলোকের যাতায়াতে, অলক্ষ্য ব্যক্তিত্বের
়নায় সমস্ত রাত্রি ভরিয়া যেন কি একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে!
লর মনে হইল আর কিছু নয়—তাকে ধরিবার এই আয়োজন।

কোপাই-র প্রেমের পাশ সে অবহেলা করিয়াছে; আজ সেইজন্য হিংসার নাগপাশ সে নিক্ষেপ করিয়াছে; শিকার পালায় দেখিয়া শিকারী তার শেষ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে।

বিমলের মনে হইল বৃথা! বৃথা! এ বাঁধন এড়াইবার চেষ্টা বৃথা! এ ষড়যন্ত্র ভেদ করিবার প্রয়াস নিতান্ত ব্যর্থ! সে ভাবিল ভীরুর মত পালাইয়া নিষ্কৃতি নাই—বীরের মত অগ্রসর হইয়া গেলে হয়তো মুক্তি মিলিলেও মিলিতে পারে!

সে নীরবে মাঠের মধ্যে নামিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিমল নিদ্রিত কি জাগ্রত বুঝিবার উপায় নাই—সে চলিতেছে, কিন্তু সে যেন জাগ্রতের চলা নয়, যন্ত্রচালিতের চলা; নিশিতে-পাওয়া ব্যক্তির মত সে পায়ে পায়ে চলিতে লাগিল।

সে বাগানের গেট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। তার পরে মাঠ; মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়া খোয়াই-এর মধ্যে নামিল। খোয়াই-এর বন্ধুরতা সে অনায়াসে পার হইয়া গেল; দিনের বেলাতেও সেখানে অত্যন্ত সন্তর্পণে চলিতে হয়, কিন্তু রাতের অন্ধকারেও বিমলের সেখানে চলিতে কোন অসুবিধা হইল না—কে যেন তাকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

খোয়াই পার হইয়া গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া সে ধীরে ধীরে কোপাই-এর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন নদীর কলধ্বনি তার কানে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—তার মনে হইল ধ্বনি যে কেবল স্পষ্টতর হইয়াছে তাহা নয়—তার অর্থও যেন প্রকটতর হইয়া উঠিয়াছে—সে ভাবিল, আজ কোপাই-এর রহস্য তার কাছে উদ্ঘাটিত হইবে।

কে যেন তার মনের মধ্য হইতে বলিতে লাগিল—ওখানে থামিলে কেন, আর এক পা, আর এক পা—

বিমল আবার অগ্রসর হইল! আবার কে যেন বলিল—আর এক পা, আর এক পা!

বিমল আবার এক পা অগ্রসর হইল অমনি সে অত্যন্ত উচ্চ নদীর পাড় হইতে নীচে নদীর গর্ভে পড়িয়া গেল। এইস্থানে নদীর মধ্যে গভীর গর্ত্ত আছে—সেখানে গ্রীষ্মকালেও মানুষ-ডোবা জল জমিয়া থাকে।

বিমলের মনে হইল সে ফেনার মত কোমল শয্যার উপরে পড়িয়াছে, যেন সে স্বপ্নের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছে। আঃ কি কোমল, কি শীতল—আর কি গভীর! তার মনে হইল সে ধীরে ধীরে কোপাই-এর রহস্যের মধ্যে তলাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এমন অন্ধকার কেন? অন্ধকার? অন্ধকার তো হইবেই কিন্তু এইটুকু পার হইতে পারিলেই কোপাই-এর রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। আজ আর কোপাই তাকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। সে অনুভব করিতে লাগিল—কোমল, শীতল; আরও আরও নীচে, আরও তলে! এত গভীর কোপাই-এর রহস্য! অন্ধকার? তা হোক অন্ধকার! কিন্তু কি স্নিগ্ধ, কি শান্তি। বিমল তলাইয়া চলিল—আরও নীচে, আরও তলে—আরও—আরও—

পরদিন ভোরবেলা রাখাল বালকেরা নদী-চরাইতে গিয়া প্রথমে আবিষ্কার করিল, কে যেন একটা লোক নদীর সেই গর্ত্তটায় মরিয়া ভাসিতেছে। তারা চিনিল; চিনিয়া গাঁয়ে আসিয়া খবর দিল।

সকাল বেলাতে যাত্রার ব্যস্ততায় ফুল্লরা বিমলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে নাই। সে বসিয়া বাক্স সাজাইতেছিল—কি করিয়া, কেমনভাবে কার মুখে যেন তার কাছে খবর পৌঁছিল। সে প্রথমে কয়েক মুহূর্ত্ত অবিশ্বাসে জড়বৎ বসিয়া রহিল—তারপরে মূর্চ্ছিত হইয়া আধ্‌সাজানো বাক্সর কাছে পড়িয়া গেল।

ফুল্লরার কাছে তালবনী অসহ্য হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল এখানে আর থাকিবে না, নলহাটি চলিয়া যাইবে, সেখানে কেহ না থাকুক, পৈত্রিক ভিটা তো আছে? আর তালবনীর সঙ্গে নলহাটির এখন প্রভেদ কি? এখানেই বা কে আছে?

একদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে বোলপুর হইতে সে নলহাটি রওনা হইল! বোলপুর হইতে নলহাটি যাইতে রেলপথে কোপাই নদীর সাঁকো অতিক্রম করিতে হয়! এই ভয়ই তার মনে ছিল। সে স্থির করিয়াছিল গাড়ীতে এমনভাবে বসিবে যাহাতে নদীটা তার চোখে না পড়ে। কিন্তু গাড়ী সাঁকোর উপর উঠিতেই ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। ইহার জন্য ফুল্লরা প্রস্তুত ছিল না, সে সবলে তার দু'কান চাপিয়া ধরিল, যাতে কানে সে শব্দ না যায়। কিন্তু শব্দ কি গম্ভীর—আর কি দীর্ঘস্থায়ী! তার হৃদয়ের গভীরতম কন্দর হইতে যেন সেই শব্দ উঠিতে লাগিল। গাড়ী যখন সাঁকো

অতিক্রম করিয়াছে, তখন সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, শুধু একবারের জন্য জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া লইল। সে দেখিতে পাইল সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারের মধ্যে অতিনিম্নে নদীসূত্রের একটি ঝলক! কোপাই বহিয়া চলিয়াছে—মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার কোন যোগ নাই; জড় প্রস্তর ও মানুষের দেহ সমান আবেগে সে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তার নিজের যেমন সুখ-দুঃখ নাই—তেমনি অপরের সুখ-দুঃখের প্রতিও সে উপেক্ষাময়ী! কোন্ অনির্দিষ্ট গহ্বর হইতে কোন অলক্ষনীয় নদীসঙ্গমে তার যাত্রা! এই বিবরের ভুজঙ্গিনী তরঙ্গের নাগপাশে মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জড়াইয়া কোন্ অস্পষ্টতার মধ্য হইতে কোন্ অন্ধকারের মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে। রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, হিংসাময়ী এই নাগিনী—কোপাই কোপবতী!

গাড়ী অন্ধকারের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিতে করিতে সবেগে ছুটিয়া চলিল।

পরিশিষ্ট

সকলেই জানিত বিমল আর বাড়ী ফিরিবে না—কেবল মিতন সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তার বিশ্বাস বাড়িতে লাগিল—দাদাবাবু এই বার ফিরিবে। এমন কি শেষে সে বিমলের ফিরিবার দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে লাগিল।

বিমলের বাগানের দিকে সুরেশ পোদ্দার গোরুটি লইয়া গুটি গুটি আসিতেছিল, মিতন দেখিতে পাইয়া বলিল—পোদ্দার মশাই, সেটি হ'বেকনি!

সুরেশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

ত'ন মিতন কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া আনিয়া বলিল—দাদাবাবু দে .ল বলবেক কি? বুঝলে না পোদ্দার মশাই দাদাবাবুর যে চিঠি এলো!

এই বলিয়া সে কাপড়ের খুট হইতে মলিন ভাঁজকরা একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিল—সুরেশ দেখিল এ সেই পাঁচ বছর আগেকার ,মলের চিঠি।

পোদ্দার গোরু লইয়া ফিরিয়া গেল।

মিতন সারাদিন বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া থাকিত। বাগানটি পরিষ্কার করিয়া রাখিত। কি জানি কখন্ দাদাবাবু আসিয়া পরে—যে খেয়ালী মানুষ! বাগানটি তক্তকে করিয়া রাখিত—কি জানি দাদাবাবু যদি আসিয়া মনে করে মিতন কোন কাজ করে না—কেবল বসিয়া খায়।

সুরেশ ও হরিহর অত্যন্ত নিরাশ হইল। তারা বিমলের মৃত্যুতে দুঃখ পাইয়াছিল সত্য। কিন্তু সেই সত্যকার দুঃখের সঙ্গে এই স্বার্থের

াদটুকু মিশ্রিত ছিল যে এবারে নিরঙ্কুশভাবে তারা বিমলের বাগানে গারু চরাইতে পারিবে!

কিন্তু মিতন তা'তে বাধ সাধিল।

তারপর একদিন ক্রমে প্রকাশ পাইল মিতনের চোখে ছানি পড়িয়াছে। তারা দুঃখিত হইল, কিন্তু এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইল, ছানি পড়িবার জন্য খন তারা দায়ী নয়, তখন বাগানে গোরু বাঁধিয়া দিবার সুবিধাটা হইতে কন বঞ্চিত হয়।

কিন্তু গোরু বাঁধিতে গিয়া বুঝিল মিতনের চোখ গিয়াছে বটে কন্তু আর কোন্ এক ইন্দ্রিয়ের বলে সে সমস্ত অনুভব করিতে পারিয়া ৎকার করিয়া উঠিল—ও হবেক্‌নি পোদ্দার মশাই ও হবেক্‌নি মুদি ই দাদাবাবু এলে বলবেক্ কি!

তারা ভগবানের অবিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া গোরু লইয়া ফিরিয়া গেল।

ডাক আসিবার সময়ে মিতন মাঝে মাঝে ডাকঘরে গিয়ে উপস্থিত ইত, শুধাইত মাষ্টারবাবুর চিঠি এলো?

তারাপদ স্নিগ্ধস্বরে বলিত—আজ তো চিঠি আসেনি।

মিতন তাহাতে দমিয়া না গিয়া সগর্ব্বে বলিত—আজ আর আসবেক কন? এই তো আমি চিঠি পেয়েছি।

এই বলিয়া সে কাপড়ের খুট হইতে বিমলের চিঠি বাহির করিত। কলে দেখিত সেই পাঁচ বছর আগেকার পুরাতন পোষ্টকার্ড।

মিতন বলিত—মাষ্টারবাবু একবার পড়ো তো দেখি।

তারাপদ পড়িত!

মিতন শুধাইত,—বুধবার কি বল? বুধবারে আসবেক! তবে তো াড়ী নিয়ে বোলপুরে যেতে হ'বে।

তারপর একটু থামিয়া নিজের মনেই যেন বলিত আজ কি বার! রবিবার! মাঝে এখনো দুটো দিন আছেক কি বল?

সকলে তাহা স্বীকার করিত।

সে গাড়ী ঠিক করিবার জন্তই যেন তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলিয়া যাইত।

বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া বাগান পাহারা দিয়া মিতনের দিন যায়

মানুষের পায়ের ক্ষীণতম শব্দ পাইলেই—সে চীৎকার করিয়া ওঠে কে গো বটেক! পোদ্দার মশাই? ও হ'বেকনি।

পোদ্দার বলে—গোরু নয় মিতন, তোমার দাদাবাবুর খবর নিয়ে এলাম।

মিতন খুসি হইয়া উঠিয়া বুধবারে বিমলের আসন্ন আগমন জানাইয়া দেয়!

পোদ্দার গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যায়।

বাগানে মানুষ গোরু ঢুকিতে সাহস করে না; কেবল শালিক চড়িয়া বেড়ায়, কাঠবিড়ালি খুটিয়া খায়; আলো কমে, ছায়া বাড়ে, আর থাকিয়া থাকিয়া শুকনো পাতার মধ্যে দমকা হাওয়া হাহাকার করিয়া ওঠে! আর অন্ধ মিতন একাকী অন্ধ অদৃষ্টের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া সারাদিন বসিয়া থাকে। সারাদিন, সারারাত্রি।